প্রথম-।

শারীর-বি

শ্রীযদুনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি, এ,

প্রণীত।

"এতস্মাৎ কিমিবেন্দ্রজালমপরং যদ্‌গর্ভবাসস্থিতং
রেতশ্চেতত্তি, হস্তমস্তকপদপ্রোদ্ভুতনানাঙ্কুরং
পর্য্যায়েণ শিশুত্বযৌবনজরা বেশৈরনেকৈর্বৃতং
পশ্যত্যত্তি শৃণোতি জিঘ্রতি তথা গচ্ছত্যথাগচ্ছতি।" শঙ্করাচার্য্য

কলিকাতা

কলেজ ষ্ট্রীট্, ক্যানিং লাইব্রেরি হইতে প্রকাশিত

১৩০৩ সাল।

মূল্য; কাপড়ে বাঁধাই ১৲; কাগজের মলাট

কলিকাতা
৩ নং স্কট্‌স্ লেন, ভারতমিহির যন্ত্রে
সান্যাল এণ্ড কোম্পানি দ্বারা
মুদ্রিত
এবং
৬৩ নং কলেজ ষ্ট্রীট, ক্যানিং লাইব্রেরী হইতে
শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা
প্রকাশিত।

প্রথম-শিক্ষা

শারীর-বিধান।

শ্রীযদুনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি, এ, এম, বি,

প্রণীত।

সূচীপত্র।

	বিষয়			পৃষ্ঠা
১।	উপক্রমণিকা			১
২।	১ম অধ্যায়		পশু ও মনুষ্য	৫১
৩।	২য়	ঐ	মানবের জন্ম	১৫
৪।	৩য়	ঐ	বৰ্দ্ধন ও পোষণ	২৯
৫।	৪র্থ	ঐ	রক্ত	৪১
৬।	৫ম	ঐ	রক্ত সঞ্চালন	৪৯
৭।	৬ষ্ঠ	ঐ	নিশ্বাস প্রশ্বাস	৬৩
৮।	৭ম	ঐ	মনুষ্য-শরীরে তাপোৎপত্তি	৭২
৯।	৮ম	ঐ	ভোজন ও পচন	৭৮
১০।	৯ম	ঐ	শোষণ ও সমীকরণ	১০৫
১১।	১০ম	ঐ	স্রবণ বা ক্ষরণ	১০৮
১২।	১১শ	ঐ	মূত্র যন্ত্র ও মূত্র ক্ষরণ	১১৪
১৩।	১২শ	ঐ	স্নায়ু যন্ত্র	১২০
১৪।	১৩শ	ঐ	চৰ্ম্ম, স্পর্শেন্দ্রিয় ও স্পর্শ	১৪৯
।	১৪শ	ঐ	নাসিকা, ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও আঘ্রাণ	১৫৮
।	১৫শ	ঐ	জিহ্বা, রসনেন্দ্রিয় ও আস্বাদন	১৬৩
	১৬শ	ঐ	কর্ণ, শ্রবণেন্দ্রিয় ও শ্রবণ	১৬৮
	১৭শ	ঐ	চক্ষু, দর্শনেন্দ্রিয় ও দর্শন	১৮১
	১৮শ	ঐ	স্বরযন্ত্র, কণ্ঠস্বর ও ভাষা	১৯৯
	১৯শ	ঐ	মাংস সূত্র ও মাংস পেশী	২০৯
	২০শ	ঐ	জীবনী শক্তির পতন ও মৃত্যু	২১৪
	পরিশিষ্ট			২২০

উপক্রমণিকা।

াব-জীবনের কার্য্য সকল উত্তমরূপ অবগত হইতে হইলে কিরূপ, তাহা প্রথমেই জানা উচিত। যে আশ্চর্য্য শক্তি দিগের শরীরের ভিতর থাকাতে আমরা নড়িয়া বেড়াইতেছি, হিতেছি ও চিন্তা করিতে পারিতেছি, যাহা বাহির হইয়া এই দেহ অচেতন হইয়া পড়িবে ও অচিরাৎ পচিয়া যাইবে, । কিরূপ? যাহা দ্বারা এই পরিদৃশ্যমান জগতের যাবতীয় ব জন্তু চেতনা-প্রাপ্ত হইতেছে এবং অধিকাংশই ইতস্ততঃ চরণ করিতে সমর্থ হইতেছে, উদ্ভিদ্‌গণ যাহা দ্বারা জীবিত ,কিয়া পৃথিবীকে সুশোভিতা করিয়াছে, বিশ্বরাজ্যের মধ্যে সেই অত্যাশ্চর্য্য সৃষ্টি প্রাণের প্রকৃতি কিরূপ, তাহা জানিতে কাহার না ইচ্ছা হয়?

পূর্ব্বকালে কোন কোন মহাত্মা ইহাকে বায়ু বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। তাঁহাদিগের মতে এই প্রাণবায়ু শরীরের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া জীবগণকে জীবিত রাখে, এবং জীব-শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গমন করিয়া, অপান, উদান প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়। ইদানীন্তন পণ্ডিতগণের মত তাহা নহে। তাঁহারা বলেন যে, বায়ু বা জল যেরূপ জড় পদার্থ, প্রাণ সেরূপ নহে। তাপ, তাড়িৎ, চৌম্বুকাকর্ষণ, আলোক প্রভৃতি যেমন এক একটী ভৌতিক শক্তি, প্রাণও সেইরূপ একটী ভৌতিক শক্তি মাত্র! প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও শারীর-বিধান শাস্ত্রের পরীক্ষাদি দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, জীব-শরীরে সর্ব্বদাই তাপ উৎপন্ন হইতেছে, এবং তাড়িৎ, রাসায়নিক

জীবন বা প্রাণের স্বরূপ সম্পূর্ণরূপ না জানা যাউক, তথাপি জীবনের লক্ষণ ও অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্যগুলি জানা উচিত। অতএব জীবিত পদার্থের লক্ষণ কি এবং জীবিত ও জীবনহীন পদার্থের বিভেদ কি, তাহা বর্ণনা করা উচিত।

প্রথমতঃ। জীবিত পদার্থ মাত্রেই অন্য জীবিত পদার্থ দ্বারা উৎপন্ন হয়। মনুষ্য ও অন্যান্য জীবগণ পিতামাতা দ্বারা এবং উদ্ভিদ্‌গণ পরাগকেশর ও গর্ভকেশর দ্বারা উৎপন্ন হয়, ইহা সকলেই জানেন। কিন্তু কীটাণু ও অতি ক্ষুদ্র উদ্ভিদ্‌গণও যে এইরূপ উপায়ে জন্মগ্রহণ করে, তাহাতেও সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে কোন কোন মহাত্মা বলিতেন যে, কতকগুলি অতি ক্ষুদ্র জীব ও উদ্ভিদ্ পিতামাতা হইতে উৎপন্ন না হইয়া বিবিধ প্রকার অচেতন পদার্থ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। বহুকাল পূর্ব্বে ভগবান্ মনু দংশ, মশক প্রভৃতি জীবগণকে উষ্ণ ও পূতিগন্ধময় স্থান হইতে উৎপন্ন হইতে দেখিয়া এবং তাহাদিগের জনকজননীর অভাব দেখিয়া, তাহাদিগকে "স্বেদজ" নামে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়েও কোন কোন লেখক ঐ মতের পোষকতা করিয়াছেন। কিন্তু যতই অনুসন্ধান বৃদ্ধি হইতেছে, ততই স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, অন্য জীবিত পদার্থের সাহায্য ব্যতীত জন্মগ্রহণ অসম্ভব। পূতিগন্ধময় পয়ঃপ্রণালীর মধ্যে যে মশকাদি জীব জন্মায়, সেখানে প্রথমে চতুর্দ্দিকের বাতাস হইতে তাহাদের উৎপাদক গিয়া উপনিবেশ করে, তৎপরে সন্তান উৎপন্ন হয়। পচা ঘায়ে যে সকল পোকা জন্মায়, তাহারা কেবল বায়ু হইতে আসিয়া সেখানে উপনিবেশ করে মাত্র। পরে যখন তাহাদিগের বহুসংখ্যক সন্তান উৎপন্ন হয় ও ঘায়ের রসে শরীর

বাড়িয়া উঠে, তখনই আমরা চক্ষে দেখিতে পাই। পাঁচড়ার ঘায়ের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ কীট, উদরের ক্রমিগণের স্ত্রী ও পুরুষ ক্রমি, মস্তকের উৎকুণের স্ত্রী ও পুরুষ দেখিলেই বোধ হয় যে, সন্তান উৎপাদনের যথেষ্ট আয়োজন সর্ব্বত্রই বিদ্যমান রহিয়াছে। অতি ক্ষুদ্র কীটাণুগণের মধ্যে কতকগুলির স্ত্রী পুরুষ নাই; এক মাত্র প্রভব হইতে সন্তান উৎপন্ন হয়। আচার্য্য হেকেলের মতে এই সকল জীবকে অমিথুনজন্মা জীব বলা উচিত। তাঁহার মতে ইহাদের সংখ্যা মিথুনজন্মাদিগের অনেক গুণ অধিক। বিগত বিংশতি বৎসরের মধ্যে 'জীবাণু' বিদ্যার অসাধারণ উন্নতি বশতঃ জানিতে পারা গিয়াছে যে, এই পৃথিবীর বায়ু, জল, মৃত্তিকা প্রভৃতি সর্ব্বত্র অসংখ্য অসংখ্য উদ্ভিদ্ ও প্রাণি-ডিম্বে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। তাহাদের অসংখ্য প্রকার জাতি আছে, প্রত্যেক জাতির নির্দ্দিষ্ট ক্রিয়া আছে, কেহ মনুষ্যের উপকারী, কেহ অপকারী। কোন জাতি ফল পরিপক্ব করে, কোন জাতি মৃত-দেহ পচাইয়া নষ্ট করে এবং পৃথিবীর আবর্জনা দূর করে, এক শ্রেণী দ্বারা জ্বরাদি রোগ অপর শ্রেণীর দ্বারা বিসূচিকাদি রোগ মনুষ্য মধ্যে উৎপন্ন হয়। তাহাদের উৎপাদিকা শক্তি এত ভয়ঙ্কর যে যদি সূর্য্য অগ্নি প্রভৃতির উত্তাপও অন্যান্য নানাবিধ উপায়ে প্রতি মুহূর্ত্তে তাহাদের কোটী কোটী ধ্বংস হইয়া না যাইত তবে দুই চারি দিনের মধ্যেই তাহারা পৃথিবী পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিত। কিন্তু এ হেন ক্ষুদ্র জীব এবং উদ্ভিদ্ ডিম্বাণু ও স্বয়ং উৎপন্ন হয় না। হস্তী যেমন অন্য হস্তী ব্যতীত উৎপন্ন হয় না, বট বৃক্ষ যেমন বটের বীজ ভিন্ন জন্মে না ইহারাও তদ্রূপ অন্য জীব ও উদ্ভিদ ডিম্বাণু ব্যতীত উৎপন্ন হইতে পারে না।

আবার, উদ্ভিদ্‌গণের মধ্যে যে গুলি সপুষ্পক, তাহাদের স্ত্রী ও পুরুষ অর্থাৎ গর্ভ ও পরাগকেশর দ্বারা ফল উৎপন্ন হয়; কিন্তু যে সকল উদ্ভিদ্ অপুষ্পক অর্থাৎ যাহাদের পুষ্প হয় না, তাহারাও অপবীজ দ্বারা ফলোৎপাদন করে।

অতএব প্রাণী ও উদ্ভিদ্‌গণ অর্থাৎ জীবিত পদার্থ মাত্রেই অন্য জীবিত পদার্থ দ্বারা উৎপন্ন হয়, স্বয়ং কথনই উৎপন্ন হইতে পারে না। রসায়ন শাস্ত্রের উন্নতি দ্বারা সম্পূর্ণরূপ প্রমাণীকৃত হইয়াছে যে, নির্জ্জীব বা পার্থিব পদার্থ মিশাইয়া জীবিত পদার্থের শরীরের কোনও অংশ প্রস্তুত করা যায় না। ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ মিশাইয়া কতই নূতন দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে, কতই সুখের বৃদ্ধি হইতেছে ও কতই জ্ঞানের উন্নতি হইতেছে, তথাপি এক টুক্‌রা চর্ম্ম বা মাংস, একটী পত্র বা মূল, অথবা এক রতি পরিমাণে বৃক্ষের ত্বক্ অদ্যাপি কেহই প্রস্তুত করিতে পারেন নাই। জীবিত পদার্থ জীব ভিন্ন উৎপন্ন হয় না। এ কথা এতই সত্য যে, ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ নির্ণয় করিয়াছেন যে, যে সকল প্রাণী ও উদ্ভিদের প্রভব নষ্ট হইয়াছে, সেই সেই জাতীয় জীব এবং উদ্ভিদ্‌গণও পৃথিবী হইতে উচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে।

ডারবিন, স্পেন্সর প্রভৃতি যে সকল পণ্ডিত বিবর্ত্তনবাদের আদিগুরু, তাঁহাদিগের সহিত উপরোক্ত মতের অসামঞ্জস্য নাই। তাঁহাদের মতে আদিম কীটাণুর পর আর জীব-সৃষ্টি হয় নাই; তাহারাই সাক্ষাৎ ভাবে অথবা বিবর্ত্তিত হইয়া লক্ষ লক্ষ বৎসরে উচ্চতর জীবের আকার ধারণ করিয়াছে। তাহারাই বর্ত্তমান মনুষ্যাদি উচ্চ-শ্রেণীস্থ জীবগণের পূর্ব্বপুরুষ এবং তাহাদেরই বংশধরেরা এক্ষণে এই জগৎ পরিপূর্ণ করিয়া রহিয়াছে। এই মত

সত্য হইলেও বর্ত্তমান জগতে "এক জীব ভিন্ন জীবান্তর উৎপন্ন হইতে পারে না" এ কথা অসঙ্গত হইতে পারে না। কিন্তু বাশ্চিয়ান্, পাউচেট, বির্শো প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বলেন যে, আদিম কীটাণুগণের বিবর্ত্তনেই ইহজগতের যাবতীয় জীব উৎপন্ন হইয়াছে;—আর সেই আদিম কীটাণুগণও অচেতন পদার্থ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহাদের মতের এই শেষ অংশের সহিত আমাদিগের ঐক্য নাই। অচেতন হইতে ক্ষুদ্রতম সচেতনের উৎপত্তি অদ্যাপি কেহই প্রমাণ করিতে পারেন নাই। পক্ষান্তরে ফরাসি পণ্ডিত পাস্তুর বহুবিধ পরীক্ষা দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে ক্ষুদ্রতম কীটাণু বা উদ্ভিদাণু পর্য্যন্ত পূর্ব্বজাত কীট বা উদ্ভিদাণু হইতেই উৎপন্ন হয়; তাহারা কেহই স্বয়ম্ভূত নহে।

দ্বিতীয়তঃ। জীবিত পদার্থ মাত্রেই জল, বায়ু ও উত্তাপ ব্যতীত জীবিত থাকে না। এই পুস্তকের অন্যত্র লিখিত হইয়াছে যে, যে বায়ুরাশির মধ্যে আমরা নিমজ্জিত রহিয়াছি, তাহাতে অম্লজান নামে এক প্রকার বাষ্প আছে। সেই বাষ্প প্রাণী ও উদ্ভিদ্‌গণের শরীরে প্রবেশ করিয়া, অঙ্গার নামক পদার্থের সহিত সংযুক্ত হইতেছে এবং তাহাতেই জীবনরূপ কলের কার্য্য চলিতেছে। গুল্ম, তরু ও লতা, কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী ও মনুষ্য—প্রাণবিশিষ্ট পদার্থ মাত্রেরই ভিতর অম্লজান প্রবেশ করিতেছে, এবং তাহাতেই তাপ উৎপন্ন হইতেছে ও জীবনের কার্য্য চলিতেছে। অগাধ-জল-সঞ্চারী জীব ও জলজ উদ্ভিদ্, আরণ্য পশু ও বৃক্ষ, সকলেই বায়ুর সাহায্যে, তাপের সাহায্যে জীবনের কার্য্য করিতে সক্ষম হইতেছে। যদি পৃথিবীর ন্যায় অন্যান্য গ্রহাদিতে আমাদের মত জীব থাকে, তাহা হইলে সেখানেও এই দুইটী থাকা

আবশ্যক। পুনশ্চ, জীবিত পদার্থ মাত্রেরই শরীরের অধিকাংশ জলে পরিপূর্ণ, এই জল রাত্রিদিন যেমন শরীর হইতে নষ্ট হইতেছে তেমনই তাহার পূরণ হওয়া আবশ্যক, নতুবা প্রাণী ও উদ্ভিদ্‌গণ বাঁচিতে পারে না।

তৃতীয়তঃ। জীবিত পদার্থ মাত্রেই ছোট অবস্থা হইতে ক্রমে বড় হয়। কিন্তু ছোট পদার্থকে বড় হইতে দেখিলেই যে, তাহাকে জীবিত পদার্থ বলিতে হইবে, তাহা নহে। উদ্ভিদ্‌ ও জন্তুগণ যেমন ছোট হইতে বড় হয়, লবণ প্রভৃতি দুই একটী পার্থিব পদার্থও অবস্থাবিশেষে সেইরূপ ছোট ডেলা হইতে বড় হয়। কিন্তু জীবিত পদার্থ যখন বাড়িতে থাকে, তখনও তাহার ক্ষয় হয়, নির্জ্জীব পদার্থের তাহা হয় না।

চতুর্থতঃ। জীবিত পদার্থ মাত্রেই আহার করিয়া থাকে। জীবিত থাকিতে হইলে রাত্রিদিন শরীরের যে ক্ষয় হয়, তাহার পূরণ করাই আহারের উদ্দেশ্য। রাত্রিদিন শরীর কিরূপে ক্ষয় হয়, তাহা পরে বলা যাইবে। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, জীবিত পদার্থ মাত্রেই আহার করে। অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা যে জীবকে একটী শ্বেত বিন্দুবৎ বোধ হয়, সেও নিজের অপেক্ষা ক্ষুদ্র পদার্থকে বেষ্টন করে এবং কিয়ৎক্ষণ পরে আত্মসাৎ করিয়া ফেলে। বড় বড় উদ্ভিদ্‌গণ মূল ও পত্র দ্বারা খাদ্য সংগ্রহ করে, জলজ উদ্ভিদ্‌গণ জল ও বায়ু হইতে, এবং যে সকল উদ্ভিদ্‌ প্রস্তরখণ্ডাদির উপর জন্মে, তাহারা কেবল বায়ু হইতে খাদ্য প্রাপ্ত হয়।

পঞ্চমতঃ। জীবিত পদার্থমাত্রেই মরণ ধর্ম্মশীল। এমন কোন জীবিত পদার্থ কেহ দেখেন নাই, যাহা এই নিয়ম-বর্জ্জিত।

জীবিত ও জীবনহীন পদার্থের বিভেদ বর্ণনা করা হইল।

এক্ষণে প্রাণী ও উদ্ভিদ,—জীবিত পদার্থের এই দুই শ্রেণীর পরস্পরের বিভেদ বর্ণনা করা যাউক।

প্রথমতঃ। উদ্ভিদ্‌গণ মৃত্তিকা হইতে রস এবং বায়ু হইতে অঙ্গার ও অম্লজান গ্রহণ করিয়া নিজ শরীর পোষণ করে। মৃত্তিকার রসে যে বহুবিধ ধাতব ও অধাতব পদার্থ গলিয়া থাকে, প্রধানতঃ তাহা দ্বারাই উদ্ভিদ্‌গণ জীবিত থাকে ও বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু জন্তুগণ এরূপ পদার্থ খাইয়া বাঁচিতে পারে না। এই সকল ধাতু-পদার্থ উদ্ভিদ্‌শরীরে জীর্ণ হইয়া, যখন ফল, মূল, পত্র, পুষ্পাদি রূপে পরিণত হয়, জন্তুগণ তখন সেই ফলমূলাদি ভক্ষণ করিয়া জীবিত থাকে। এই হিসাবে দেখিতে গেলে উদ্ভিদ্‌গণকে জন্তু-গণের পাচক ভৃত্য বলিয়া বোধ হয়। মৃত্তিকারূপ মহাভাণ্ডার হইতে বিমিশ্র ও অবিশুদ্ধ অবস্থায় নানাবিধ পদার্থ উদ্ভিদ্‌গণ গ্রহণ করিতেছে এবং তাহাদিগকে তৈল, চিনি, শ্বেতসার, মাংসিক প্রভৃতি পদার্থে পরিণত করিয়া ফল, মূল, পত্র প্রভৃতি সর্ব্বত্র ছড়াইয়া দিতেছে। আবার সেই সকল ফল, মূল প্রভৃতি ভক্ষণ করিয়া জন্তুগণের শরীরে রক্ত মাংস প্রভৃতি পদার্থ হইতেছে।

দ্বিতীয়তঃ। উদ্ভিদ্‌গণের পরিপাক-যন্ত্র, শ্বাসযন্ত্র প্রভৃতি শারীরিক যন্ত্র সকল শরীরের বাহিরে থাকে। মূল, পত্র প্রভৃতি দ্বারা এই সকল কার্য্য সম্পন্ন হয়; জন্তুগণের এই সকল যন্ত্র শরীরের ভিতরে থাকে।

তৃতীয়তঃ। উদ্ভিদ্‌গণের শরীর অঙ্গারপ্রধান, অর্থাৎ শ্বেতসার প্রভৃতি যে সকল দ্রব্যে অঙ্গার নামক রূঢ় পদার্থ অধিক পরিমাণে আছে, তাহাই উদ্ভিদ্-শরীরের প্রধান উপাদান। জন্তুগণের শরীর যবক্ষারপ্রধান, অর্থাৎ অণ্ডলাল প্রভৃতি যে সকল দ্রব্যে যবক্ষার

নামক রূঢ় পদার্থ অধিক পরিমাণে আছে, তাহাই জন্তু-শরীরের প্রধান উপাদান।

চতুর্থতঃ। অধিকাংশ জন্তুই জঙ্গম, অর্থাৎ নড়িয়া বেড়াইতে পারে এবং প্রায় সকল উদ্ভিদ্‌ই স্থাবর, অর্থাৎ নড়িতে পারে না। কিন্তু কদাচিৎ ইহার বিপর্য্যয় দেখা যায়। অতি নিম্নশ্রেণীর দুই একটী প্রাণী নড়িতে পারে না, এবং দুই একটী উদ্ভিদ্ এত সুন্দর-রূপ নড়িতে পারে যে, তাহাদিগের স্পন্দন অধঃশ্রেণীস্থ প্রাণীদিগের তুল্য। সর্ব্বজন-পরিজ্ঞাত লজ্জাবতীর গাছ ইহার একটী দৃষ্টান্ত। ইহাকে স্পর্শ করিলেই স্পন্দন-ক্রিয়া লক্ষিত হয়। অতএব কোন পদার্থকে স্পন্দনশীল দেখিলেই যে জন্তু বলিতে হইবে, অথবা স্পন্দন না দেখিলেই যে উদ্ভিদ্ বলিতে হইবে, তাহা নহে।

বাস্তবিক সর্ব্বনিম্নস্থ উদ্ভিদ্ ও সর্ব্বনিম্নস্থ প্রাণিগণের পরস্পরের বিভেদ অনুভব করা এতই কঠিন যে, শিক্ষার্থিগণের উল্লিখিত কথা কয়টী স্মরণ রাখা অতীব আবশ্যক। গো, মহিষ, মনুষ্য প্রভৃতি বড় বড় প্রাণীর সহিত বট, অশ্বথ প্রভৃতি উদ্ভিদের বিভেদ এতই অধিক যে, ইহাদিগকে তুলনা করা অনাবশ্যক বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু সর্ব্বনিম্নস্থ শ্রেণীর প্রাণী ও সর্ব্বনিম্নস্থ শ্রেণীর উদ্ভিদের এতই সৌসাদৃশ্য যে, অগাধ পাণ্ডিত্য থাকিলেও সময়ে সময়ে তাহাদিগের স্বরূপ নিরূপণ করা কঠিন হয়। এই সকল স্থলে হস্ত, পদ, চক্ষু প্রভৃতি প্রাণীর লক্ষণ অথবা মূল, কাণ্ড পত্র প্রভৃতি উদ্ভিদের লক্ষণ কিছুই না থাকাতে কেবলমাত্র স্পন্দন বা নড়িবার ক্ষমতা আছে কি না দেখিয়া পদার্থের স্বরূপ নিরূপণ করিতে হয়। তাহাতেও সন্দেহ ভঞ্জন হয় না; কারণ, সর্ব্বনিম্নস্থ প্রাণিগণ যেমন নড়িতে পারে, উদ্ভিদ্‌গণও তদ্রূপ নড়িতে পারে।

সুতরাং অমুক পদার্থ উদ্ভিদ্ কিম্বা প্রাণী, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ হইয়া উঠে। সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর অত্যধিক সিসৃক্ষা বশতঃ প্রকাণ্ড পৃথিবীর সর্ব্বত্রই প্রাণী ও উদ্ভিদ্ বিতরণ করিয়াছেন, এবং ইহাদিগের উভয়কে যে অসংখ্য শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন, তাহারা দূরাগত দুইটী সরল রেখার ন্যায় এক সূক্ষ্ম কোণে মিলিত হইয়াছে। তাহাদের এক প্রান্ত ভাগ পরস্পর এত সন্নিহিত যে, উভয়ের কিছুই দূরত্ব দেখা যায় না; কিন্তু অপর প্রান্তের দিকে যতই দূরে গমন করা যায়, ততই রেখাদ্বয়ের পরস্পরের দূরত্ব লক্ষিত হইয়া থাকে।

পক্ষান্তরে প্রাণিগণের মধ্যে কীটাণু হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত যে অশেষবিধ শ্রেণী রহিয়াছে, তাহারা সোপানরাজির ন্যায় অতি অল্পে অল্পে উপরের দিকে উঠিয়াছে। সোপান-শ্রেণীর ধাপগুলির যেমন প্রত্যেক ধাপ নীচের ধাপ অপেক্ষা অতি অল্প উচ্চ বটে, তথাপি বহুসংখ্যক এইরূপ ধাপ থাকাতে অতি নিম্ন হইতে উচ্চ স্থানে আরোহণ করা যায়, সেইরূপ অতি ক্ষুদ্র কীটাণু হইতে এক এক ধাপ উঠিয়া ক্রমেই বৃহত্তর জন্তু সকল দেখিতে পাই। পরিশেষে মৎস্য, সরীসৃপ, পক্ষী প্রভৃতি প্রাণিরূপ ধাপে উঠিলেই স্তন্যপায়িগণ দেখা যায়। তাহার মধ্যেও গৃহপালিত বিড়াল, কুকুর হইতে হিংস্র ব্যাঘ্র. ভল্লুক পর্য্যন্ত সকল জন্তুই যেন এক একটী ধাপের ন্যায়; একটী অপেক্ষা অপরটী কিঞ্চিৎ উচ্চতর স্থানে রহিয়াছে। তাহাদের পর বানর, বনমানুষ ও সর্ব্বোচ্চ ধাপে মানবগণ অবস্থান করিতেছে। অন্যান্য জন্তুর সহিত মনুষ্যের কি বিভেদ, তাহাই এক্ষণে বর্ণনা করা যাইবে।

প্রথমশিক্ষা

শারীর-বিধান।

প্রথম অধ্যায়।

পশু ও মনুষ্য।

মানবগণ এই জগতে কিরূপে জন্মগ্রহণ করে, জন্মিয়া কিরূপে দেখে, শুনে, আহার নিদ্রা ও জীবনের অন্যান্য কার্য্য করে, কিরূপে শিশু হইতে যুবা হয়, যুবা হইতে বৃদ্ধ হয়, এবং পরিশেষে কিরূপে মরিয়া যায়, এই সকল কথা যে শাস্ত্র পাঠ করিলে জানা যায়, তাহাকে শারীর-বিধান-বিদ্যা কহে।

ভাল, মানবজীবনের এই সকল কার্য্য কি গো, মহিষ, বানর প্রভৃতি বড় বড় জন্তুর জীবনের কার্য্যের মত নহে? আমরাও আহার নিদ্রাদি কার্য্য সকল করিতে থাকি ও কিছু দিন পরে মরিয়া যাই, তাহারাও তাহাই করে, তবে চতুষ্পদ ও মানবগণের শারীর-বিধানের বিভেদ কি? সকলেই জানেন যে, ইহার প্রথম উত্তর এই যে, আমাদের যে বুদ্ধি আছে, তাহাদের তাহা নাই, এবং তজ্জন্যই অনেক বিভেদ ঘটিয়া থাকে। বাস্তবিক বুদ্ধির তারতম্য বশতঃই আমরা জগতের অধিকাংশ সুখ অধিকার করিয়াছি, আর তাহারা হয় বনে বনে ঘুরিতেছে, নতুবা আমাদের

জন্য খাটিতেছে। বুদ্ধিটুকু বাদ দিলে মানব কি ইতর জন্তুই হয়!—হস্তী অপেক্ষা কত ছোট, সিংহ ব্যাঘ্র অপেক্ষা কত দুর্ব্বল, পক্ষী অপেক্ষা কত কুৎসিত!—ভাবিয়া দেখ, মানব যদি গোমহিষাদির ন্যায় বুদ্ধিবিশিষ্ট হইত, তাহা হইলে বনের মধ্যে কি নিকৃষ্ট জীব বলিয়াই গণ্য হইত!

কিন্তু বুদ্ধি থাকিয়াও যদি কথা কহিবার ক্ষমতা না থাকিত, তাহা হইলে মানবের বুদ্ধি থাকা বৃথা হইত। পশুগণ নানাপ্রকার শব্দ করিয়া ভয় হর্ষ প্রভৃতি ব্যক্ত করিতে পারে। কিন্তু যাহা কিছু স্মরণ করিয়া, বিবেচনা বা বিচার করিয়া অন্যকে জানাইতে হয়, তাহা বাক্য ভিন্ন অন্য উপায়ে জানান প্রায় অসম্ভব। সুতরাং বাক্‌শক্তি মনুষ্য-বুদ্ধির প্রধান সহায়, এবং ইহাই পশুগণের সহিত দ্বিতীয় বিভেদ।

তৃতীয়তঃ। পশুগণের সম্মুখ-চরণদ্বয় প্রায় সর্ব্বদাই চলিবার নিমিত্ত ব্যবহার করিতে হয়, মানুষের বাহু ও হস্তদ্বয় তাহা না হইয়া কেবল কার্য্যের নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়। আমাদের হস্তের অঙ্গুষ্ঠ বড় হওয়াতে অন্যান্য অঙ্গুলির সঙ্গে উহাকে যেমন মুখামুখি করিয়া এক করা যায়, এবং সেই জন্য ছোট বড় সকল দ্রব্যই যেমন আমরা ধরিতে পারি, তাহাদের বুড়া আঙ্গুল ছোট বলিয়া তাহারা সেরূপ করিতে পারে না। সুতরাং আমরা নানা প্রকার প্রয়োজনীয় ও সুখদ পদার্থ প্রস্তুত করিতে পারি, তাহারা পারে না।

চতুর্থতঃ। আমাদিগের শরীর যেমন দুই পায়ের উপর খাড়া হইয়া দাঁড়ায়, মুখও তদ্রূপ শরীরের সহিত এক সরলরেখায় খাড়া হইয়া সকল পদার্থ দেখিতে শুনিতে পায়। যদি পশুগণের ন্যায়

চারি পায়ে চলিতে হইত, তাহা হইলে মনুষ্যের অবস্থা পশুর অপেক্ষাও মন্দ হইত। কারণ, পশুগণের মুখ গলার সঙ্গে এক রেখায় না থাকিয়া বাঁকাভাবে থাকে, তজ্জন্য তাহারা ইচ্ছামত অনেক দিকে মুখ ফিরাইতে পারে। কিন্তু মানুষের মুখ শরীরের সহিত যেরূপ এক সরলরেখায় থাকে তাহাতে যদি চারি পায়ে চলিতে হইত, তাহা হইলে মুখ সর্ব্বদাই ভূমি দেখিতে পাইত, অতি কষ্টে এক বার মুখ তুলিয়া আকাশের সূর্য্য বা গাছের ফল দেখিতে হইত, এবং মুখ দ্বারা কিছু ধরিয়া খাইতে গেলেই চিবুক ও কপাল ভূমির সহিত ঘষিয়া যাইত।

পঞ্চমতঃ। মানুষ সোজা হইয়া দাঁড়াইলে হাঁটু ও উরু দুইটী অতিশয় কাছে কাছে আইসে। এরূপ না হইলে দুই পায়ে দাঁড়ান বা দুই পায়ে চলা কঠিন হইত। বেহারারা পাল্কীর দুই ধারের দণ্ড স্কন্ধে লইয়া পাল্কী উঠাইলে যেমন অভ্যন্তরস্থিত আরোহীর ভার ঠিক মধ্যস্থলে পড়ে, মানুষ সোজা হইয়া দাঁড়াইলে, তেমনই তাহার শরীরের ভার-কেন্দ্র অর্থাৎ সমস্ত ভারের ঠিক্ মধ্যস্থল পৃষ্ঠের মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়া দুই উরুর ঠিক্ মধ্যস্থলে পড়ে। চলিবার সময় যখন একখানি পা উঠান যায়, তখন মুহূর্ত্ত কালের জন্য শরীরের সমস্ত ভার একটী উরুর উপর আসিয়া পড়ে। যদি পশুগণের ন্যায় আমাদের উরুদ্বয় পরস্পর অধিক দূরে থাকিত, তাহা হইলে চলিবার সময় সমস্ত ভার শীঘ্র শীঘ্র এক উরু হইতে অন্য উরুতে যাইতে পারিত না; সুতরাং চলিতে গেলে পড়িয়া যাইতে হইত। মনুষ্যগণের মধ্যে যাহাদের নিতম্ব বড় বলিয়া উরুদ্বয় পরস্পর অধিক দূরে থাকে, তাহাদের চলিবার সময় (যখন এক উরু হইতে অন্য উরুর উপর

সমস্ত ভার যায়, তখন) নিতম্বদেশ পার্শ্বাপার্শ্বি দুলিতে থাকে, এবং অতি কষ্টে সমস্ত শরীরের ভার-কেন্দ্র এক দিক হইতে অন্য দিকে লইয়া যায়। হস্তীর ও হংসের গমন এইরূপ বলিয়া কবিগণ ইহাকে "গজেন্দ্রগমন" বা "মরালগমন" কহেন।

ষষ্ঠতঃ। মানবগণ সকল ঋতু ও সকল দেশেই শীতাতপ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ। আমরা শীতকালে ও শীতপ্রধান দেশে মোটা কাপড় এবং গ্রীষ্মের সময় তদুপযুক্ত কাপড় প্রস্তুত করিয়া আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইব বলিয়া, মিতব্যয়ী বিধাতা আমাদিগকে বড় বড় লোম দেন নাই; কিন্তু জন্তুগণের মধ্যে যে যেমন দেশে থাকিবে, তাহার শরীরের আচ্ছাদন তদুপযুক্ত করিয়াছেন।

সপ্তমতঃ। কোন জন্তুর কোন ইন্দ্রিয় তীক্ষ্ণ, কিন্তু মানবগণের সকল ইন্দ্রিয়ই প্রায় সমান কার্য্যক্ষম।

বড় বড় পশুর সঙ্গে মানুষের এইগুলি প্রধান বিভেদ। এই গ্রন্থে যেখানে যেখানে জন্তু বিশেষের নাম উল্লিখিত হইবে, তদ্ব্যতীত অন্য সকল বিষয়ে উচ্চশ্রেণীস্থ পশুগণের সঙ্গে মানুষের শারীর-বিধানের বিভেদ নাই, অথবা অতি অল্প বিভেদ আছে, বুঝিতে হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

মানবের জন্ম।

যে ক্রিয়া দ্বারা মানবগণ জননীর শরীরে গঠিত ও বর্দ্ধিত হয়, এবং পরিশেষে স্বাধীনভাবে জীবনধারণ করিবার উপযুক্ত হইয়া তাহা হইতে বাহির হয়, তাহাকে মানব-জন্ম কহে।

মনুষ্য ও অন্যান্য অধিকাংশ জীবেরই পিতামাতার সাহায্যে এই কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে! কীটাণু প্রভৃতি অনেক প্রকার জীবের একমাত্র প্রভব হইতে সন্তান উৎপন্ন হয়; সুতরাং তাহাদের পক্ষে এ নিয়ম নহে। অন্যান্য জীবগণের মধ্যে সকলেরই পিতামাতার আবশ্যক আছে বটে, কিন্তু সকলের সমান আবশ্যক নহে। মৎস্য প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীস্থ অনেক জীব জন্মিবার পূর্ব্বে পিতামাতার সংযোগ আবশ্যক হয় না। মাতার শরীর হইতে যে ডিম্ব পতিত হয়, তাহা কোন উপযুক্ত স্থানে রক্ষিত হইলে পিতা আসিয়া স্বীয় বীর্য্য তাহার সহিত একত্রিত করিয়া ডিম্বকে প্রস্ফুটিত করে। যাহাদের মধ্যে পিতামাতার সংযোগ আবশ্যক তাহাদেরও আবশ্যক সকলের সমান নহে। প্রজাপতি প্রভৃতি পতঙ্গগণ, ভেক প্রভৃতি উভচরগণ, এবং দংশ, মশক প্রভৃতি অন্যান্য অনেক নিকৃষ্ট জীব জন্মগ্রহণ সময়ে যেরূপ আকার-বিশিষ্ট হয়, সে আকারের কত পরিবর্ত্তন হইয়া পূর্ণবর্দ্ধিত প্রজাপতি বা পূর্ণাবয়ব ভেক হয়, তাহা সকলেই দেখিয়াছেন। যেন এই সকল জীবের অল্পকালস্থায়ী জীবনের জন্য মাতাকে বহু দিন

কষ্ট দিবার প্রয়োজন নাই বলিয়াই ইহাদিগকে অর্দ্ধগঠিত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ করা হয়। কিন্তু যতই উচ্চশ্রেণীতে আরোহণ করা যায়, ততই পিতামাতার গাঢ়তর সংযোগ দেখা যায়। ততই মাতার শরীরে সন্তানের দীর্ঘ কাল বাস লক্ষিত হয়, এবং সন্তানও জন্ম-গ্রহণসময়ে ততই পিতামাতার সদৃশ আকারবিশিষ্ট হয়। স্তন্যপায়ী জীবগণ জন্মের পরও কিয়দ্দিবস মাতার দুগ্ধ পান করে বলিয়া তাহাদিগের মধ্যে অপত্যস্নেহ অপেক্ষাকৃত অধিক হয়। জীব-শ্রেষ্ঠ মনুষ্যের মধ্যে মাতা ও সন্তানের যে গাঢ়তম ও দুশ্চ্ছেদ্য সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তাহাতেই আমরণস্থায়ী অপত্যস্নেহ ও মাতৃ-ভক্তির ভিত্তি গ্রথিত হয়। মনুষ্যগণেরও মাতার সহিত যেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, পিতার সহিত সেরূপ নহে। বাস্তবিক, জন্মসম্বন্ধে আমাদিগের পিতার সাহায্য কিরূপ, কেনই বা এই সাহায্য আবশ্যক হয়, শারীর-বিধানবিদ্‌গণ তাহা অদ্যাপি সম্যক্‌রূপ বুঝিতে পারেন নাই। অতএব প্রকৃত বিষয় আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই এ কথা শেষ করা উচিত।

১। জন্মসম্বন্ধে পিতার কার্য্য।

সকলই জানেন যে, চতুর্দ্দশ হইতে ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় পুরুষের অণ্ডাধার হইতে সময়ে সময়ে এক প্রকার রস নিঃসৃত হইয়া থাকে। ইহার নাম শুক্র, রেতঃ বা বীর্য্য। অণু-বীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, এক প্রকার জলীয় পদার্থ ও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানার ন্যায় পদার্থ একত্রিত হইয়া এই রস উৎপন্ন হইয়াছে। জলীয় অংশে তরল শ্লেষ্মা, সামান্য লবণ এবং দুই তিন প্রকার ক্ষার পদার্থ আছে।

দানাগুলিকে ভিজাইয়া রাখা এবং তাহাদিগকে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গড়াইয়া দেওয়া এই রসের উদ্দেশ্য। দানাগুলির উপাদান ও ক্রিয়া অতি আশ্চর্য্য। প্রত্যেক দানার একটী মুণ্ড বা মস্তক এবং একটী লাঙ্গূল আছে। জীবিত মনুষ্যের শরীর হইতে শুক্র পতিত হওয়ার বহু ক্ষণ পরেও অণুবীক্ষণ দ্বারা পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, সহস্র সহস্র দানা লাঙ্গূল নাড়িয়া নৃত্য করিতেছে এবং প্রত্যেকেই এক এক নির্দ্দিষ্ট দিকের অভি-মুখে গমন করিতেছে। প্রত্যেক দানা মস্তক হইতে লাঙ্গূল পর্য্যন্ত ১/৫০০ বা ১/৬০০ ইঞ্চ দীর্ঘ এবং অতিশয় স্বচ্ছ। ইহারা নির্দ্দিষ্ট দিকে গমন করিতে সক্ষম বলিয়া কেহ কেহ ইহাদিগকে "শুক্র-কীটাণু" আখ্যা প্রদান করিয়াছেন, এবং ইহারা যে মনুষ্য-শরীরনিবাসী কীট বিশেষ ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, এই মত ভ্রমাত্মক। * ইহারা জীব নহে, কেবল মাত্র লাঙ্গূলের স্বয়ম্ভূত চলিষ্ণুতা বশতঃ ইতস্ততঃ গমন করিতে সমর্থ হয়। এই সকল শুক্র-কীটাণু মনুষ্য-শরীর হইতে বাহির হওয়ার পর যদি রৌদ্রাদির উত্তাপে শুষ্ক হইয়া না যায়, প্রচুর জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া না যায়, এবং যদি ইহাদিগকে সাব-ধানে কাচপাত্রে ধরিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা পর্য্যন্ত চঞ্চল অবস্থায় থাকিতে পারে; এবং যদি স্ত্রীলোকের শরীরের ভিতর প্রবেশ করে, তাহা হইলে সেখানে সপ্তাহের অধিক কালও নড়িয়া বেড়াইতে পারে। ইহাদিগের চলৎ-শক্তি

* "শুক্র কীটাণু" কথাটী ভ্রমাত্মক হইলেও ইহার সমার্থবোধক শব্দ অন্যান্য ভাষায় ব্যবহৃত হয় বলিয়া, এখানেও উহা রক্ষিত হইল।

এত অধিক যে, ইহারা তের মিনিটের মধ্যে এক ইঞ্চ চলিতে পারে।

এই সকল শুক্র-কীটাণুর কার্য্য কি, তাহা অদ্যাপি উত্তমরূপে বুঝিতে পারা যায় নাই। দেখা গিয়াছে যে, প্রায় সকল শ্রেণীর জন্তু-তেই এই দানা আছে। জানিতে পারা গিয়াছে যে, এই সকল দানা না থাকিলে বা কম পড়িলে সন্তান উৎপন্ন হয় না; এবং মাতৃগর্ভস্থিত ডিম্বের সহিত যতক্ষণ ইহাদের সংযোগ না হয়, ততক্ষণ ডিম্ব প্রস্ফুটিত হয় না। এই জন্য পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, ইহাদের দ্বারাই সন্তান উৎপন্ন হয়। কিন্তু ইহারা ডিম্বকে স্পর্শ না করিলে কেন ডিম্ব প্রস্ফুটিত হয় না, স্পর্শ করিলেই বা কিরূপে প্রস্ফুটিত হইয়া গর্ভসঞ্চার হয়, এই ক্ষুদ্র পদার্থের সংযোগে কিরূপে পিতার ন্যায় পুত্রের মুখাকৃতি, বুদ্ধিবৃত্তি ও মানসিক প্রবৃত্তি হয়; কিরূপে ভ্রাতা ভগিনীগণের আকার ও চরিত্রগত এত সৌসাদৃশ্য হয়, কিরূপে পিতার পীড়া, পিতার বর্ণ ও অন্যান্য গুণ সন্তানে সংক্রমিত হয়, সংক্ষেপতঃ কিরূপে পুত্র পিতার প্রতিবিম্বস্বরূপ হয়, তাহা আমরা বলিতে পারি না। এ সকল গুরুতর কথা অদ্যাপি যে গাঢ় তমসাচ্ছন্ন রহিয়াছে, সম্ভবতঃ আরও বহু কালের অনুসন্ধান ব্যতীত তন্মধ্যে জ্ঞানালোক প্রবেশ করিবে না।

একটী কথা নিশ্চিত জানা গিয়াছে। শুক্র যখন অণ্ডাধার-মধ্যে নির্ম্মিত হয়, তখন সমস্ত শরীর হইতে অনেক বল ব্যয়িত হয়। রক্তের উৎকৃষ্ট অংশ হইতে বীর্য্য উৎপন্ন হয় এ কথা সকল পণ্ডিতই স্বীকার করেন। মনুষ্য-শরীর হইতে যখন বীর্য্য পতিত হয়, তখন মেরুদণ্ডীয় মজ্জা ও সমস্ত স্নায়ুযন্ত্র অতিশয় অবসন্ন

হইয়া পড়ে। শীঘ্র শীঘ্র শুক্র শরীর হইতে পতিত হইলে কেবল যে সমস্ত শরীর অচিরাৎ দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে তাহা নহে; পরন্তু উত্তরোত্তর যতই শীঘ্র শীঘ্র শুক্র নিঃসৃত হয়, ততই জলীয়াংশের বৃদ্ধি এবং শুক্র-কীটাণুর হ্রাস হইতে থাকে এবং তদুৎপন্ন সন্তানাদিও দুর্ব্বল হয়। প্রাণী ও উদ্ভিদ্‌রাজ্যে এক মহান্ নিয়ম চিরকাল প্রচলিত রহিয়াছে:—'প্রত্যুৎপাদিকা শক্তি যে পরিমাণে পরিচালিত হইবে, শারীরিক ও মানসিক বলও সেই পরিমাণে কমিবে'।

২। জন্মসম্বন্ধে মাতার অংশ।

জল খাইবার ছোট ছোট ঘটী বা মাটির ছোট ঘট যেমন পেট-মোটা ও গলাসরু, স্ত্রীলোকের তলপেটের ভিতর প্রায় সেইরূপ আকারের একটী যন্ত্র নীচের দিকে মুখ দিয়া (উবুড় হইয়া) আছে। এই যন্ত্রের নাম জরায়ু। ঘটের যেমন উদর, গ্রীবা ও মুখ আছে জরায়ুরও তদ্রূপ আছে। এই যন্ত্রের ভিতর ভ্রূণ জন্মগ্রহণ করে। ইহা এতই বর্দ্ধনশীল যে, ভ্রূণ যত বড় হইতে থাকে ইহাও ততই বাড়িয়া উঠে, সুতরাং মাতার শরীর হইতে প্রসবকাল পর্য্যন্ত ভ্রূণ ইহার ভিতর থাকিতে কোন কষ্টই বোধ করে না। যখন গর্ভ পূর্ণ হয় তখন এই যন্ত্রটী একটী ছোট ঘড়ার মত বড় হইয়া উঠে। যখন গর্ভ থাকে না তখন ইহা ২¾ ইঞ্চ দীর্ঘ কিন্তু পূর্ণগর্ভাবস্থায় ১২½ হইতে ১৪½ ইঞ্চ দীর্ঘ হয়। আবার এই যন্ত্র এত স্থিতিস্থাপক যে, যখন মাতৃগর্ভ হইতে সন্তান প্রসব হইয়া যায় তখন ইহা শীঘ্র শীঘ্র আকুঞ্চিত হইয়া অতি অল্প দিনের মধ্যেই প্রায় পূর্ব্ববৎ ক্ষুদ্রাকার প্রাপ্ত হয়।

জরায়ুর উভয় পার্শ্ব হইতে দুইখানি বিস্তৃত, সূক্ষ্ম-সূত্র নির্ম্মিত পর্দ্দা বস্তি-গহ্বরের উভয় প্রান্তে গিয়াছে। এই পর্দ্দা দুইখানিকে বিস্তৃত-বন্ধনী কহে।

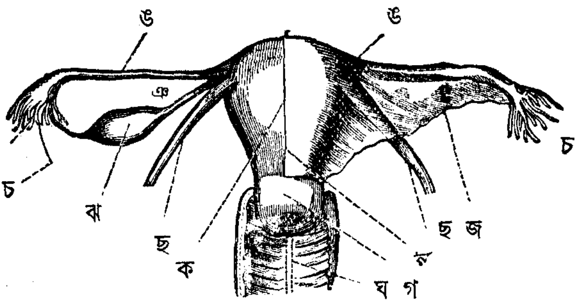
স্ত্রীলোকের তলপেটের দুই পার্শ্বে দুইটী ছোট ভাঁটার মত যন্ত্র আছে, উহারই ভিতর ডিম্ব জন্মে বলিয়া উহাকে ডিম্বাধার কহে। এক প্রকার সূত্রময় পদার্থ দ্বারা ডিম্বাধার জরায়ুর সহিত সংযুক্ত উহাকে 'ডিম্বাধারের বন্ধনী' কহে। মানুষের ডিম্ব হয় শুনিয়া অনেকে আশ্চর্য্য বোধ করিবেন, কিন্তু এই ডিম্ব পক্ষি-ডিম্বের ন্যায় বড় নহে, পরন্তু মৎস্য ডিম্বের দানা যেমন অতি ক্ষুদ্র, মনুষ্য-ডিম্ব তদপেক্ষাও ক্ষুদ্রতর। বালিকার জন্মাবধি ডিম্বাধারের ভিতর পনর ষোল হইতে কুড়িটী পর্য্যন্ত অতিক্ষুদ্র ফলের ন্যায় পদার্থ থাকে। ঐ ফলবৎ দানাগুলির প্রত্যেকের ভিতর জলের ন্যায় এক প্রকার পদার্থ ও তন্মধ্যে অতি ক্ষুদ্র একটী বীজ থাকে। ইহাই মনুষ্য-ডিম্ব। এই ডিম্ব এত ক্ষুদ্র যে ইহার ব্যাস ১/২৪০ ইঞ্চ পরিমিত। শৈশবাবস্থা হইতে আরম্ভ হইয়া যতদিন সন্তান হইবার সম্ভাবনা থাকে ততদিনই এই সকল ফলবৎ পদার্থ ও তন্মধ্যস্থিত ডিম্ব উৎপন্ন হয়। কিন্তু যৌবন কাল উপস্থিত না হইলে ঐ সকল ডিম্ব হইতে ভ্রূণ জন্মিতে পারে না। আর পঁয়তাল্লিশ হইতে পঞ্চাশ বৎসর বয়সের মধ্যে যখন সন্তান হইবার সম্ভাবনা একেবারে দূর হয় তখন আর ডিম্বও উৎপন্ন হয় না।

জরায়ু উদরের ঊর্দ্ধভাগের উভয় প্রান্ত হইতে দুই দিকে দুইটী সরু নল ডিম্বাধারের উপর পর্য্যন্ত গিয়াছে। ডিম্ব যখন স্বীয় আধার হইতে বাহির হয় তখন এই নলের প্রান্তে যে কতকগুলি সরু সরু চুলের মত পদার্থ আছে তাহাতেই ডিম্ব আটকাইয়া

যায়, তৎপরে এই নলের ভিতর প্রবেশ করিয়া ধীরে ধীরে জরায়ুর অভ্যন্তরে আসিয়া পড়ে। এই নল ডিম্বগুলিকে বহন করিয়া জরায়ুর ভিতর লইয়া যায় বলিয়া ইহাকে ডিম্ববাহক নল কহে। নলের ভিতর দিয়া জরায়ু মধ্যে ডিম্ব উপস্থিত হইতে আট দশ দিন সময় লাগে। ডিম্ববাহক নলের সম্মুখ হইতে দড়ির মত আকৃতি-বিশিষ্ট দুইদিকে দুইটা বন্ধনী উঠিয়া জননেন্দ্রিয়ের বহির্ভাগে গিয়াছে ইহাদের নাম "গোল-বন্ধনী"। নিম্নস্থ প্রতিকৃতি দেখিলেই এ বিষয়টী সুন্দররূপ হৃদয়ঙ্গম হইবে।

১ম প্রতিকৃতি। জরায়ু ও তৎসন্নিহিত যন্ত্র।

(ক) জরায়ু-উদর। (খ) জরায়ু-গ্রীবা। (গ) জরায়ু-মুখ। (ঘ) বহির্জননেন্দ্রিয় পথ। (ঙ ঙ) ডিম্ববাহক নল। (চ চ) ঐ নলের চুলবৎ অংশ। (ছ ছ) গোল বন্ধনী। (জ) বিস্তৃত বন্ধনী। (ঝ) ডিম্বাধার। (ঞ) ডিম্বাধারের বন্ধনী।



ডিম্বাধার হইতে জরায়ুমধ্যে আসিবার সময় কোন্ স্থানে শুক্র-কীটাণুর সহিত ডিম্ব মিলিত হয় তাহা নিশ্চয় বলা যায় না। কেহ কেহ বলেন শুক্র-কীটাণু সকল জরায়ু-মুখে প্রবেশ করিয়া ধীরে ধীরে জরায়ুমধ্যে উঠিয়া ডিম্ব-বাহক নলের ভিতর

দিয়া ডিম্বাধার পর্য্যন্ত গমন করে এবং তথায় ডিম্বকে স্পর্শ করে। কাহারও মতে ডিম্ববাহক নলের ভিতর এবং কোন কোন পণ্ডিতের মতে জরায়ুমধ্যে এই মাতৃ-পিতৃ অংশদ্বয়ের সাক্ষাৎ ও সম্মিলন হয়। কিন্তু যেথানেই হউক না কেন, ডিম্ব ও শুক্র-কীটাণু মিলিত হইলেই ডিম্ব প্রস্ফুটিত হইবে ইহা নিশ্চিত। কিরূপে প্রস্ফুটিত হয় তাহা বলা যায় না। যাহা হউক ডিম্ব প্রস্ফুটিত ও জরায়ু মধ্যে পতিত হইলে উহার যে বহুবিধ রূপান্তর হয় তাহাই এক্ষণে বর্ণনা করা যাউক।

জরায়ুমধ্যে প্রস্ফুটিত ডিম্বের বহুবিধ রূপান্তর।

প্রথমতঃ। প্রস্ফুটিত ডিম্ব জরায়ু মধ্যে পতিত হওয়ার অনতিবিলম্বে ডিম্বের উপর একটী দাগ পড়ে। ক্রমে ঐ দাগ গভীর হইয়া উঠে; তখন উহার উভয় পার্শ্ব উচ্চ হইয়া মুখামুখি হইয়া যায়, সুতরাং প্রথমে দাগ, তৎপরে গর্ত্ত ও পরে নল হয়। এই নল হইতে ভ্রূণের মস্তক ও পৃষ্ঠের মেরুদণ্ড নির্ম্মিত হয়।

দ্বিতীয়তঃ। এই নলের পার্শ্ব হইতে আর দুই খানি পর্দ্দা উঠিয়া পরস্পর মুখামুখি হইয়া মিলিয়া যায়, সুতরাং তাহাতে আর একটী নল হয়। এই নল হইতে সন্তানের বক্ষঃস্থল, উদর ও এই উভয়ের মধ্যে যত যন্ত্র আছে তৎসমুদায় নির্ম্মিত হইতে থাকে।

তৃতীয়তঃ। নাভিস্থলের বাহিরের দিকে একটী থলিয়া নির্ম্মিত হয়; সেই থলিয়াতে কিয়ৎ পরিমাণে পুষ্টিকর সামগ্রী থাকে। উহাতেই প্রথম কয়েক সপ্তাহ সন্তানের শরীর পুষ্ট হয়, কিন্তু কিয়দ্দিবস পরে জরায়ু ফুল নির্ম্মিত হইলে আর এই থলিয়ার আবশ্যক থাকে না বলিয়া ইহা শুষ্ক হইয়া যায়।

চতুর্থতঃ। ক্রমে ভ্রূণের গাত্র হইতে একটী থলিয়া বা ব্যাগের মত যন্ত্র নির্ম্মিত হয়। ইহার ভিতর জলের ন্যায় এক প্রকার পদার্থ থাকে বলিয়া ইহাকে জলভাণ্ড কহে। জলভাণ্ড সন্তানের রক্ষার্থ বড় উপকারী; ইহার ভিতর যে জলবৎ পদার্থ থাকে তাহাতেই সন্তান ভাসিতে থাকে, সুতরাং মাতার শরীরে কোন আঘাত লাগিলেও সহসা গর্ভস্থ শিশুর কোন ক্ষতি হয় না।

পঞ্চমতঃ। নাভি নাড়ী ও জরায়ু ফুল নামে দুইটী অতি প্রয়োজনীয় যন্ত্র নির্ম্মিত হয়। মানবগণ ভূমিষ্ঠ হইলে পর আহার করিয়া শরীর পোষণ করে ও নিশ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা তাহাদিগের রক্ত পরিষ্কার হয়; কিন্তু শিশু যখন গর্ভে থাকে তখন তাহার আহার করিবার ও নিশ্বাস লইবার ক্ষমতা থাকে না, সুতরাং সে সময়ে তাহার জন্য এইরূপ স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হয়:—

ভ্রূণের নাভি হইতে দড়ার মত মোটা একগাছি নাড়ী বাহির হইয়া, জরায়ু-গাত্রে গিয়া লাগিয়া থাকে। শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে এই **নাড়ীই** ধাত্রীগণ কাটিয়া দেয় সুতরাং ইহা সকলেই দেখিয়াছেন। ইহার নাম নাভি-নাড়ী। ইহা প্রায় দেড় হাত দীর্ঘ। আবার জরায়ুর গাত্রে জরায়ু-ফুল নামে একখানি পিষ্ট-কের মত বড় পদার্থ লাগিয়া থাকে। ইহা কেবল কতকগুলি রক্ত শিরার সমষ্টি মাত্র। নাভি-নাড়ী এই জরায়ু-ফুলের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে তাহা অনেকেই সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় দেখিতে পান। কেননা প্রসবের সময় যেমন সন্তান বাহির হয় তৎপরে তাহার নাভিতে সংযুক্ত এই নাভি নাড়ীও বাহির হয় এবং কিয়ৎক্ষণ পরে ঐ নাড়ীর অপর প্রান্তে সংলগ্ন পিষ্টকবৎ জরায়ু ফুলও পড়িয়া যায়। সে যাহা হউক, যত দিন ভ্রূণ গর্ভে

থাকে তত দিন এই জরায়ুফুল দ্বারাই তাহার রক্ত পরিষ্কার হয় ও শরীর পোষণের সকল কার্য্য সম্পন্ন হয়। মাতার শরীর হইতে পরিষ্কার রক্ত আসিয়া ফুলের ভিতর জমিতে থাকে। সেই পরিষ্কার রক্ত নাভি-নাড়ীর ভিতর দিয়া সন্তানের নাভিপ্রদেশে প্রবেশ করিয়া তাহার সমস্ত শরীরে ছড়াইয়া পড়ে। তাহাতেই তাহার রক্ত পরিষ্কার হয় ও শরীর বাড়িতে থাকে। তবেই দেখা যাইতেছে যে, ভূমিষ্ঠ শিশু দুগ্ধ পান করিয়া ও তদপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠগণ পান আহার করিয়া যেমন শরীর রক্ষা করে গর্ভস্থ শিশু মাতার শরীর হইতে পুষ্টিকর সামগ্রী রক্তপথে গ্রহণ করাতে তাহার শরীরও সেইরূপ রক্ষিত ও বর্দ্ধিত হয়। আবার আমরা যেমন শ্বাস প্রশ্বাস শৌচ প্রস্রাবাদি দ্বারা শরীরের ময়লা পদার্থ বাহির করিয়া দিই, গর্ভস্থ শিশুর শরীরস্থ অপরিষ্কৃত রক্তাদি ও নাভিনাড়ীর ভিতর দিয়া প্রথমে জরায়ুফুলে ও তৎপরে মাতার শরীরে চলিয়া যায়। এই জন্যই এ অবস্থায় মানবগণের শ্বাস প্রশ্বাস ও ভোজন না করিয়াও জীবন ধারণ হয়। যখন সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া যায় তখন তাহার আর মাতৃ-শরীরের সহিত এরূপ সম্পর্ক থাকে না, তজ্জন্যই জরায়ু-ফুলেরও আর প্রয়োজন হয় না, সুতরাং এমনি সুন্দর বন্দোবস্ত যে তৎক্ষণাৎ ফুলটীও পড়িয়া যায়।

শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশের বৃদ্ধির নিয়ম।

জরায়ু মধ্যে ভ্রূণের শরীর প্রথম মাসে একটী পিপীলিকার ন্যায় হয়। মস্তক, হস্ত, পদ, চক্ষু এক একটী বিন্দুর ন্যায় দেখায়। দুই মাসে নাসিকা, ওষ্ঠ, হস্ত পদ, উদর মস্তক প্রভৃতি স্পষ্ট বুঝা যায়। তিন মাসে মস্তক অপেক্ষাকৃত বড় ও অঙ্গুলি

সকল স্পষ্ট হয়। চারি মাসে মুখ খুলিয়া যায়, হস্ত পদাদির অঙ্গুলি ও লিঙ্গ স্পষ্ট দেখা যায়। সমস্ত শরীর তিন ছটাক ভারী ও ছয় সাত বুরুল দীর্ঘ হয়। পাঁচ মাসে নখ চুল দেখা যায় শরীর এক হইতে দেড় পোয়া ভারী ও আট দশ বুরুল দীর্ঘ হয়। ছয় মাসে শরীর দশ বার বুরুল দীর্ঘ ও অর্দ্ধ সের বা তিন পোয়া ভারী হয়, তখনও চক্ষু মুদ্রিত থাকে। সাত মাসে চক্ষু খুলিয়া যায়, মস্তক ও মস্তিষ্ক বড় হয় এবং পায়ের হাড় কঠিন হইতে থাকে। আট ও নয় মাসে শরীর সর্ব্বাংশে পূর্ণ হয়। এবং আড়াই বা তিন সের ভারী হয়।

প্রসব বা ভূমিষ্ঠ হওয়া।

দুই শত আশী দিন মাতৃ-গর্ভে থাকিয়া শিশু প্রসূত হয়। জরায়ু মধ্যে শিশুর মস্তক নীচের দিকে এবং নিতম্ব উপর দিকে থাকে, হস্তপদাদি আকুঞ্চিত হইয়া বুকের উপর থাকে। প্রসবের দিন মাতার যতই বেদনা উপস্থিত হয় ততই জরায়ু আকুঞ্চিত হইতে থাকে। প্রথমাবস্থায় বেদনা অল্প, ও অল্প ক্ষণ স্থায়ী হয়; পরে যখন অধিক হইতে থাকে তখন জরায়ুর মুখ অল্প অল্প করিয়া খুলিতে থাকে। দ্বিতীয়াবস্থায় বেদনা অত্যন্ত অধিক হয়, জরায়ুর মুখ সম্পূর্ণ খুলিয়া যায় এবং জরায়ুর আকুঞ্চন বশতঃ শিশুও নামিতে থাকে। জলভাণ্ডের কিয়দংশ চাপ পাইয়া নীচের দিকে পাত্‌লা রবারের ব্যাগের মত দেখা যায় এবং অত্যন্ত চাপ পাওয়াতে উহার পাতলা চর্ম্ম ছিঁড়িয়া যায় এবং জল বাহির হইয়া পড়ে। ইহার অল্পক্ষণ পরেই শিশুর মস্তক নামিয়া পড়ে এবং প্রথমে ব্রহ্মতালু তৎপরে কপাল ও ক্রমে

চক্ষু নাসিকা মুখ ও পরিশেষে সমস্ত মুণ্ডটী বাহির হইয়া পড়ে। মস্তক বাহির হইয়া পড়িলে সমস্ত শরীরটী বাহির হইতে আর ২।১ মিনিট সময় লাগে মাত্র। সমস্ত শরীর বাহির হইয়া গেলে মিনিট কয়েক হইতে এক ঘণ্টার মধ্যে জরায়ু-ফুল পড়িয়া যায়।

নবজীবনের কার্য্যারম্ভ।

১। শ্বাস প্রশ্বাস। ভূমিষ্ঠ হইয়াই শিশু কাঁদিয়া উঠে কেন? নিশ্বাস প্রশ্বাসের প্রথম চেষ্টা বশতঃ যে কষ্ট হয় এই ক্রন্দন কেবল তাহারই ফল স্বরূপ। উৎকৃষ্ট ঘড়িটি প্রস্তত করিয়াও যদি তাহাতে দম্ দেওয়া না হয়, তাহা হইলে উহা যেমন বন্ধ হইয়া থাকে, শিশু যখন গর্ভে ছিল শ্বাস প্রশ্বাসের যন্ত্রদ্বয়ও তখন সম্পূর্ণরূপ প্রস্তুত হইয়া এবং কার্য্যের উপযুক্ত হইয়াও প্রয়োজন ছিল না বলিয়া চুপ্ করিয়াছিল। কিন্তু যেই শিশু ভূমিষ্ঠ হইল অমনি তাহাদের কার্য্যারম্ভ করিবার প্রয়োজন হইল বা দম্ দেওয়া আবশ্যক হইল। ইহা এইরূপে সাধিত হয়ঃ—নয় মাস দশ দিন কাল গর্ভের উষ্ণ বাসস্থানে থাকিয়া শিশু যখন ভূমিষ্ঠ হয় তখন সহসা এই পৃথিবীর বায়ু তাহার শরীরের উপর বিশেষতঃ মুখে লাগাতে উহা অতি শীতল বলিয়া বোধ হয়। শীতল বোধ হওয়ার সংবাদ স্নায়ু দ্বারা মস্তিষ্কে প্রেরিত হয়, মস্তিষ্ক সেই সংবাদ পাইয়া অন্য স্নায়ুপথে শ্বাস-যন্ত্রের উপর উদ্দীপক বা উত্তেজক বল প্রেরণ করে, যেন "চালাও" এই আজ্ঞা প্রদান করে। সেই উত্তেজনা বশতঃ শ্বাসযন্ত্রদ্বয় যখন বাহিরের বায়ু লইবার জন্য বিস্তৃত হয় তখন শিশুর নাসিকা

ও মুখের ভিতর দিয়া জোরে বায়ু প্রবেশ করিয়া উহাদিগকে স্ফীত করিয়া তুলে। বায়ুর এই প্রথম প্রবেশকালে শিশুর যে কষ্ট হয় সে তাহাতেই কাঁদিয়া উঠে।

২। রক্ত-সঞ্চালন। জরায়ু ফুলের ভিতর দিয়া যে রক্ত ভ্রূণের শরীরে যাতায়াত করিতেছিল, ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র তাহা বন্ধ হইয়া যায়, সুতরাং ইহার নিকটবর্ত্তী যত রক্ত শিরা আছে, তাহারাও ক্রমে শুষ্ক হইয়া যায়। তৎসঙ্গে হৃৎপিণ্ডপথে রক্ত চলাচলের যে পরিবর্ত্তন হয় তাহার বিবরণ পরে বলা যাইবে।

৩। স্তন ও স্তন্য। গর্ভ সঞ্চারের ছয় সপ্তাহ পরেই স্তন-দ্বয়ে রক্তাধিক্য ও স্তনের বৃদ্ধি আরম্ভ হয় এবং সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার ঘণ্টা কয়েক পরেই দুগ্ধ নিঃসৃত হয়। স্তনের গঠন ও কার্য্য এইরূপ ঃ—বহুসংখ্যক অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নলের এক প্রান্ত একত্রিত হইয়া গাঁইট বাঁধিয়া একটী ক্ষুদ্র গুচ্ছ হয়, এইরূপ অনেকগুলি গুচ্ছ একত্রিত হইয়া স্তনের প্রধান অংশ গঠিত হইয়াছে। এই সকল গুচ্ছের উপর নীচে ও চতুর্দ্দিকে বহুপরিমাণে পীতবর্ণের চর্বি দ্বারা আবৃত। এই চর্বি থাকাতেই স্তন কোমল হয়। চর্বির উপর যোজক তন্তু ও তদুপরি চর্ম্ম দ্বারা আবৃত। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নলগুলি যেখানে গ্রন্থি বা গুচ্ছ হইয়াছে সেইখানেই দুগ্ধ নিঃসরণ হয়। খর্জ্জুর বৃক্ষ হইতে যেরূপ রস নিঃসৃত হয়, দুগ্ধও তদ্রূপ বিন্দু বিন্দু পরিমাণে এই সকল নলের ভিতর নিঃসৃত হইয়া ইহাদের ভিতর দিয়া খোলা মুখের দিকে যাইতে থাকে। কিন্তু এই সকল নলের খোলা মুখগুলি ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে আসিয়া স্তনের সম্মুখভাগে একটী সঙ্কীর্ণ স্থানে একত্রিত হয়, সেই জন্যই স্তনের উপরিভাগ সরু ও নীচে মোটা। যেখানে

তাহারা একত্রিত হইয়াছে তাহার উপর একটী আট্‌কাইবার যন্ত্র আছে। বোতলের মুখে যেমন ছিপি থাকে, জলের কলের মুখে যেমন পিতলের যন্ত্র থাকে উহা ঘুরাইয়া দিলেই জল বাহির হয়, স্তনের উপরও তদ্রূপ একটী ছিপি আছে উহার নাম চুচুক। চুচুক এক প্রকার মাংসে নির্ম্মিত, ঐ মাংসের নাম "অনৈচ্ছিক মাংস"। রক্ত শিরা ও স্নায়ুর আধিক্য বশতঃ চুচুক অল্প উত্তেজনাতেই খাড়া হইয়া উঠে। ইহারই নিম্নে সকল নলগুলির খোলা মুখ আসিয়া জমিয়াছে, স্থতরাং যখন নলের ভিতর দুগ্ধ আসিয়া ঠেলিতে থাকে তখন ঐ দুগ্ধ বাহির হইতে না পাইয়া স্তনদ্বয়কে স্ফীত করে ও চুচুককে উত্তেজিত করে। এই সময় শিশু মুখ দিয়া চাপিলেই চুচুকের মুখে যে বিন্দু বিন্দু ছিদ্র আছে সেগুলি খুলিয়া যায় এবং বেগে দুগ্ধ নির্গত হইয়া শিশুর মুখমধ্যে পতিত হয়। চুচুকের চর্ম্মে এক প্রকার কৃষ্ণবর্ণের পদার্থ থাকাতেই উহার কাল বর্ণ হয়।

৪। শৌচাদি। গর্ভবাসকালে শিশুর উদরে এক প্রকার কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ থাকে, ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর উহাই শৌচরূপে বাহির হয়। ভূমিষ্ঠ হওয়ার অব্যবহিত পরে মাতৃস্তন্যও অল্প বিরেচক গুণবিশিষ্ট থাকে বলিয়া শীঘ্রই দাস্ত হইয়া যায়।

৫। দর্শন ও শ্রবণ। প্রথমতঃ শিশুর চক্ষে আলোক লাগিয়া বড় কষ্ট হয়, পরে উহা সহ্য হইয়া গেলে ক্রমে সকল পদার্থই আশ্চর্য্যবৎ দেখিতে থাকে, কিন্তু পদার্থের দূরত্ব এবং দৈর্ঘ্য প্রস্থাদি বুঝিতে এবং শ্রবণ সম্বন্ধে শব্দের দিক ও দূরত্ব নির্ণয় করিতে অনেক বিলম্ব হয়, তাহার কথা পরে বলা যাইবে।

তৃতীয় অধ্যায়।

বর্দ্ধন ও পোষণ।

১। বর্দ্ধন।

যে ক্রিয়া দ্বারা সমস্ত শরীর বা শরীরের এক অংশ ছোট হইতে বড় হয় তাহাকে বর্দ্ধন কহে। কেবল আহার দ্বারাই এই কার্য্য সম্পন্ন হয়। সন্তান যখন জরায়ুর ভিতর থাকে তখন মাতার রক্তে যে পুষ্টিকর সামগ্রী থাকে তাহাতেই তাহার শরীর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এবং জন্মগ্রহণের পর দুগ্ধ ও অন্যান্য খাদ্য দ্বারাই শরীর দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয় বুঝিলে শরীর বাড়িবার নিয়ম জানা যাইবে।

প্রথমতঃ। যত দিন শরীরের হাড়গুলি কোমল থাকে, তত দিন শরীর দীর্ঘ হইতে থাকে, এ কথাটী ভাল করিয়া বুঝা আবশ্যক। ছোট ছোট মাছের হাড় যেমন কোমল ও শিশুগণের শরীরের হাড়ও সেইরূপ। পাঁঠার মাংস ভক্ষণ করিবার সময়েও আমরা কখন কখন এইরূপ কচি হাড় চর্ব্বণ করিয়া থাকি। ইহাকে তীক্ষ্ণ ছুরি দিয়া কাটিয়া ফেলা যায় এবং চর্ব্বণ করিলে কচ্‌কচ্‌ শব্দ হয়। এইরূপ হাড়ের স্বতন্ত্র নাম আছে। ইহাতে অস্থি বা হাড়ের মত অনেকগুলি গুণ আছে অথচ ইহা হাড়ের মত কঠিন নহে, সেই জন্য ইহাকে উপাস্থি বলে। শিশু-শরীরে উপাস্থিগুলি যেমন দিন দিন

বাড়িতে থাকে, শিশুর শরীরও দিন দিন সেইরূপ দীর্ঘ হইতে থাকে। যেরূপ পদার্থে উপাস্থি সকল নির্ম্মিত হইয়াছে, খাদ্য-দ্রব্য হইতে সেইরূপ পদার্থ দিন দিন আসিয়া উপাস্থির উপর জমিতে থাকে; সুতরাং যে উপাস্থি ছোট ছিল তাহা বড় হইয়া উঠিতে থাকে। কিন্তু যদি উপাস্থিগুলি ক্রমাগত বড় হইত এবং কোমল থাকিয়া যাইত, তাহা হইলে দুইটী দোষ ঘটিত। প্রথমতঃ মানুষ যত দিন বাঁচিত, তত দিন ক্রমাগতই দীর্ঘ হইত। দ্বিতীয়তঃ যদি উপাস্থিগুলি চিরদিন কোমল থাকিয়া যাইত, তাহা হইলে আমরা কখনই দৌড়াদৌড়ি করিয়া কায কর্ম্ম করিতে পারিতাম না, সর্ব্বদাই হাত পা ভাঙ্গিয়া যাইবার শঙ্কা হইত। এই দুইটী অসুবিধা দূর করিবার জন্ত উপাস্থির ভিতর শুষ্ক চূণের ন্যায় এক প্রকার কঠিন পদার্থ জমিতে থাকে। হাত পা প্রভৃতি সর্ব্বশরীরের যে উপাস্থির মধ্যে যত টুকু এই পদার্থ জমিতে থাকে ততটুকুই কঠিন হাড় বা অস্থি হইয়া উঠে। হাত পা প্রভৃতি যে যে স্থানে দীর্ঘ হাড় দেখা যায়, সেখানে উপাস্থির ঠিক মধ্যস্থলে এবং দুই প্রান্তভাগে এই তিন স্থানে চূর্ণবৎ পদার্থ জমিতে থাকে। এবং মাথার খুলি প্রভৃতি যে যে স্থানে চেপ্‌টা বা চতুষ্কোণ হাড়, সেখানে উপাস্থি যতই দীর্ঘ হইতে থাকে, চূর্ণবৎ পদার্থ এই সকল স্থান হইতে তত বিস্তৃত হইয়া সমস্ত উপাস্থিতে ব্যাপ্ত হইতে থাকে। পরিশেষে উপাস্থির বৃদ্ধি অপেক্ষা চূর্ণবৎ পদার্থের বিস্তার অধিক হয়; সুতরাং কয়েক বৎসরের মধ্যে সমস্ত উপাস্থি কঠিন হাড় (বা অস্থি) হইয়া পড়ে এবং হাড়ের বৃদ্ধি থামিয়া যায়। এক্ষণে ইহার নাম আর উপাস্থি থাকে না, ইহাকে অস্থি বা হাড় বলে।

সকল উপাস্থি এক সময়ে হাড় হইয়া যায় না। শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর হইতেই এই কার্য্য আরম্ভ হয়। পাঁচ সাত বা দশ বৎসর বয়সের মধ্যে শরীরের অনেকগুলি উপাস্থি হাড় হইয়া যায়; কিন্তু তখনও অনেকগুলি কোমল অর্থাৎ উপাস্থি অবস্থায় থাকে। পরে যখন পঁচিশ বৎসর বয়স হয় তখন সকল উপাস্থিগুলিই হাড় হইয়া যায়, সুতরাং এই সময়ে শরীরের বৃদ্ধিও একবারে থামিয়া যায়।

দ্বিতীয়তঃ। মেদ দ্বারা শরীর মোটা হয়। শরীর যেরূপে দীর্ঘ হয় তাহা বলা হইল; কিন্তু মোটা হওয়ার নিয়ম অন্যরূপ। আমাদিগের চর্ম্মের নিম্নে এক প্রকার তৈলবৎ পদার্থ জমিতে থাকে; ইহাকে মেদ বা চর্ব্বি কহে। শরীরের প্রায় সর্ব্বত্রই এই পদার্থ জমিয়া থাকে; বিশেষতঃ উদরের মাংসের নীচে ইহা বিলক্ষণ পরিমাণে জমে। মেদ থাকাতে মনুষ্যের হাত পা গোল এবং শরীর মোটা দেখায়। আহার অভাবে মেদ কম পড়িলে শরীর শীর্ণ ও কুৎসিত হয়। অধিক তৈল, ঘৃত প্রভৃতি খাইলে বিশেষতঃ অলস অবস্থায় থাকিলে, অতি শীঘ্র মেদ বাড়িতে থাকে। আমাদের দেশের বড় মানুষদের মধ্যে এক এক জন যে অতি ভয়ানক মোটা হন, তাহারও কারণ এই। তাঁহারা নিষ্কর্ম্মা হইয়া অতিশয় ঘৃত দুগ্ধ পান করেন বলিয়া, শরীরের সর্ব্বত্র, বিশেষতঃ উদরের চর্ম্মের নীচে অতিশয় মেদ জন্মে এবং উদরকে স্ফীত করিয়া তুলে।

মনুষ্যের শরীরে শৈশবকালাবধি মেদ জন্মিতে থাকে; কিন্তু যৌবনকালে ইহার যেরূপ পারিপাট্য দেখা যায় সেরূপ আর কখনই হয় না। এই সময়ে সর্ব্বশরীরে মেদ জন্মিবার এমন

সুব্যবস্থা হয় যে তাহাতেই হস্তপদাদির সুগঠন ও মুখের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়। পরে যখন বার্দ্ধক্য বশতঃ মেদ কমিয়া যায় তখন সর্ব্বাঙ্গের চর্ম্মের নীচের ভাগ খালি হইয়া পড়ে, সুতরাং চর্ম্ম শিথিল বা লোল হইয়া পড়িতে থাকে। মেদ দ্বারা আমাদিগের শরীরের এই কয়টী উপকার হয় :—

১ম। ইহা দ্বারা শরীরের তাপ রক্ষিত হয়। জ্বালানি কাষ্ঠ পুড়িয়া যেমন তাপ উৎপন্ন করে, মেদও সেইরূপ আবশ্যকমত পুড়িয়া শরীর উত্তপ্ত করে। শরীর উত্তপ্ত করা কেন আবশ্যক, মেদ কিরূপে সেই কার্য্য সম্পন্ন করে, এ সকল কথা পরে বলা যাইবে; কিন্তু এটী আমরা সকলেই দেখিতে পাই যে, পীড়ার সময় বহু দিবস উপবাস করিলে শরীরের মেদ অত্যন্ত কমিয়া যায়; কারণ উহা দগ্ধ হইয়া শারীরিক তাপ রক্ষা করে অথচ অনাহার বশতঃ নূতন মেদ উৎপন্ন হয় না, সুতরাং মেদ কমিয়া যায় এবং শরীর কৃশ হয়।

২য়। চর্ম্মের নীচে যে মেদ আছে, তাহা দ্বারা তাপ সঞ্চালিত হয় না, সুতরাং শরীরের ভিতর যে তাপ উৎপন্ন হইতেছে, তাহা অধিক পরিমাণে বাহির হইতে পায় না। যদি চর্ম্মের নীচে মেদ না থাকিত, তাহা হইলে আমরা শীত গ্রীষ্ম কিছুই সহ্য করিতে পারিতাম না।

৩য়। মেদ দ্বারা শরীরের কোমল অংশ সকল আবৃত থাকে, সুতরাং ঐ সকল অঙ্গে আঘাত লাগিলেও কোমল অংশের হানি হয় না। করতল ও পদতলে বিলক্ষণ পরিমাণে মেদ না থাকিলে ঐ দুই স্থল এত কোমল ও ঘাতসহিষ্ণু হইতে পারিত না।

৪র্থ। মেদ দ্বারা শরীর মোটা ও সুদৃশ্য হয়।

৫ম। বড় বড় হাড়ের অভ্যন্তর ভাগ মেদে পরিপূর্ণ থাকাতে ঐ সকল হাড় অপেক্ষাকৃত লঘু হয়।

তৃতীয়তঃ। যখন শরীর বাড়িতে থাকে, তখন হাড় সকল বড় ও মোটা হয়। মাংস, স্নায়ু, রক্ত-শিরা এবং শরীরের যন্ত্র সকল আকারে বড় হইতে থাকে, রক্তের মাত্রা অধিক হয়, এবং শরীরের প্রত্যেক অংশ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক কর্ম্মক্ষম হয়। কিন্তু কি গূঢ় উপায়ে এই সকল কার্য্য সম্পন্ন হয়, শরীর বাড়িবার জন্য আহারের প্রয়োজন কেন হয়, তাহাতেই বা কি কার্য্য হয়, এ সকল কথা জানিতে হইলে শরীরের পোষণ কিরূপে সম্পন্ন হয়, তাহা জানা উচিত।

২। পোষণ।

যে ক্রিয়া দ্বারা শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও যন্ত্র বিধান সকল নষ্ট না হইয়া একই ভাবে থাকে ও নিজ নিজ কার্য্য করিতে সক্ষম হয়, তাহাকে পোষণ কহে। ইহা কিরূপে সম্পন্ন হয়, দেখ।

শারীর-বিধান-বিদ্যাবিৎ পণ্ডিতগণ কহেন যে, জীবন ও মরণ এই দুই শব্দের প্রায় একই অর্থ। অর্থাৎ যখন মনুষ্য জরায়ু-, আধারে জন্মগ্রহণ করে, সেই সময় হইতেই তাহার ক্ষয় হইতে থাকে। জরায়ু-অভ্যন্তরে প্রস্ফুটিত সপ্রাণ ডিম্ব পতিত হইয়া যখন তাহাতে রক্ত-শিরা ও ধমনীর সঞ্চার হইতে থাকে, এবং তদ্দ্বরা ডিম্ব সতেজ হয়, সেই সময় হইতেই তাহার পরিপোষণের নিমিত্ত মাতৃ-রক্তাধার হইতে রক্ত আনীত হইয়া তাহার শরীর পরিপুষ্ট করে। কিন্তু এক দিকে যেমন মাতৃরক্ত দ্বারা ভ্রূণ-শরীর বাড়িতে থাকে, তদ্রূপ অন্য দিকে তদীয় শরীর নিরন্তর ক্ষয়িত হইতে থাকে। যেমন কাষ্ঠ, পুড়িয়া অঙ্গার

হইয়া যায়, সেইরূপ শরীরের প্রত্যেক অংশ ক্ষয়িত হইয়া কতকগুলি অপকৃষ্ট পদার্থ হইয়া যায়, এবং সেই অপকৃষ্ট পদার্থনিচয় প্রতিনিয়ত মাতৃশরীরস্থ রক্তে চলিয়া যায়। দেখ, প্রকৃতি ভবিষ্যৎ শিশুর শরীর গড়িতে বসিয়াই ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু এক্ষণে ক্ষতি অপেক্ষা পূরণ অধিক, সুতরাং ভ্রূণ বর্দ্ধিত হইয়া ভূমিষ্ঠ হইল। জন্মগ্রহণের পর ভাঙ্গা গড়া নিরস্ত হইল না,—বাড়িল। দুগ্ধ ও অন্নে যেমন একদিকে শরীর গড়িতে লাগিল, তেমনি নড়া চড়া, দৌড়াদৌড়ি, নিশ্বাস প্রশ্বাস প্রভৃতি কার্য্যে অন্য দিকে শরীর ভাঙ্গিতে লাগিল। কিন্তু বাল্যকালের কার্য্য অপেক্ষা আহার অধিক অর্থাৎ ভাঙ্গা অপেক্ষা গড়া অধিক, সুতরাং শরীর বাড়িতে লাগিল। পরে যখন শরীর বর্দ্ধনের চরম উৎকর্ষ হইল এবং মানব, যৌবন সম্ভোগ করিতে লাগিল, তখন আর ভাঙ্গা অপেক্ষা গড়া অধিক রহিল না, তখন আর শরীর বাড়িবার প্রয়োজন রহিল না। তখন কেবল রাত্রি দিন যাহা নষ্ট হয় তাহারই পূরণ হইতে লাগিল। পণ্ডিতেরা এই ক্ষতি ও পূরণকেই পোষণ কহেন।

রাত্রি দিন যে ক্ষয় হয়, তাহার প্রমাণ কি? পঁচিশ বৎসর বয়সের যুবা পুরুষ ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে, এ কথা কে বিশ্বাস করিবে? ইহার উত্তর এই যে—

প্রথমতঃ, রোগ বা অন্যান্য সময়ে আহার না করিলে শরীর শীর্ণ হয়, ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, আমরা প্রতিদিন আহার করিয়া শরীরের ক্ষতি পূরণ করি বলিয়া ক্ষয় দেখিতে পাই না, আহার না করিলে ক্ষয়ের চাক্ষুষ প্রমাণ দেখিতে পাই।

দ্বিতীয়তঃ, যদি ক্ষয় না থাকিত এবং ক্ষতি পূরণ করা

আহারের প্রধান উদ্দেশ্য না হইত, তাহা হইলে যাহা খাইতাম, তাহাতেই শরীর একটু বাড়িত, সুতরাং বাল্যকাল হইতে বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত যত দ্রব্য ভক্ষণ করা যাইত, তাহাতে প্রত্যেক মনুষ্য এক একটী অতি প্রকাণ্ড শরীরবিশিষ্ট জীব হইত।

তৃতীয়তঃ, পণ্ডিতেরা পরীক্ষা দ্বারা নির্ণয় করিয়াছেন যে, আমরা শয়ন, উপবেশন, ধাবন প্রভৃতি যাহা কিছু নড়া চড়ার কার্য্য করি, তাহাতেই শরীর ক্ষয়িত হয়। একটু মাত্র চলিলেও একটু মাংসের ক্ষয় হয়। বহু দুর চলিলে, দৌড়াইয়া গেলে বা অতিশয় পরিশ্রম করিলে অধিক মাংসের ক্ষয় হয়, তখন ভাল যন্ত্রে ওজন হইলে দেখা যায় যে, শরীরের ভার পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ কমিয়া গিয়াছে। পণ্ডিতেরা আরও স্থির করিয়াছেন যে, আমরা যাহা কিছু চিন্তা করি তাহাতেই মস্তিষ্ক ও অন্যান্য স্নায়ুর ক্ষয় হয়। এই জন্য উৎকট চিন্তায় অতি শীঘ্র শরীর কৃশ হইয়া পড়ে, এবং বহুক্ষণ মানসিক চিন্তা করার পর যে প্রস্রাব হয় তাহার সঙ্গে মস্তিষ্কের কোন কোন পদার্থ মিশ্রিত আছে এরূপ দেখা যায়। ইহাতে এই বুঝা যাইতেছে যে, মানসিক চিন্তা, বশতঃ মস্তিষ্কের ক্ষয় হইতেছে এবং তাহার উপাদান বাহির হইয়া যাইতেছে।

কেবল তাহাই নহে। যদি কোন কার্য্যও না করা যায়, তাহাতেও ক্ষয় বারণ করা যাইবে না। চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলেও নিশ্বাস প্রশ্বাস চলিবে, বুক দুড় দুড় করিবে এবং মনে মনে একটা না একটা কথা আন্দোলন করা হইবে, এবং তাহাতে শরীরের ক্ষয় হইতে থাকিবে। বাস্তবিক ক্ষয়কে বাধা দিবার উপায় নাই। ক্ষতি ও পূরণকেই জীবন বলে।

শরীরের কতকগুলি অংশের ক্ষতি বৃদ্ধি এরূপে হয় না। বৃক্ষের পত্র যেমন কিছু দিন জীবিত থাকিয়া পড়িয়া যায় এবং তাহার পর নূতন পত্র উৎপন্ন হইয়া বৃক্ষের জীবন রক্ষা ও শোভা বৃদ্ধি করে, মনুষ্যের শরীরেও সেইরূপ নখ, চুল, দন্ত ও চর্ম্ম কিছু দিন জীবিত থাকিয়া নিজের কার্য্য করে, তাহার পর জীবন-হীন হইয়া পড়িয়া যায় ;—তখন পূর্ব্বে যেরূপ নখ, চুল, প্রভৃতি ছিল ঠিক তাহার ন্যায় নূতন নখ, চুল প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া পূর্ব্ববৎ কার্য্য করে। ইহাদের জীবন ও মৃত্যুর নিয়ম দেখ ঃ—

১ম। কেশ। মস্তক হইতে একগাছি সতেজ চুল ছিঁড়িয়া তাহার মুল পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, সেখানে কিয়ৎ পরিমাণে শস্ত বা আঠা লাগিয়া আছে। ইহাকে জীবিত কেশ বলা যায় এবং যে আঠা ইহার মূলে লাগিয়া আছে তাহা হইতেই সমস্ত কেশটীর পোষণ ও বর্দ্ধন হইয়া থাকে। আবার, যে চুল পীড়া বশতঃ বা আপনা আপনি পড়িয়া গিয়াছে, তাহার মূল দেখিলে এই আঠা শুস্কবৎ এবং সমস্ত কেশ মৃতবৎ দেখায়। এইরূপ কেশ উঠিয়া গেলে তাহার স্থানে নূতন ও সতেজ কেশ জন্মায়।

২য়। চর্ম্ম। একটু মনোযোগ করিয়া চর্ম্মের অবস্থা দেখিলেই বুঝা যায় যে, আমরা ঘসিয়া ঘসিয়া রাত্রি দিন আমাদের গায়ের চর্ম্ম স্তরে স্তরে উঠাইয়া ফেলিতেছি এবং নিম্নস্তর-সকল উঠিয়া স্থানচ্যুত চর্ম্মের স্থানাধিকার করিতেছে। সর্প প্রভৃতি কয়েক প্রকার সরীসৃপের চর্ম্ম আবার আর এক নিয়মে নষ্ট হয়। তাহাদের চর্ম্ম যখন নিজের কার্য্য করিয়া শুষ্ক ও মৃত চর্ম্ম হয়, তখন সমস্ত শরীরের চর্ম্ম একেবারে ত্যক্ত হয়। ইহা-

কেই "খোলোস ছাড়া" কহে। খোলোস ছাড়ার পর নীচে হইতে যে চর্ম্ম উঠে তাহাই ক্রমে কঠিন চর্ম্ম হয়।

৩য়। নখ। আমাদের নখের যে অংশ অঙ্গুলির বাহিরে আইসে তাহা মৃত নখ, সুতরাং ফেলিয়া দিবার উপযুক্ত। তাহার কার্য্য শেষ হইয়াছে বলিয়া তাহাকে বাহিরে ঠেলিয়া দিয়া আঙ্গুলের উপর নূতন নখ উঠে। এইরূপ গো, মহিষ ও হরিণ প্রভৃতির শৃঙ্গ কিয়দ্দিবস থাকিয়া জীবনহীন হয়, তখন আপনা আপনি নতুবা অল্প আঘাতেই পড়িয়া যায় এবং নূতন শৃঙ্গ উৎপন্ন হইয়া তাহার স্থানাধিকার করে।

৪র্থ। দন্ত। দন্ত সম্বন্ধে একটু বিশেষ নিয়ম দেখা যায়। নখ, চুল ও চর্ম্ম যত বার নষ্ট হইয়া যায়, তত বারই নূতন নূতন উৎপন্ন হয়। কিন্তু মানুষের দন্ত দুই বারের অধিক আর উঠে না কেন? ইহার উত্তর এই যে, যেমন চুল প্রভৃতির এক অংশ ত্যক্ত হইলে আবার অসংখ্য নূতন অংশ উৎপন্ন হইবার আয়োজন নীচেয় থাকে, দন্ত সম্বন্ধে সেরূপ নিয়ম নহে। মানুষের যখন দুধে দাঁত থাকে তখন ঐ দাঁতের পশ্চাদ্‌ভাগের হাড়ের ভিতর একটী ছোলার ন্যায় আর এক অংশ ঢুকিয়া থাকে, ইহাই আসল দাঁত। এই আসল দাঁত ক্রমে ক্রমে দুধে দাঁতকে ঠেলিয়া ফেলিতে থাকে, পরিশেষে দুধে দাঁতের গোড়া পচিয়া যায়, এবং ঐ দাঁত পড়িয়া যায়; তখন আসল দাঁত বাহিরে আসিয়া দাঁড়ায়। যে গর্ত্ত হইতে এই দাঁত বাহিরে আইসে, দাঁত বাহির হইলে সেই গর্ত্তটী চিরদিনের জন্য বন্ধ হইয়া যায়, তাহার ভিতর আর কোন মূল বা বীজ থাকেনা, সুতরাং এই দ্বিতীয় বা আসল দাঁত পড়িলে পুনরায় দন্ত উঠিবার আর কোন উদ্‌যোগই হয় না। এক্ষণে

বুঝা গেল যে, শরীরের সকল অংশই সর্ব্বদা ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। কিরূপে খাদ্যদ্রব্য হইতে তাহার পূরণ হয় দেখা যাউক :—

খাদ্যদ্রব্য জীর্ণ হইয়া রক্তে প্রবেশ করে এবং রক্তের স্রোতের সঙ্গে সমস্ত শরীরের সকল অংশে গমন করিতে থাকে। মাংস, স্নায়ু, হাড় প্রভৃতি যেখানেই রক্ত যায় খাদ্যের পুষ্টিকর অংশকে সেই খানেই সঙ্গে করিয়া লইয়া যায়। কিন্তু মাথা হইতে পায়ের তলা পর্য্যন্ত যেখানেই যায়, দেখে সেই খানেই অভাব; দেখে যে, সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গই নিজের কায করিতে গিয়া দুর্ব্বল ও ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে, আর যাহার যে অংশ ক্ষয় হইয়া গিয়াছে, তাহার সে অংশ পুনর্নির্ম্মাণ না করিলে আর কায চলিবে না। তখন পরিবেশন আরম্ভ হয়। রক্ত এই পরিবেশন কার্য্য করিতে থাকে, পুষ্টিকর দ্রব্য লইয়া গিয়া সকলের সম্মুখে ধরে। কিন্তু সকলে সব জিনিস লয় না;— মাংসের যাহা ক্ষয় হইয়াছে সে খাদ্য হইতে কেবল সেই টুকু গ্রহণ করে, এবং নিজের যে অংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে তাহা রক্তের স্রোতে ফেলিয়া দেয়। সেখান হইতে স্নায়ুর নিকট গেলে সেও কেবল নিজের যাহা আবশ্যক তাহাই লয়, তাহার অধিক লয় না, এবং যাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে তাহা রক্ত-স্রোতে ফেলিয়া দেয়। এইরূপে সকল অঙ্গ, সকল যন্ত্র, এমন কি শরীরের অতি ক্ষুদ্র অংশের নিকট রক্ত গমন করিয়া তাহাদের যাহার যাহা ক্ষয় হইয়াছে তাহা পূরণ করিতেছে এবং তাহাদের অপকৃষ্ট অংশ সকল বহন করিয়া পরিশেষে হৃদ্‌পিণ্ড ও ফুসফুসের ভিতর গমন করিয়া নিজে পরিষ্কৃত হইবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিতেছে। জীবিত মনুষ্যের শরীরে রাত্রিদিন এইরূপে ক্ষতি ও

পূরণের স্রোত পরস্পরকে বাধা দিবার চেষ্টা করিতেছে। পূর্ণ বৰ্দ্ধিত শরীরে ক্ষতি ও পূরণের অনুপাত বৎসর কয়েক কাল সমান থাকে; সেইজন্যই সে সময়ে শরীর আর বাড়েও না, ভাঙ্গেও না, যদিও বা পীড়া প্রভৃতি আগন্তুক কারণ বশতঃ কিয়ৎকালের নিমিত্ত দুৰ্ব্বল হইয়া পড়ে, তথাপি খাদ্যাদির দ্বারা শীঘ্রই তাহার পূরণ হইয়া যায়।

কিন্তু যতই বৃদ্ধ বয়সের দিকে অগ্রসর হওয়া যায় ততই গড়া অপেক্ষা ভাঙ্গা অধিক, পূরণ অপেক্ষা ক্ষতি অধিক হয়। বৃদ্ধ বয়সে শরীরের মাংস, স্নায়ু, হাড় প্রভৃতি যে অংশের যত ক্ষয় হয় সে অংশের তত পূরণ করিয়া লইবার ক্ষমতা হয় না, এবং আভ্যন্তরিক যন্ত্র সকল পূর্ব্ববৎ স্ব স্ব কার্য্য করিতে পারে না। এইজন্য সে সময়ে পরিপাক-কার্য্যও সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না, এবং তন্নিবন্ধন যন্ত্র বিধান সকল আরও অধিক দুৰ্ব্বল হইয়া পড়ে। মেদ শুষ্ক হইয়া যায় সুতরাং চর্ম্ম লোল হইয়া পড়ে; এবং মাংস পেশীর কৃশতা, চক্ষের ক্ষীণ দৃষ্টি, মেধা প্রভৃতি মনোবৃত্তি সকলের তেজহীনতা ও অন্যান্য নানাবিধ ধ্বংস-লক্ষণ আবির্ভূত হয়।

বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্য, জীবনের এই তিন অবস্থায় পোষণ-শক্তির কেন এরূপ বৈলক্ষণ্য হয় তাহা কেহ বলিতে পারেন না। কিন্তু ইহা স্পষ্ট জানা গিয়াছে যে, শৈশব ও বাল্যাবস্থায় শরীরের যন্ত্র বিধান সকল, রক্তে পরিণত খাদ্য পদার্থ হইতে কেবলমাত্র আপন আপন হৃত অংশ পূরণ করিয়াই ক্ষান্ত থাকে না, পরন্তু তদপেক্ষা অধিক পদার্থ গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব দেহ বৰ্দ্ধিত করে। পরাক্রান্ত বীর যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে নিজে আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াও

শক্রুকে পরাজিত করেন, ক্ষতি ও পূরণের যুদ্ধে, মরণ ও জীবনের এই মহারণে, বাল্যকালে জীবনও সেইরূপ মৃত্যুকে পরাজিত করিতে সমর্থ হয়। পূর্ণ বর্দ্ধিতাবস্থায় অধিক দ্রব্য গ্রহণের ক্ষমতা যায়। তখন যন্ত্র-বিধানগুলির যাহা নষ্ট হয় খাদ্য দ্বারা কেবল তাহাই পূরণ হয়। যেমন আয় তেমনি ব্যয় হয়; সুতরাং চব্বিশ পঁচিশ বৎসর বয়স হইতে চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত শরীর প্রায় সমভাবেই থাকে। বড় বড় সহর হইতে যেমন প্রতিঘণ্টায় সহস্র সহস্র লোক বাষ্পীয় শকটে, নৌকাযোগে, পদব্রজে বা অন্য কোন উপায়ে চলিয়া যাইতেছে তেমনি সেই সময়ের মধ্যে আবার সহস্র সহস্র লোক সেই সেই উপায়ে সহর মধ্যে প্রবেশ করিতেছে; সুতরাং যে দিনই সহরে যাই না কেন রাজপথের জনস্রোত প্রায় সমানই দেখিতে পাই। বৎসর কয়েক কাল মনুষ্য শরীরের ক্ষতিপূরণের অবস্থাও সেইরূপ হইয়া থাকে। কিন্তু বৃদ্ধাবস্থায় যাহা নষ্ট হয় তন্তুগণ তাহাও পূরণ করিতে পারে না; সুতরাং ক্রমেই মৃত্যু অনিবার্য্য হইয়া উঠে। তোমার বাটীর যে অংশ গঙ্গায় ভাঙ্গিতেছে তুমি যদি তাহা সম্পূর্ণরূপে দৃঢ় করিয়া রাখিতে পার, তাহা হইলে তাহাতে কিছুদিন বাস করিতে পারা সম্ভব; কিন্তু যদি নদী-স্রোতে প্রতি ঘণ্টায় দশখানি ইষ্টক ভাঙ্গিয়া লইয়া যায় এবং ঐ সময়ের মধ্যে তুমি পাঁচখানির অধিক সংগ্রহ করিতে না পার, তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, অচিরাৎ তোমার বাটী জলসাৎ হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়।

রক্ত।

যে লোহিতবর্ণ তরল পদার্থ মনুষ্যাদি জীবের ধমনী প্রভৃতিতে বিচরণ করিয়া দেহকে উত্তপ্ত ও পরিপুষ্ট করে তাহাকে শোণিত বা রক্ত কহে।

এই পদার্থ ঈষৎ ক্ষার আস্বাদ বিশিষ্ট ও যে জন্তুর শরীরে থাকে তাহার গাত্রের অনুরূপ গন্ধযুক্ত। ধমনী হইতে যে রক্ত নিঃসৃত হয় তাহা গাঢ় লোহিতবর্ণ, শিরা হইতে যাহা বাহির হয় তাহা কৃষ্ণবর্ণাভ। রক্তের আপেক্ষিক গুরুত্ব ১০৫৫ ও রোগী পরীক্ষা করিবার তাপমান যন্ত্রে পরীক্ষা করিলে উত্তাপ ১০০ ডিগ্রি।

রক্তের উৎপত্তি।

ভ্রূণ যখন জরায়ু মধ্যে উৎপন্ন হয় তখন হইতেই রক্ত প্রস্তুত হইতে থাকে। যে সময়ে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষ একত্রিত হইয়া একদিকে মেরুদণ্ড ও মস্তক ও অন্যদিকে বক্ষঃস্থল উদর প্রভৃতি গঠিত হয়, সেই সময়েই বক্ষঃস্থলের অভ্যন্তরে হৃদয় নামক যন্ত্র নির্ম্মিত হয়, এবং ঐ যন্ত্র নির্ম্মিত হইলে কতকগুলি অতি ক্ষুদ্র কোষ বা দানা পৃথক হইয়া রক্তকোষ বা রক্ত কণিকা হইয়া যায়।

তখন এই সকল কণিকা বর্ণহীন, গোলাকৃতি এবং অভ্যন্তরে অতি ক্ষুদ্র দানা বিশিষ্ট হয়। ক্রমে প্রত্যেক রক্তকণিকা দুই

তিন চারি বা ততোঽধিক সঙ্খ্যক কণিকায় বিভক্ত হয়। ঐ গুলি বড় হইয়া এক একটী সম্পূর্ণ কোষ বা কণিকা হয়। ভ্রূণ চারি পাঁচ মাস গর্ভবাস করার পর এই রক্তকণিকাগুলি আরও সম্পূর্ণ অবয়ব হইয়া উঠে। এই সময় হইতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় পর্য্যন্ত ইহার পোষণ মাতৃরক্ত হইতে সম্পন্ন হয়। শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর যাবজ্জীবন খাদ্য হইতে রক্ত প্রস্তুত হয়। খাদ্যদ্রব্য প্রথমে লসীকা হইয়া রক্তে প্রবেশ করে, পরে শ্বেত কণিকা ও পরিশেষে লোহিত কণিকাযুক্ত রক্তে পরিণত হয়।

মাত্রা ও উপাদান।

মনুষ্য শরীরে কত রক্ত আছে তাহা ঠিক করিয়া বলা সহজ নহে। সুস্থ অবস্থায় যত রক্ত থাকে পীড়ার সময় তাহা অপেক্ষা অনেক কম। পূর্ণ আহারের অব্যবহিত পরে শরীরে যত রক্ত হয়, দুই চারি দিন উপবাস করিলে তাহার প্রায় অর্দ্ধেক হইয়া পড়ে। তথাপি সাধারণতঃ ইহা বলা যাইতে পারে যে, যে মনুষ্য বা যে জীবের শরীরের যত ওজন তাহার শরীরস্থ রক্ত ঐ ওজনের দশ ভাগের এক ভাগ হইতে আট ভাগের এক ভাগ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। যথা, একজন সাধারণ পূর্ণবয়স্ক বাঙ্গালী পুরুষের ওজন ষাইট সের ধরিলে তাহার শরীরে ছয় সের হইতে সাড়ে সাত সের পর্য্যন্ত রক্ত আছে বলা যাইতে পারে।

অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা রক্ত পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এক প্রকার বর্ণহীন জলীয় পদার্থে বহুসংখ্যক লোহিত বর্ণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষ ভাসিতেছে,তাহাতেই এই তরল পদার্থটীকে লোহিতবর্ণাক্ত করিয়াছে। ঐ জলীয় পদার্থের নাম রক্তরস এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষগুলির নাম রক্তকণিকা। রক্তরস যদিও

জলবৎ পদার্থ বটে তথাপি ইহা দুইটী উপাদানে নির্ম্মিত। উহাদের নাম রক্তস্নেহ ও রক্তসূত্রাণু। ঘনীভূত রক্ত কিরূপে হয় তাহা দেখিলে ও বুঝিলেই ইহাদের বিভেদ হৃদয়ঙ্গম হইবে।

ঘনীভূত রক্ত।

অনেকই দেখিয়াছেন যে পাঁঠা প্রভৃতি জন্তুর মস্তকচ্ছেদন করিলে যে রক্ত বেগে বাহির হইতে থাকে উহা প্রায় জলবৎ তরল। কিন্তু ঐ রক্ত একটী পাত্রে ধরিয়া রাখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, দশ মিনিটের মধ্যে উহা জমিতে আরম্ভ করে। জমিলে উহা প্রথমে জীয়ল বৃক্ষের আঠার ন্যায় অথবা নাতি ঘন দধির ন্যায় হইয়া উঠে। অল্পক্ষণ পরেই এই ঘন পদার্থের উপর হইতে বিন্দু বিন্দু পীতবর্ণের পদার্থ নিঃসৃত হইয়া উপরে উঠিতে থাকে। উহা চতুর্দ্দিক হইতে যত উপরে উঠে ততই ক্রমে ক্রমে অধিক কঠিন ও পূর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতর আকার ধারণ করে। পরিশেষে এই উপরিস্থিত পদার্থ সম্পূর্ণরূপ জমিয়া কঠিন হইয়া যায় এবং জলের ন্যায় এক প্রকার পদার্থে ভাসিতে থাকে। ঘনীভূত রক্তে এই সকল পরিবর্ত্তন হওয়ার কারণ এই যে, রক্তরসে যে দুইটী পদার্থ আছে তন্মধ্যে রক্তসূত্রাণু নামক পদার্থের গুণ এই যে যদি কোন কারণ বশতঃ রক্ত না দৌড়াইয়া স্থির হইয়া দাঁড়ায় তাহা হইলেই রক্তসূত্রাণু অতি শীঘ্র জমাট বাঁধিয়া উঠে। জীবিত মনুষ্যের বা অন্য জীবের শরীরের রক্ত এক মুহূর্ত্তও স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে না বলিয়াই উহা জমিতে পায় না। কিন্তু রক্ত যখন শরীরের বাহিরে আসিয়া পড়ে, তখন উহা স্থির হইয়া দাঁড়ায় বলিয়াই রক্তসূত্রাণু শীঘ্র জমিয়া যায়। জমাট বাঁধিবার সময় রক্ত-কণিকাগুলিকেও নিজের সঙ্গে লইয়া কঠিন হইয়া

পড়ে, স্নুতরাং কেবল মাত্র রক্তস্নেহে এই ঘনীভূত রক্তসূত্রাণু ও তৎসঙ্গে রক্তকণিকাগুলি জমাট বাঁধিয়া ভাসিতে থাকে।

অতএব সিদ্ধান্ত এই যে রক্ত যখন জীবিত শরীরের ভিতর থাকে তখন ইহার উপাদান প্রধানতঃ দুইটী, রক্তকণিকা ও রক্তরস। শরীর হইতে বাহির হইয়া রক্ত যখন ঘন হইতে থাকে তাহার প্রথম বা দধিবৎ অবস্থায় ও ইহা অপেক্ষা অধিক বুঝা যায় না। কিন্তু দ্বিতীয় অবস্থায় যখন ঐ ঘন পদার্থ দুই ভাগে বিভক্ত হয় এবং উপরের ভাসমান অংশে দুইটী উপাদান ও নীচে জলবৎ রক্তস্নেহ দেখা যায়, তখন বুঝিতে পারা যায় যে রক্তের প্রধান উপাদান তিনটী;—১, রক্তকণিকা ২, রক্তরস—উহার দুই উপাদান (ক) রক্তসূত্রাণু, (খ) রক্তস্নেহ।

মানুষের শরীরের কোন স্থানে বেদনা, ফুলা, উত্তাপ ও লালবর্ণ হইয়া উঠিলে ঐ অবস্থাকে প্রদাহ বলে। যদি প্রদাহযুক্ত স্থানের রক্ত লইয়া কোন পাত্রে রাখা যায় তাহা হইলে দেখা যায় যে, রক্তকণিকাগুলি নীচে পড়িয়া যায়, রক্তস্নেহ জলবৎ অবস্থায় মধ্যস্থলে দাঁড়ায় এবং রক্তসূত্রাণুগুলি শ্বেতবর্ণ অবস্থায় জমাট বাঁধিয়া উপরে দাঁড়ায়। এই উপরিস্থিত পদার্থ কিয়ৎক্ষণ পরেই মধ্যস্থলে নিম্ন হইয়া গিয়া একটী ক্ষুদ্র বাটি বা পিয়ালার আকার ধারণ করে।

ঘনীভাবের ন্যূনাধিক্য। যদি নাতিউষ্ণ স্থানে রক্ত রাখা যায়, অথবা যদি নাড়া চাড়া না পাইয়া স্থিরভাবে থাকিতে পায়, কিম্বা নাড়া চাড়া পাইয়াও যদি তৃণ বা কেশগুচ্ছ বা অন্য কোন সূক্ষ্ম মুখবিশিষ্ট পদার্থ দ্বারা আন্দোলিত হয় তাহা হইলে রক্ত শীঘ্র জমিয়া যায়। বন্ধুর বা খস্‌খসে স্থানে পড়িলে, বাতাস অধিক

ভূমিকা।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে সংস্কৃত ভাষা যেমন কেবল পুরোহিত ও অধ্যাপকের আলোচ্য বলিয়া অনেকেই বিবেচনা করিতেন, দুর্ভাগ্যক্রমে শারীর-বিধান রূপ অশেষ জ্ঞান ও আনন্দপ্রদ শাস্ত্রকেও তদ্রূপ অদ্যাপি কেহ কেহ কেবল চিকিৎসা-শিক্ষার্থীর পাঠ্য বলিয়া ভাবিয়া থাকেন। যাহাতে সাধারণ বঙ্গীয় পাঠক এই শাস্ত্র পাঠের আনন্দ ও উপকার লাভ করিতে পারেন এই পুস্তকে তাহারই চেষ্টা করিয়াছি। মাদৃশ স্বল্পবুদ্ধি ব্যক্তি দ্বারা ঐ কার্য্য কতদূর সুসম্পন্ন হইয়াছে, তাহা পাঠকগণই বলিতে পারিবেন।

এই শাস্ত্র পাঠে চারিটী উপকার যথা;—

১। যেমন অপরিচিত ব্যক্তির গুপ্ত কথা শুনিতে ভাল লাগে না, কিন্তু সুপরিচিত ব্যক্তি সম্বন্ধে কথা হইলে তাহা আগ্রহের সহিত শুনিতে ইচ্ছা হয়, যেমন সংবাদপত্রে মার্কিন্ বা জাপানের সংবাদ ফেলিয়া রাখিয়া নিজ গ্রামের বিষয় কি লেখা হইয়াছে তাহা পড়িতে প্রবৃত্তি হয়, তদ্রূপ জ্যোতিষ ও ভূতত্ত্ব, ভূগোল ও উদ্ভিদ বিদ্যা, রসায়ন ও প্রাণিতত্ত্ব অপেক্ষা নিজ নিজ দেহের গঠন ও কার্য্যপ্রণালী জানিতে মনুষ্যমাত্রেরই অধিক আগ্রহ হয়। শারীর বিধান পাঠ সেই আগ্রহ বা কৌতূহল চরিতার্থ করিবার একমাত্র উপায়।

২। এই শাস্ত্রে জ্ঞান জন্মিলে স্ব স্ব দেহ রক্ষা করিতে অধিকতর সমর্থ হওয়া যায়। দুর্গ রক্ষা করিতে যে সৈনাপতিকে নিযুক্ত করা হইল তাঁহার পক্ষে ঐ দুর্গের কোথায় কোন্ কামান আছে, কোন্ সৈন্যের কিরূপ বল, কোন্ স্থান দুর্ব্বল ও ভগ্ন, কোন্ স্থান অভেদ্য, এগুলি জানা যেমন একান্ত প্রয়োজনীয়, তদ্রূপ স্বাস্থ্যরক্ষা করা যাঁহার উদ্দেশ্য, স্বীয় দেহের কার্য্যপ্রণালী

সম্যক্‌রূপ জ্ঞান লাভ করাও তাঁহার পক্ষে তদ্রূপ অত্যাবশ্যকীয়। শারীর-বিধান পাঠ করাই সেই জ্ঞান লাভের একমাত্র উপায়।

৩। বাঙ্গালা প্রদেশে তুই লক্ষ আট চল্লিশ হাজার সাত শত ছয়খানি নগর ও গ্রাম আছে। তন্মধ্যে ১৪৭টী নগর, অপর সমুদায় গুলিই গ্রাম। এই কিঞ্চিদুন আড়াই লক্ষ গ্রামে এলোপেথি হোমিওপেথি ও কবিরাজি মতের চিকিৎসক লক্ষাধিক আছেন, তাঁহাদের মধ্যে হয় ত কেহ কেহ এই শাস্ত্র ভালরূপ জানেন না। সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণের পক্ষেও চিকিৎসাকার্য্য যখন অন্ধকারে ইষ্টক খণ্ড নিক্ষেপবৎ অনিশ্চিত, তখন শারীর-বিধান না জানিয়া ঐ কার্য্য করা উচিত নহে। সুতরাং বঙ্গীয় চিকিৎসক মাত্রেরই এই শাস্ত্র পাঠে উপকার আছে।

৪। শারীর-বিধানকে অন্যতম ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করা বড়ই সুযুক্তিসঙ্গত। যাহার বরেণ্য জ্ঞান ও শক্তি উপলব্ধি করাকেই আর্য্যঋষিগণ প্রকৃত বিদ্যা বা বিজ্ঞান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই ভূমা মহান্ পুরুষ মনুষ্য-দেহরূপ ক্ষুদ্র ক্ষেত্রেই যে অসীম জ্ঞান শক্তি ও দয়ার পরিচয় দিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারিলে কি তাঁহার প্রতি প্রীতি ও ভক্তির সঞ্চার হইবে না? ভারত-মাতার সন্তানগণের অন্য যতই দোষ থাকুক, তাঁহাদের হৃদয় যে চিরদিনই ধর্ম্মপ্রবণ তাহা অন্যদেশীয়গণও স্বীকার করেন। সেই উর্ব্বরক্ষেত্রে এই শাস্ত্রের বীজ পতিত হইয়া সুবৃক্ষ উৎপন্ন করিবে ও তাহাতে সুফল ফলিবে এই আশায় এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি বঙ্গীয় পাঠকগণের হস্তে সমর্পণ করিলাম। ইতি।

শ্যামনগর, ২৪ পরগণা।
অগ্রহায়ণ, ১৩০৩ সাল।

শ্রীযদুনাথ শর্ম্মা।

লাগিলে এবং বিস্তৃত স্থানে রাখিলেও রক্ত শীঘ্র জমিয়া যায়। কিন্তু জীব-শরীরের ভিতর থাকিলে, অথবা অতিশয় শীতল স্থানে রাখিলে; শতকরা দুই তিন ভাগ ক্ষার পদার্থ মিশাইয়া দিলে; রক্তের দ্বিগুণ অপেক্ষা অধিক জল মিশাইয়া দিলে; অত্যল্প বাতাস লাগিতে দিলে অথবা রক্তের উপর তৈল ঢালিয়া দিলে আর উহা শীঘ্র জমাট বাঁধিতে পায় না।

রক্তকণিকা।

উপরে যে রক্তকণিকার কথা বলা হইয়াছে উহা এক প্রকার নহে, দুই প্রকার,—শ্বেত ও লোহিত। এই দুইয়ের বিশেষ বিবরণ এই;—১। শ্বেতকণিকা। ইহাদের সংখ্যা অনেক বটে, কিন্তু লোহিত কণিকার তুলনায় কম। সমস্ত রক্তে যত লোহিত কণিকা আছে তাহার চারি পাঁচ শত অংশের এক অংশ শ্বেত কণিকা আছে। কিন্তু পীড়ার সময় শ্বেত কণিকার এত বৃদ্ধি হয় যে, সমস্ত রক্তের প্রায় দশ ভাগের এক ভাগ ইহাতেই পরিপূর্ণ থাকে। সুস্থ শরীরে প্রতিদিন আহারের পর শ্বেত কণিকার মাত্রা বাড়িয়া উঠে। ইহারা গোলাকার, $\frac{১}{২৫০০}$ ইঞ্চ পরিমিত ব্যাস যুক্ত, এবং আকুঞ্চন ও সম্প্রসারণে পটু বলিয়া সর্ব্বদা নানা প্রকার আকার ধারণে সক্ষম। ইহাদের কখন বা মধ্যস্থল সঙ্কুচিত হইয়া যায়, কখন বা সূত্রের ন্যায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শুণ্ড বাহির হয় ও তৎক্ষণাৎ আবার ভিতরে প্রবেশ করে। ২। লোহিত কণিকা। ইহারা চেপ্টা ও চন্দ্রাকার গোল। $\frac{১}{৩৫০০}$ হইতে $\frac{১}{৪০০০}$ ইঞ্চ ব্যাস যুক্ত এবং ঈষৎ হরিদ্রাভ। প্রত্যেক লোহিত কণিকা এক প্রকার বর্ণহীন স্বচ্ছ সূত্রময় পদার্থে গঠিত এবং এক প্রকার ঘোর লোহিতবর্ণের পদার্থ দ্বারা রঞ্জিত,

ঐ পদার্থের নাম রক্তবর্ণক। লোহিত কণিকাগুলি স্থিতিস্থাপক বলিয়া রক্ত-শিরা, ধমনী প্রভৃতির ভিতর দ্রুতবেগে গমন করিতে তাহাদের কোনই কষ্ট হয় না। কারণ, যেখানে এই রক্তশিরা প্রভৃতি অতি সূক্ষ্ম সেখানে এই সকল কণিকা তাহাদের ভিতর দিয়া আকুঞ্চিত হইয়া যায়, আবার যেখানে বড় নল পায় সেখানে বিস্তৃত বা স্ফীত হইয়া দৌড়িতে থাকে। কণিকাগণ সকলেই প্রায় সমান আকৃতির হইলেও কতকগুলি অপেক্ষাকৃত বড়।

লোহিত কণিকাগণের বিশেষ ধর্ম্ম এই যে, তাহারা শরীর হইতে বাহির হইয়া পড়িলেই পরস্পরের গাত্রে লাগিয়া যায়; সমযোগাকর্ষণ নামক বল দ্বারা তাহারা পরস্পর আকৃষ্ট হইয়া একটির গাত্রে অপরটী এমনি লাগিয়া যায় যেন কতকগুলি ক্ষুদ্র দুআনি বা সিকি উপরি উপরি রাখা হইয়াছে।

রক্তবর্ণক। যে লোহিতবর্ণের পদার্থ দ্বারা রক্তকণিকাগুলি রঞ্জিত হওয়াতে তাহাদের নাম লোহিত কণিকা হইয়াছে এবং যেদ্দ্বারা সমস্ত রক্তকেই লোহিতবর্ণ বলিয়া বোধ হয় উপরে বলা হইয়াছে যে, উহাকে রক্তবর্ণক কহে। উহার দুইটী গুণ। ১ম এই যে, শরীর হইতে রক্ত বাহির হইলে কণিকাস্থিত রক্ত-বর্ণক ভাস্থর বা কোণ্‌ বিশিষ্ট দানার আকার প্রাপ্ত হয় এবং তজ্জন্যই অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা রক্ত পরীক্ষা করিলে উহার অতি মনোহর আকার দেখা যায়। ২য়, এই পদার্থ অম্লজান নামক বায়ুর সহিত অতি সহজে সম্মিলিত হয় এবং সম্মিলিত হইয়া আবার অতি সহজে অম্লজানকে তাড়াইয়া দেয়। এই গুণ বশতঃ যে মনুষ্য-দেহের কত উপকার হয় তাহা শ্বাস-প্রশ্বাসের

অধ্যায়ে দেখান যাইবে। বাস্তবিক এই বর্ণকপদার্থ থাকাতেই লোহিত কণিকাগণ জীবন-রক্ষার কার্য্যে লাগে।

রক্তরস।

উপরে বলা হইয়াছে যে, রক্তরসের উপাদান দুইটী, রক্তস্নেহ ও রক্তসূত্রাণু। রক্তস্নেহ প্রধানতঃ জলময় পদার্থ, কিন্তু ইহাতে শতকরা আট ভাগ অণ্ডলাল নামক পদার্থ আছে তাহাতেই রক্ত-রস উত্তপ্ত হইলে জমিয়া যায়। অবশিষ্ট অধিকাংশই জল। রক্ত-রসে শতকরা ৭০ হইতে ৭৯ ভাগ পর্য্যন্ত জল থাকাতেই রক্ত এত তরল। কিন্তু জীবিত মনুষ্যের শরীরে ঘণ্টায় ঘণ্টায় জলের পরি-মাণের কিয়ৎপরিমাণে হ্রাস বৃদ্ধি হয়। পরিশ্রমাদি দ্বারা যেই একটু জল কম পড়ে অমনি তৃষ্ণা হইয়া সেই অভাব পূরণ করি-বার চেষ্টা হয়। আবার যে জল পান করা হইয়াছে তাহা প্রয়ো-জন অপেক্ষা একটু মাত্রও অধিক হইলে অমনি ঘর্ম্ম প্রস্রাব প্রভৃতি দ্বারা শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়। দিবা রাত্রি এই এইরূপ চেষ্টা করিয়া প্রতিনিয়তই যাহাতে রক্তে জলের মাত্রা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে থাকে প্রকৃতি তাহার উপায় বিধান করিতেছেন। এইরূপ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে জল রাখিবার স্বাভাবিক চেষ্টা না হইলে, রক্ত কখন ঘন হইয়া যাইত এবং রক্তাধারগুলির ভিতর দিয়া এত বেগে দৌড়িতে পারিত না, শরীরের সকল যন্ত্র সমান ভাবে উহাকে পাইত না, আবার কখন বা অতি তরল হইয়া যাইত; সুতরাং অত্যধিক জল বশতঃ আমরা স্ফীত হইয়া উঠিতাম, আবার হয়ত ঘণ্টা কয়েক পরেই অত্যল্প জল বশতঃ অতি কৃশ হইয়া পড়িতাম। খাদ্যদ্রব্যাদি রক্তে শোষিত হইতে পারিত না। রক্তস্নেহ জলপ্রধান, উহা বিসূচিকা রোগে অধিক পরিমাণে

বাহির হইয়া যায় সুতরাং রক্ত ঘন হইয়া পড়ে ও শীঘ্র দৌড়িতে পারে না বলিয়াই ঐ রোগে রোগী অত শীঘ্র মারা যায়। জল ও অণ্ডলাল ব্যতীত রক্তস্নেহে কয়েক প্রকার লবণ ও চর্বি অল্প পরিমাণে পাওয়া যায়।

রক্তরসের দ্বিতীয় উপাদান রক্তসূত্রাণু। ইহার পরিমাণ অতি অল্প। শতকরা দশমিক দুই হইতে দশমিক তিন ভাগ অর্থাৎ সহস্র ভাগের মধ্যে দুই বা তিন ভাগ থাকে মাত্র। এই পদার্থ শরীর পোষণে উপকার করে। ক্ষুদ্র রক্ত-শিরা ও ধমনী কাটিয়া গেলে কিয়ৎ ক্ষণ পরে রক্ত পড়া আপনা আপনি থামিয়া যায় ইহা অনেকেই দেখিয়াছেন। উহার কারণ এই যে, কর্ত্তিত অংশে যে রক্তসূত্রাণু উপস্থিত হয় উহা জমিয়া রক্তপড়া বন্ধ করিয়া দেয়।

চর্বি রক্তমধ্যে ভ্রমণ করিয়া সমস্ত শরীরে চর্বি দান করে। লবণ পদার্থগুলি রক্তকে ক্ষার অবস্থায় রাখে এবং অণ্ডলাল প্রভৃতি গলাইয়া রক্তকে তরল অবস্থায় রাখে।

রক্তের ক্রিয়া।

রক্ত দ্বারা এইগুলি কার্য্য হয়;—(১) শরীর পোষণ; প্রত্যেক যন্ত্র বিধান রক্ত হইতে আপন আপন আবশ্যকীয় পদার্থ গ্রহণ করে তাহাতেই শরীর রক্ষা হয়। (২) উত্তাপ রক্ষা ও জীবনীশক্তি রক্ষা। ইহার বিশেষ বিবরণ পরে দেওয়া যাইবে। (৩) ইহা দ্বারা অম্লজান বায়ু শরীরের নানা স্থানে প্রেরিত হয়। এবং ঐ বায়ু দ্বারা রক্ত পরিষ্কার হয়। (৪) ইহা দ্বারা সর্ব্ব শরীর আর্দ্র থাকে।

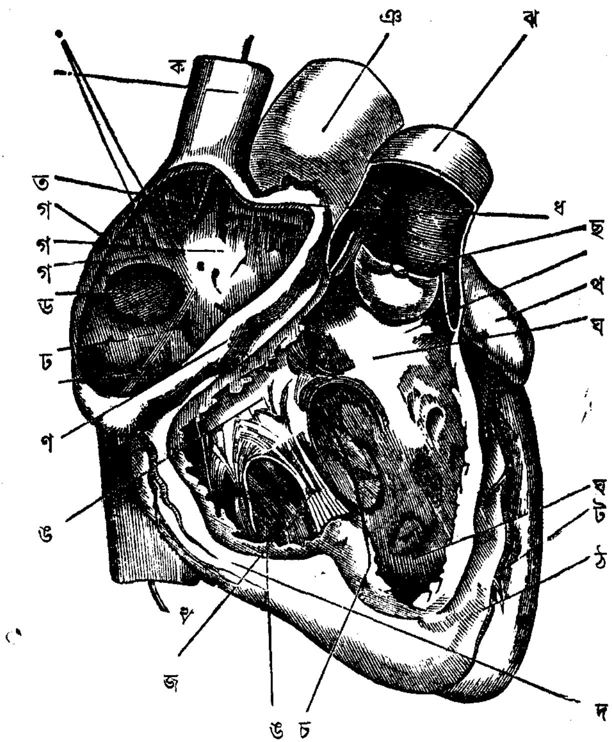
পঞ্চম অধ্যায়।

রক্ত সঞ্চালন।

জীবিত মনুষ্যের বক্ষের বাম পার্শ্বে হাত দিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, একটী যন্ত্র দিবারাত্রি বুকের ভিতর ঢুপ্ ঢুপ্ শব্দ করিতেছে। ঐ যন্ত্রটীর নাম হৃদয়। বুক চিরিয়া যদি ঐ যন্ত্রটী বাহির করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে দেখা যায় যে, উহার আকৃতি একটী সাধারণ আম্রের ন্যায়। আম্র যেমন বৃক্ষ হইতে বোঁটা দ্বারা ঝুলিতে থাকে ইহারও তেমনি উপরিভাগে নলের ন্যায় কতকগুলি রক্ত-ধমনী লাগিয়া আছে। তাহাতেই সমস্ত যন্ত্রটী ঝুলিয়া রহিয়াছে। প্রভেদ এই যে, আম্রের বোঁটা একটী মাত্র, ইহার যে সকল নল আছে তাহারা অনেকগুলি। আম্রের ন্যায় ইহারও উপরিভাগ মোটা, নিম্নভাগ সরু। ইহার বর্ণ ছাগমাংসের ন্যায়।

এই যন্ত্রের মধ্যস্থলে উপর হইতে নীচের দিকে চিরিয়া ফেলিলে দেখা যায় যে, ইহার মধ্যে চারিটী ঘর আছে। দুইটী নীচে ও দুইটী উপরে। উপরকার ঘর দুইটীর নাম "কর্ণ-গহ্বর" ও নীচের ঘর দুইটীর নাম "গর্ভ গহ্বর।" ডাইন দিকের কর্ণগহ্বরে দুইটী রক্তের নল, একটী উপরের একটী নীচের দিক হইতে লাগিয়া আছে। এই দুইটীকে হৃদয়ের উর্দ্ধ ও নিম্ন শিরা কহে। শরীরের সমস্ত দূষিত রক্ত এই দুইটী নল দিয়া মুহূর্ত্তে

দ্বিতীয় প্রতিকৃতি। হৃদয়ের ডাইন গহ্বরদ্বয়।*



* (ডাইনদিকের মাংসময় আবরণ কাটিয়া ফেলাতেই গহ্বরদ্বয় বাহির হইয়া পড়িয়াছে) ক, উর্দ্ধশিরা। খ, নিম্নশিরা। গ, ডাইন কর্ণগহ্বর। ঘ, ডাইন গর্ভগহ্বর। ঙঙঙ, ত্রিচূড় পর্দ্দা। চ, ত্রিচূড় পর্দ্দার মধ্যস্থিত ক্ষুদ্র টুকরা। ছ, অর্দ্ধচন্দ্র পর্দ্দা। জ, ত্রিচূড় পর্দ্দাসংযুক্ত মাংস টুকরা। ঝ, ফুস্ফুসীয় ধমনী। ঞ, বামদিক হইতে উত্থিত এওর্টার কিয়দংশ দেখা যাইতেছে। ট, গর্ভ-

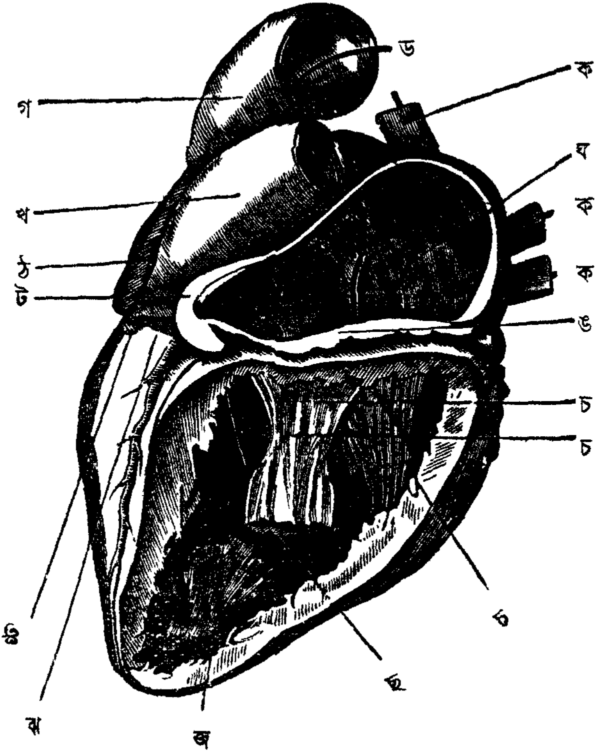
মুহূর্ত্তে ডাইন কর্ণ-গহ্বরে আসিয়া পড়িতেছে। ডাইন দিকের কর্ণ ও গর্ভ-গহ্বরের মধ্যে কেবল একখানি পর্দ্দা ব্যবধান আছে। এই পর্দ্দাখানি তিন ভাগে চেরা, এবং এই চেরা তিন ভাগের প্রত্যেক টুকরার এক একটী চূড়া আছে বলিয়া সমস্ত পর্দ্দা-খানিকে "ত্রিচূড়" পর্দ্দা কহে। বাম দিকের কর্ণ ও গর্ভ-গহ্বরের মধ্যেও এইরূপ একখানি পর্দ্দা আছে, কিন্তু তাহা দুই খণ্ডবিশিষ্ট বলিয়া তাহাকে "দ্বিচূড়" পর্দ্দা কহে। প্রত্যেক পর্দ্দার ভিতর বড় দুই দুই টুকরার মধ্যস্থলে এক একটী ক্ষুদ্র টুকরা আছে। সুতরাং হিসাবমত ধরিতে গেলে ত্রিচূড় পর্দ্দার ছয়টী টুকরা ও দ্বিচূড় পর্দ্দার চারিটী টুকরা আছে বলিতে হইবে। পর্দ্দাগুলির প্রত্যেক টুকরা জ্যামিতির ত্রিভুজের ন্যায় আকৃতি-বিশিষ্ট। ঐ ত্রিভুজ কর্ণ ও গর্ভ-গহ্বরের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হওয়াতে উহার বিস্তৃত অংশ হৃৎপিণ্ডের গাত্রে সংলগ্ন থাকে। সরু দিকটী গর্ভ-গহ্বরের ভিতর ঝুলিতে থাকে। ঝুলিবার কারণ এই যে, এই সমস্ত ত্রিভুজাকৃতি পর্দ্দার যে দিকটী গর্ভ-গহ্বরের দিকে রহিয়াছে সেই দিকটীতে কতকগুলি সরু সরু মাংসের টুকরা গর্ভ-গহ্বরের গাত্র হইতে উঠিয়া পর্দ্দার নিম্ন অংশে গিয়া লাগিয়া আছে। সমস্ত পর্দ্দাখানি খালি যেন দড়ি দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া ঝুলিতে থাকে। এই সকল দড়ির ন্যায়

গহ্বরদ্বয়ের ব্যবধান প্রাচীর। ঠ, হৃৎপিণ্ডের অগ্রভাগ। ড, ডিম্বাকার গর্ত্ত। ঢ, করোণারি শিরার মুখ। ণ, কর্ণ ও গর্ভগহ্বরের মধ্যস্থিত নিম্নাংশ। ত, ঊর্দ্ধশিরা পথে রক্তের গতি। থ, বাম কর্ণ গহ্বরের পরিশিষ্টাংশ। দ, গর্ভ গহ্বরের কর্ত্তিত প্রাচীর। ধ, ডাইন কর্ণ গহ্বরের পরিশিষ্টাংশ।

মাংস টুকরা নানাপ্রকার উপায়ে পর্দ্দাগুলির সহিত সংযুক্ত থাকে। কোনটীর এক প্রান্ত গর্ভ-গহ্বরের গাত্রে ও অপর প্রান্ত পর্দ্দার চূড়ায় সংলগ্ন আছে এবং অবশিষ্ট অংশ শূন্যে আছে; কোনটী বা সর্ব্বাংশে গর্ভ-গহ্বর ও পর্দ্দার নিম্ন অংশে লাগিয়া আছে। আবার পর্দ্দার বড় টুকরার মধ্যে যে ছোট ছোট টুকরার কথা বলা হইল তাহাতেও এইরূপ দড়ির ন্যায় মাংস টুকরা লাগিয়া আছে এবং গর্ভগহ্বরের সহিত সংযুক্ত করিতেছে।

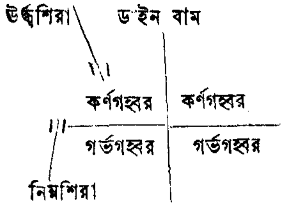
গর্ভ-গহ্বরদ্বয়ের এক প্রান্ত যেমন কর্ণগহ্বরের সহিত সংযুক্ত তাহা দেখা গেল; উহাদের নিম্ন বা পার্শ্বস্থ অংশ বড় বড় ধমনীর সহিত সংযুক্ত। ডাইন গর্ভগহ্বর যে ধমনীর সহিত সংযুক্ত উহার নাম ফুস্‌ফুসীয় ধমনী, এবং বাম গর্ভগহ্বর যে ধমনীর সহিত সংযুক্ত উহার নাম এওর্টা বা বৃহৎ ধমনী। ধমনী ও গর্ভগহ্বরের সংযোগস্থলে উভয় দিকেই তিন তিন খানি পর্দ্দা আছে। উহাদের আকার অর্দ্ধচন্দ্রের ন্যায় বলিয়া উহাদিগকে অর্দ্ধচন্দ্র পর্দ্দা কহা যায়। এই পর্দ্দাগুলি কুব্জভাবে অবস্থিত এবং এমন উপায়-বিশিষ্ট যে গর্ভগহ্বর হইতে রক্ত বাহির হইবার সময় ইহাদিগকে ঠেলিয়া বাহির হইয়া যায়, কিন্তু ধমনী হইতে যদি রক্ত গর্ভ-গহ্বরে ফিরিয়া আসিবার চেষ্টা করে তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ বন্ধ হইয়া যায়। পার্শ্বস্থ প্রতিকৃতি দেখিলে এই সকল বিষয় ভালরূপ বুঝা যাইবে। পাঠকগণ হৃদয়ের এই চারিটী ঘর ও তৎসংযুক্ত শিরা ধমনী ও পর্দ্দাগুলির পরস্পরের সম্পর্ক উত্তমরূপ হৃদয়ঙ্গম করিলেই রক্তসঞ্চালনের ব্যাপার অতি সহজেই বুঝিতে পারিবেন।

তৃতীয় প্রতিকৃতি। হৃদয়ের বাম-গহ্বরদ্বয়।*



* (বামদিকের মাংসময় আবরণ কাটিয়া ফেলাতেই গহ্বরদ্বয় বাহির হইয়া পড়িয়াছে) ক, ফুস্ফুসীয় শিরা। খ, ফুস্ফুসীয় ধমনী। গ, এওর্টা বা বৃহদ্ধমনীর কর্ত্তিত অবশিষ্টাংশ। ঘ, বাম কর্ণ-গহ্বর। ঙ, কর্ণ ও গর্ভ গহ্বরের মধ্যস্থ প্রাচীর কিয়দংশ রক্ষিত হইয়াছে। চচচ, ঘিচুড় পর্দ্দা। ছ, এওর্টা মুখে অর্দ্ধচন্দ্র পর্দ্দা। জ, ঘিচুড় পর্দ্দাসংযুক্ত মাংস টুকরা। ঝ, করোণারি নামক ধমনী। ঞ, গর্ভ-গহ্বরের কর্ত্তিত প্রাচীর। ট, কর্ণ-গহ্বরের প্রান্তভাগ। ঠ, ফুস্ফুসীয় ধমনী আরম্ভ। ড, এওর্টা মুখে রক্ত বাহির হইয়া যাইবার পথ।

হৃদয়ের কার্য্য



সমস্ত শরীর হইতে যে দুষিত রক্ত আসিয়া ডাইন দিকের কর্ণ-গহ্বরে জমে, সেই রক্ত ত্রিচূড় পর্দ্দা ঠেলিয়া ডাইন দিকের গর্ভ-গহ্বরে নামিয়া পড়ে। ডাইন গর্ভ-গহ্বরের পার্শ্ব দিয়া উপর দিকে ফুস্‌ফুসীয় ধমনী উঠিয়া গিয়াছে। যত রক্ত এই গহ্বরের ভিতর আসিয়া পড়ে, তৎসমুদায় এই ধমনীর ভিতর দিয়া ফুস্‌ফুস্‌ নামক যন্ত্রে গমন করে। সেখানে দুষিত রক্তকে পরিষ্কার করিবার অতি সুন্দর উপায় আছে, তাহা পরে বর্ণিত হইবে। যাহা হউক, এক্ষণে এই বুঝা যাইতেছে যে, ডাইন দিকের কর্ণ ও গর্ভ-গহ্বর শরীরের সমস্ত মন্দ রক্ত সংগ্রহ করিয়া, একটী বড় ধমনীর ভিতর দিয়া ফুস্‌ফুস্‌ যন্ত্রে পাঠাইয়া দেয়। ফুস্‌ফুস্‌ সেই মন্দ রক্তকে পরিষ্কার করিবার জন্য রাত্রি দিন কল চালাইতেছে।

ফুস্‌ফুস্‌ যন্ত্রে দুষিত রক্ত পরিষ্কার হয় বটে, কিন্তু সেই পরিষ্কার রক্ত শরীরের মঙ্গল সাধন করে কিরূপে? ফুস্‌ফুস্‌ হইতে শিরার ভিতর দিয়া পরিষ্কার রক্ত বাম কর্ণ-গহ্বরে আসিয়া পড়ে, সেখান হইতে দ্বিচূড় পর্দ্দা ঠেলিয়া বাম গর্ভ-গহ্বরে পড়ে, এবং এই গহ্বর হইতে এওর্টা অর্থাৎ বৃহৎ ধমনী দ্বারা সমস্ত শরীরে প্রেরিত হয়।

সুতরাং যাহা বলা হইল, তাহার স্থূল মর্ম্ম এই যে, প্রথমতঃ সমুদায় মন্দ রক্ত আসিয়া হৃদয়ের ডাইন দিকে জমিতেছে; দ্বিতীয়তঃ এই রক্তকে পরিষ্কার করিবার জন্য ডাইন্‌ গর্ভ-গহ্বর

ইহাকে ঠেলিয়া ধমনীর ভিতর দিয়া ফুস্‌ফুসে লইয়া যাইতেছে; তৃতীয়তঃ ফুস্‌ফুস্‌ তাহাকে পরিষ্কার করিয়া বাম কর্ণ-গহ্বরে পাঠাইতেছে; চতুর্থতঃ বাম গর্ভ-গহ্বর সেই পরিষ্কার রক্তকে বড় বড় নলের ভিতর দিয়া সমস্ত শরীরে ছড়াইয়া দিতেছে।

এখন ইহার বিশেষ বিবরণ শুন। এই আশ্চর্য্য কল চলিবার গূঢ় উপায় ও প্রক্রিয়া দেখ :—

হৃদয়ের চারিটী ঘরই রাত্রি দিন আপনা আপনি খুলিয়া যাইতেছে ও বন্ধ হইতেছে। কিন্তু কি উপায়ে এরূপ হয়, তাহা এখনও স্থির হয় নাই। এই খুলিয়া যাওয়া ও বন্ধ হওয়া যদৃচ্ছাক্রমে বা অনিয়মিতরূপে হয় না। ইহার নিয়ম এই :—

প্রথমেই দুই দিকের কর্ণ-গহ্বর খুলিয়া যায়। যেই খুলিবার উপক্রম হয়, অমনি ইহাদের ভিতর, উপর দিক হইতে রক্ত আসিয়া পড়িতে থাকে। স্মরণ থাকে যেন যে, দুই দিকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের রক্ত ঢুকিতেছে, ডাইন দিকে দূষিত রক্ত ও বাম দিকে পরিষ্কার রক্ত। সে যাহা হউক, ঘর দুইটী আপনা আপনিই খুলিয়া যাইতেছিল, কিন্তু তাহাদের সম্পূর্ণ রূপ খুলিয়া যাওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া, যেই ঘর দুইটী একটু মাত্র খুলিয়াছে, অমনি সেই অল্প খোলা মুখের ভিতর দিয়া তীব্র বেগে ও মোটা ধারে রক্ত প্রবেশ করাতে ঘর দুইটী অতি শীঘ্র স্ফীত হইয়া উঠে। যেই স্ফীত হওয়া শেষ হয়, অমনি তিলার্দ্ধ কাল বিলম্ব না করিয়া বন্ধ বা আকুঞ্চিত হইতে থাকে। কিন্তু এখন তো ঘর দুইটী রক্তে পূরিয়া গিয়াছে, সুতরাং আকুঞ্চিত হইলে ভিতরে যে রক্ত রহিয়াছে, তাহারই উপর চাপ পড়ে। তখন চাপ পাইয়া, রক্ত যে পথে আসিয়াছিল, সেখান দিয়া পলাইবার চেষ্টা করে, কিন্তু

দেখে যে, সে পথ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। হৃদয়ের ঊর্দ্ধ ও নিম্ন শিরার মুখেও পর্দ্দা আছে; তাহা ঠেলিয়া কদাচিৎ একটু রক্ত পিছে হটিয়া যাইতে পারে কিন্তু অধিকাংশ পারে না। সুতরাং কর্ণ-গহ্বরের নিম্নভাগে যে পর্দ্দা আছে (ডাইন দিকে ত্রিচূড় ও বাম দিকে দ্বিচূড় পর্দ্দা) তাহাদিগকে ঠেলিয়া নীচের ঘরে অর্থাৎ গর্ভ-গহ্বরে নামিতে থাকে। কর্ণ-গহ্বর হইতে রক্ত নামিয়া পড়িলেও অত্যল্প পরিমাণে থাকিয়া যায়।

এদিকে গর্ভ-গহ্বর দুইটীর ভিতর যেই এক বিন্দু রক্ত ঢুকিল, সেই সময় যেন তাহারা বুঝিল যে "উপরকার ঘর দুইটী বন্ধ হইতেছে, এখন আমাদের খুলিবার সময়,"—অমনি তাহারা স্ফীত হইতে আরম্ভ করে। মুহূর্ত্ত মধ্যে উপর ঘরের সমস্ত রক্ত আসিয়া ইহাদের মধ্যে পড়ে, উপরকার ঘর দুইটী সম্পূর্ণরূপ বন্ধ হইয়া যায়, এবং গর্ভ-গহ্বর দুইটীর স্ফীত হইয়া উঠিবার চরম সীমা উপস্থিত হয়। তখন ইহারাও বন্ধ হইতে থাকে। ইহাদের ভিতরের রক্ত চাপ পাইয়া কর্ণ-গহ্বরের ভিতর প্রবেশ করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু দেখে যে, সে পথ বন্ধ হইয়া গিয়াছে, সুতরাং ফুস্‌ফুসীয় ধমনীর ভিতর দিয়া ডাইন গর্ভ-গহ্বরের রক্ত ফুস্‌ফুসে যায় ও বাম গর্ভ-গহ্বরের রক্ত এওর্টা নামক ধমনীর ভিতর দিয়া সমস্ত শরীরে যায়। তাহার পর অতি অল্পক্ষণ বিশ্রাম লইয়া সমস্ত যন্ত্রটী পুনরায় কার্য্য আরম্ভ করে। বাম গর্ভ-গহ্বর আকুঞ্চিত হইলে উহা হইতে সমস্ত রক্তই বাহির হইয়া যায়, এক বিন্দুও আর থাকে না।

যতগুলি কথা উপরে বলিলাম, তাহার সমস্ত কার্য্যগুলি শেষ হইতে এত অল্প সময় লাগে যে, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে

হয়। একবার তাড়াতাড়ি "দুপ্ দুপ্" শব্দ উচ্চারণ করিতে যে সময় লাগে, বুকে হাত দিয়া দেখ, হৃদয়ও ততক্ষণে একবার দুপ্ দুপ্ করিতেছে। এই অর্দ্ধ সেকেণ্ড সময়ের মধ্যে কর্ণ-গহ্বরদ্বয় স্ফীত হইতেছে, তাহাদের মধ্যে রক্ত ঢুকিতেছে, তাহারা আকুঞ্চিত হইয়া সেই রক্তকে নামাইয়া দিতেছে, তখন গর্ভ-গহ্বরদ্বয় স্ফীত হইয়া সেই রক্ত গ্রহণ করিতেছে এবং আকুঞ্চিত হইয়া অন্য পথে বাহির করিয়া দিতেছে। অর্দ্ধ সেকেণ্ডের মধ্যে এতগুলি কার্য্য করিয়া আর অর্দ্ধ সেকেণ্ড কালের কিয়ংক্ষণ অধিক সময় সমস্ত যন্ত্রটী বিশ্রাম করিয়া লইতেছে। সেই জন্য বুকে হাত দিলে দেখা যায় যে, একবার দুপ্ দুপ্ করিয়া সমস্ত যন্ত্রটী প্রায় অর্দ্ধ সেকেণ্ড চুপ করিয়া থাকিতেছে। সমস্ত কার্য্য শেষ হইতে নিম্নলিখিত পরিমাণ সময় লাগে :—

কর্ণ-গহ্বর বন্ধ হইতে ১/১০ সেকেণ্ড,
গর্ভ-গহ্বর বন্ধ হইতে ৪/১০ সেকেণ্ড,
বিশ্রাম ৬/১০ সেকেণ্ড,

সুতরাং সমস্ত কার্য্য হইতে ১১/১০ বা ১ ১/১০ সেকেণ্ড সময় লাগে।

পর্দ্দাগুলির কার্য্য।

পর্দ্দাগুলি এমনি ভাবে গড়া যে, যখন কর্ণগহ্বরের ভিতর রক্ত প্রবেশ করিতেছে ও ঐ গহ্বর ফুলিয়া উঠিতেছে, তখন ত্রিচূড় পর্দ্দার অংশগুলি মুখামুখি লাগিয়া রহিতেছে, আবার যখন ঐ গহ্বর বন্ধ হইতেছে ও রক্তকে ঠেলিয়া নীচের দিকে নামাইয়া দিতেছে, তখন যেমন বর্ষাকালে গঙ্গার স্রোতে বালির বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়, সেইরূপ রক্তের চাপে ত্রিচূড় পর্দ্দার সকল অংশ খুলিয়া যাইতেছে ও রক্ত নীচে নামিয়া পড়িতেছে। কিন্তু গর্ভ-

গহ্বর বন্ধ হইবার সময় ত্রিচূড় পর্দ্দার মুখগুলি পরস্পর লাগিয়া যায়, নহিলে রক্ত পিছে হটিয়া পুনরায় কর্ণ-গহ্বরে ঢুকিয়া পড়িত।

বাম দিকের দ্বিচূড় পর্দ্দাও ঠিক এইরূপ কার্য্য করে, সুতরাং তাহার নূতন বর্ণনা অনাবশ্যক।

তবেই দেখ, কর্ণগহ্বর ও গর্ভগহ্বরের মধ্যের পর্দ্দা কত হিসাব করিয়া, কত বুদ্ধিমানের মত কার্য্য করিতেছে। উপর হইতে রক্ত নীচের দিকে না নামিলে কার্য্য হইবে না, সেই জন্য নামিতে দিতেছে, কিন্তু যদি নীচে হইতে উপরে রক্ত উঠিয়া যায়, তাহা হইলে উদ্দেশ্য বিফল হইবে সেই জন্য যখন গর্ভ-গহ্বর আকুঞ্চিত হইতেছে, তখন পর্দ্দা বন্ধ হইয়া যাইতেছে।

যে সকল ধমনী ও রক্তশিরার ভিতর দিয়া রক্ত হৃদয় হইতে বাহির হইয়া যায়, উপরে বলা হইয়াছে যে, তাহাদের মুখেও পর্দা আছে; তাহারাও কেবল রক্ত যে দিকে চলিতেছে, সেই দিকে যাইতে দেয়, যদি চাপ পাইয়া উল্টা দিকে রক্ত যাইতে চেষ্টা করে, অমনি পর্দা বন্ধ হইয়া তাহাতে বাধা দেয়।

ছড়াইয়া দিবার নিয়ম।

হৃদয়ের বাম দিক হইতে রক্ত বাহির হইয়া সমস্ত শরীরে যায়, ইহা তো জানা গেল, কিন্তু কোন্ পথে যায়, কেমন করিয়া চলে দেখা যাউক। হৃদয়ের বাম পার্শ্ব হইতে মোটা নল দিয়া পরিষ্কার রক্ত বাহির হয়। কিছু দুর গিয়া দেখে যে, সেই নল ছোট ছোট শাখায় বিভক্ত হইয়া শরীরের চারিদিকে গিয়াছে, তখন রক্তও সেই সকল নলের ভিতর দিয়া দৌড়িতে থাকে। কলিকাতা নগরীতে যেমন কলের জল, সকল স্থানে দিবার জন্য এক স্থানে কল বা কারখানা আছে, সেই কারখানা হইতে জল

ঠেলিয়া বড় বড় চোঙ্গের ভিতর পূরিয়া দেয়, সেই সকল চোঙ্গের ভিতর দিয়া বড় রাস্তায় জল দেওয়া হয়; আবার সেই বড় রাস্তা দিয়া যে চোঙ্গ গিয়াছে, তাহার গায়ে সরু সরু নল বসাইয়া সেই সকল নলের ভিতর দিয়া গৃহস্থ-বাটীতে জল লইয়া যাওয়া হয়, মানুষের শরীরেও ঠিক সেইরূপে রক্ত বিতরণ হয়।

ধমনী।

আমাদিগের হৃদয় যেন একটী প্রকাণ্ড কল। জলের কলে যেমন অপরিষ্কার জলকে পরিষ্কার করিয়া লওয়া হয়, এখানেও রক্তকে, সেইরূপ ফুস্‌ফুস্‌ যন্ত্রে পরিষ্কার করা হয়। জলের কলে যেমন সেই পরিষ্কার জলকে বড় বড় নলের ভিতর দিয়া বড় রাস্তায় পাঠান হয়, এখানেও রক্তকে সেইরূপ বড় বড় ধমনীর ভিতর দিয়া শরীরের বৃহৎ বৃহৎ স্থানে পাঠান হয়। বৈদ্যগণ যে নাড়ী টিপিয়া দেখেন ও গলায় যে রক্তের নল দপ্‌ দপ্‌ করিতেছে ও অন্যান্য স্থলে যে বড় বড় নাড়ী রহিয়াছে, তাহারাই শরীরের বড় রাস্তার নল। শরীরের এই সকল বড় নলের নাম ধমনী। ধমনী নামক নলগুলির প্রত্যেকের তিন তিনটী স্তর বা আবরণ আছে। বাহিরের আবরণ শ্বেত যোজক তন্তু দ্বারা নির্ম্মিত সেই জন্যই ধমনীগুলির ঐ প্রকার বর্ণ। মধ্য স্তর মাংস ও স্থিতিস্থাপক তন্তু দ্বারা নির্ম্মিত; সর্ব্ব অভ্যন্তর স্তর অর্থাৎ যাহার উপর দিয়া রক্ত চলিতেছে উহা কেবল স্থিতিস্থাপক তন্তু দ্বারা নির্ম্মিত। বাহিরের স্তর ঘাতসহিষ্ণু ও কঠিন যোজকতন্তু দ্বারা নির্ম্মিত বলিয়া উহাতে এই উপকার হয় যে, ধমনী মধ্যে রক্ত অধিক প্রবেশ করিলে উহাকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে পারে না। মধ্য স্তরে মাংস ও স্থিতিস্থাপক তন্তু থাকাতে ধমনীগুলি সহজেই

বিস্তৃত ও আকুঞ্চিত হইতে পারে; তাহাতে উহাদের অভ্যন্তরস্থ রক্তের উপর সমভাবে চাপ পড়ে। সর্ব্ব অভ্যন্তর স্তরে যে স্থিতিস্থাপক তন্তু আছে তদ্দ্বারা দুইটী কার্য্য হয়—(১) ধমনী মধ্যে সহসা অধিক রক্ত প্রবেশ করিলে ধমনী বিস্তৃত হইয়া উহাকে গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়; (২) এই স্থিতিস্থাপক তন্তু বশতঃ ধমনীর অভ্যন্তরস্থ রক্তের উপর এরূপ চাপ পড়ে যে রক্ত কোথাও অল্প কোথাও অধিক না হইয়া সমভাবে, সর্ব্বদা দৌড়িতে সমর্থ হয়। কলিকাতার বড় রাস্তার চোঙ্গ হইতে সরু সরু নল যেমন লোকের বাড়ীতে জল লইয়া যাইতেছে, এখানেও তেমনি কৈশিকা নাড়ী নামে অতি সরু সরু নল ধমনীর গাত্র হইতে বাহির হইয়া হাড় মাংস স্নায়ু প্রভৃতি সকলের কাছেই রক্ত লইয়া যাইতেছে।

কৈশিকা নাড়ী।

শরীরের বৃহৎ ও ক্ষুদ্র ধমনীগুলি অসংখ্য শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া সর্ব্বত্র গমন করিয়াছে। ক্ষুদ্রতম ধমনী সকল পরস্পর মিলিত হইয়া ধীবরের জালের ন্যায় বিস্তৃত হইয়া যেখানে শেষ হইতেছে, সেই স্থান তদপেক্ষা ক্ষুদ্র, আর এক শ্রেণীর যন্ত্র নল উৎপন্ন হইয়া এবং জালবৎ আকার ধারন করিয়া শরীরের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রস্থলে রক্ত লইয়া যাইতেছে ইহাদিগকে কৈশিকা নাড়ী কহে। ইহাদের নল এত সূক্ষ্ম যে $\frac{১}{৩০০০}$ ইঞ্চ পরিমিত ব্যাসযুক্ত। যকৃত, ফুসফুস মস্তিষ্ক ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে ইহাদের সংখ্যা অধিক। যে যন্ত্র যত অধিক কার্য্য করে তাহাতেই কৈশিকা নাড়ীর জাল তত অধিক। এই সকল নাড়ীর ভিতর দিয়া রক্ত অতি ধীরে চলে, প্রতিমিনিটে ৪ বা ৫ ইঞ্চের অধিক বেগে যায় না। কিন্তু শরীরের কোন স্থানেই বিস্তৃত কৈশিকা

নাড়ী নাই। একদিকে যেমন ধমনী আছে তেমনি অপরদিকে শিরা থাকাতে মধ্যস্থিত কৈশিকা নাড়ীগণ কোথাও ½ ইঞ্চের অধিক দীর্ঘ নহে। সুতরাং ইহার ভিতর রক্ত সঞ্চালন ধীরে হইলেও সমস্ত শরীরের রক্ত সঞ্চালনে এক মিনিটের অধিক সময় লাগে না। কৈশিকা নাড়ী মধ্যে গমন কালে রক্ত হইতে বহু সংখ্যক শ্বেত কণিকা ঐ নাড়ীর প্রাচীর ভেদ করিয়া নিকটস্থ যন্ত্র বিধানের ভিতর পতিত হয়।

শিরা।

যেখানে কৈশিকা নাড়ী শেষ হইতেছে সেই স্থান হইতেই শিরা সকল উৎপন্ন হইয়া মন্দ রক্ত বহন করিয়া বড় বড় শিরা ও তৎপরে বৃহত্তম শিরা দ্বারা হৃদয়ের ডাইনদিকে লইয়া যাইতেছে। সরু নলে তোমার বাড়ীতে যে জল পড়িতেছে, সেই জল লইয়া স্নান করিয়া বা বাসন মাজিয়া যতটুকু জল ময়লা করিলে, তাহা নর্দ্দমায় ফেলিয়া দিলে ময়লা জলের নল দিয়া বাহির হইয়া যায়। এখানেও ঠিক সেইরূপ। সরু সরু কৈশিকা নাড়ীর ভিতর দিয়া পরিষ্কার রক্ত সর্ব্বত্রই যাইতেছে; যেখানে যাইতেছে সেই থানেই নিজের পুষ্টিকর অংশ বিতরণ করিয়া তথাকার ময়লা গ্রহণ করিতেছে, সুতরাং কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে যাহা ভাল রক্ত ছিল এখন তাহা মন্দ রক্ত হইতেছে এবং পরিশেষে এই সকল শিরা নামক নলের ভিতর দিয়া ঐ মন্দ রক্ত হৃদয়ের ডাইন দিকে পুনরায় পরিষ্কার হইবার জন্য উপস্থিত হইতেছে। শিরাগুলি যেন মনুষ্য-দেহের ময়লা জলের নল, তাহারা ময়লা-রক্ত বহন করে। বহুসংখ্যক ছোট ছোট শিরার প্রান্তভাগ একত্রিত হইয়া এক একটী বড় শিরা হইয়া শেষ হইয়াছে এবং বহুসংখ্যক বৃহৎ

শিরার এক প্রান্তভাগ মিলিত হইয়া ঊর্দ্ধ ও নিম্ন শিরা নামক দুই বৃহত্তম শিরা হইয়া হৃদয়ে প্রবেশ করিতেছে। ইহাদের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। যাঁহারা ভূগোল পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, মেগেলন্, কুক্ প্রভৃতি নাবিকগণ জল-যাত্রা করিয়া সোজা যাইতে যাইতে ক্রমে আবার নিজের দেশে আসিয়াছিলেন। পৃথিবী গোল বলিয়া যেমন তাঁহারা আসিতে পারিয়াছিলেন এখানেও হৃদয়ের বামদিক হইতে ধমনী আরম্ভ হইয়া সমস্ত শরীরে বিস্তৃত কৈশিকা নলে ভ্রমণ করিয়া আবার শিরা-পথে হৃদয়ের ডাইন দিকে প্রবেশ করে বলিয়া রক্তের ভ্রমণও ঠিক সেইরূপ। দিবারাত্রি এইরূপ বামদিক হইতে বিশুদ্ধ রক্ত বাহির হইয়া যাইতেছে ও ডাইনদিকে আসিয়া মন্দ রক্ত প্রবেশ করিতেছে।

রক্তসঞ্চালন দ্বারা শরীরের নিম্নলিখিত উপকার হয়:—

১ম। পরিষ্কার রক্ত সমস্ত শরীরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সকল স্থানের পোষণ কার্য্য সম্পাদন করে।

২য়। রক্ত ঘুরিয়া বেড়ানতে শরীর উত্তপ্ত থাকে।

৩য়। পরিষ্কার রক্তের ভিতর দিয়া অম্লজান গমন করিয়া তাপ উৎপন্ন করে।

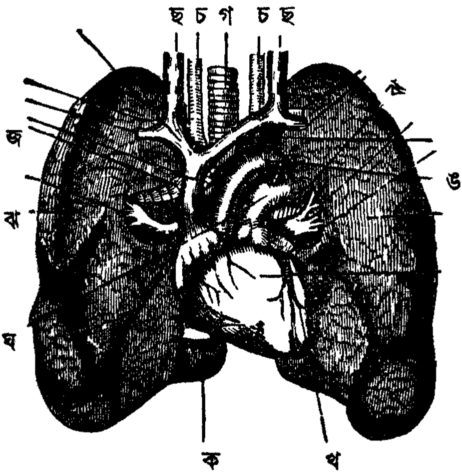
৪র্থ। রক্তসঞ্চালন দ্বারা শরীরের সকল আবর্জ্জনা সমস্ত শরীর হইতে আসিয়া হৃদয়ের ভিতর উপস্থিত হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

নিশ্বাস প্রশ্বাস।

আমরা ভূমিষ্ঠ হইলেই আমাদিগের নিশ্বাস-প্রশ্বাস আরম্ভ হয় এবং মৃত্যুর সময় ইহার শেষ হয়। শরীরের ভিতর রক্ত সর্ব্বদা ঘুরিয়া ঘুরিয়া অপরিস্কৃত হইতেছে, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। প্রশ্বাস দ্বারা আমরা রক্তের সেই সকল অপরিস্কৃত পদার্থ বাহির করিয়া দিই এবং নিশ্বাস দ্বারা উত্তম বাতাস গ্রহণ করিয়া রক্তকে সতেজ করি।

চতুর্থ প্রতিকৃতি। ফুস্ফুস্দ্বয় ও হৃদয়।*



* ক, ডাহিন ফুস্ফুস্। খ, বাম ফুস্ফুস্। গ, বায়ুনলী। ঘ, ফুস্ফুসীয় শিরা। ঙ, ফুস্ফুসীয় ধমনী। চ চ, এওর্টা বা বৃহদ্ধমনীর শাখা। ছ ছ, উর্দ্ধশিরার শাখা। জ, বায়ুনালীর শাখা। ঝ, অসংখ্য প্রান্তস্থ কোষের দুই একটী দেখা যাইতেছে।

নিশ্বাস প্রশ্বাস সম্পন্ন করিবার জন্য কর্ম্মকার ও স্বর্ণকারের হাপরের জাঁতার ন্যায় এক জোড়া যন্ত্র আমাদের বক্ষঃস্থলের ভিতর ডাইন ও বাম দিক পরিপূর্ণ করিয়া রহিয়াছে। ইহাদের নাম ফুস্‌ফুস্‌ বা ফুলকো। পাঁটা কাটিলে তাহার বুকের ভিতর যে ফুল্‌কো দেখা যায়, তাহাতে ফুৎকার দিলে কেমন ফুলিয়া উঠে অনেকেই তাহা দেখিয়াছেন। আমাদের ফুল্‌কো বা ফুস্‌ফুস্‌ দেখিতে ঠিক সেই রকম, কেবল পাটার ফুল্‌কো অপেক্ষা কিছু বড়। গলার মধ্যস্থলে হাত দিলে যে একটী মোটা ফাঁপা নল দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার ভিতরের রাস্তা দিয়া বায়ু প্রবেশ করে ও বাহিরে আসে বলিয়া তাহাকে বায়ুনলী কহে। ইহার উপরভাগ হইতে কণ্ঠস্বর উচ্চারণ করা যায় বলিয়া তাহাকে কণ্ঠনলী কহে। সর্ব্বোপরি উৎকণ্ঠাবরণ নামে একখানি ঢাকনি আছে। বায়ু ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ কণ্ঠনলীর ভিতর প্রবেশ করিতে গেলেই ঐ ঢাকনি তাহাকে বাধা দেয়। বায়ুনলীর নিম্নভাগ দুইটী নলে বিভক্ত হইয়া ডাইন ও বাম দিকের ফুস্‌ফুসে গিয়াছে এবং সেই দুইটী আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নল হইয়া বিভক্ত হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র নলগুলি পরিশেষে ফাঁপা, এবং গুড়গুড়ি নামক তামাক খাইবার যন্ত্রের ন্যায় নীচে মোটা ও উপর সরু হইয়া শেষ হইয়াছে। বায়ুনলীর নীচে যত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নল আছে, তৎসমুদায়কে বায়ুনলীভুজ কহে এবং তাহাদের শেষ-ভাগে যে গুড়গুড়ির ন্যায় ফাঁপা অংশগুলি আছে, তাহাদিগকে প্রান্তস্থ কোষ কহে। প্রত্যেক প্রান্তস্থ কোষের মধ্যে অনেকগুলি গর্ত্ত আছে। এই সকল কোষের বাহিরে অসংখ্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কৈশিকা নাড়ী ঘেরিয়া রহিয়াছে; হৃদয় হইতে আগত মন্দরক্ত

উহাতে বিচরণ করিতেছে। নিশ্বাসের সময় যে পরিষ্কার বাতাস প্রবেশ করিতেছে, তাহা প্রান্তস্থ কোষের ভিতর আসিতেছে ও তাহার নিকটস্থ কৈশিকা নাড়ীর ভিতর পরিষ্কার বাতাসের উপাদান অম্লজান প্রবেশ করাইয়া দিতেছে এবং কৈশিকা নাড়ী হইতে অপরিষ্কার পদার্থ গ্রহণ করিয়া প্রশ্বাসের সঙ্গে বাহির করিয়া দিতেছে। দুই দুইটী প্রান্তস্থ কোষের মধ্যে এক একটী কৈশিকা নাড়ী আছে, সুতরাং উভয় দিকের প্রান্তস্থ কোষের অভ্যন্তরে যে বিশুদ্ধ বায়ু প্রবেশ করিতেছে তাহা উভয় দিক হইতে আসিয়া কোষের পাতলা প্রাচীর ভেদ করিয়া কৈশিকার উপর পতিত হইতেছে এবং তদীয় অম্লজান কৈশিকা প্রাচীর ভেদ করিয়া প্রবেশ করাতে রক্ত আরও শীঘ্র পরিষ্কৃত হইয়া উঠিতেছে। তখন ঐ পরিষ্কার রক্ত হৃদয়ের বাম কর্ণ গহ্বরে চলিয়া যাইতেছে।

নিশ্বাস প্রশ্বাসের প্রক্রিয়া।

সকলেই দেখিতেছেন যে, নিশ্বাস টানিবার সময় বক্ষঃ ও উদর স্ফীত হইয়া উঠে এবং প্রশ্বাস ত্যাগ করিবার সময় উদর নামিয়া পড়ে ও বক্ষঃ ছোট হইয়া যায়। ইহা কেন হয় ও কিরূপে হয়?

যেমন একটী হাপরের খালি জাঁতার ভিতর বাতাস পূরিয়া দিলে হাপরের জাঁতা স্ফীত হইয়া উঠে, সেইরূপ নিশ্বাস টানিলে খালি ফুস্‌ফুসের ভিতর বাতাস প্রবেশ করিয়া ছোট ছোট প্রান্তস্থ কোষগুলিকে ফুলাইয়া তুলে। তাহাতে দুই দিকের ফুস্‌ফুস্ দুইটী স্ফীত হইয়া বক্ষঃস্থলকে সরাইয়া এবং উদরের ভিতর যে সকল যন্ত্র আছে তাহাদের ঠেলিয়া নামাইয়া নিজের জন্য অধিক স্থান অধিকার করে। এই জন্যই নিশ্বাস টানিবার সময়

বক্ষঃ ও উদর স্ফীত হয়। আবার প্রশ্বাস ফেলিবার সময় বক্ষঃস্থল ও উদরের যন্ত্রগুলি ফুস্‌ফুস্ দুইটীকে ঠেলিয়া বাতাস তাড়াইয়া দেয়, সুতরাং বক্ষঃ ছোট হইয়া পড়ে।

বক্ষঃস্থল পাঁজরার হাড়ে পরিপূর্ণ; তবে হাড় কিরূপে স্ফীত ও সঙ্কুচিত হয়? ইহার উত্তর এই যে, পাঁজরার অস্থিগুলি আমাদিগের বাক্স বা সিন্দুকের দুই পার্শ্বের ধাতুনির্ম্মিত হাতোলের ন্যায়। হাতোল দুইটী যেমন সহজ অবস্থায় ঝুলিতে থাকে, কিন্তু বাক্স তুলিবার সময় যখন উহাদের ধরিতে হয় তখন দুই পার্শ্বে খাড়া হইয়া উঠে, পাঁজরাগুলিও ঠিক সেইরূপ অর্দ্ধচন্দ্রাকার, ঠিক সেইরূপ দুই দিকে খিলান করা, এবং প্রশ্বাস ত্যাগ ও নিশ্বাস টানা এই দুই সময়ের মধ্যে ঠিক সেইরূপ ঝুলিতে থাকে। কিন্তু যখন আমরা নিশ্বাস টানি তখন অধিক বাতাস ফুস্‌ফুসের ভিতর প্রবেশ করিয়া চারিদিগের হাড় মাংস সরাইবার চেষ্টা করে। এখন, যদি এই সকল হাড় সরিয়া যাইবার উপায় না থাকিত তাহা হইলে নিশ্বাস টানিতে মহাকষ্ট হইত। কিন্তু এমনি নিয়ম করা হইয়াছে যে পাঁজরা গুলি যে মাংসে বাঁধিয়া ঝুলিতেছে, নিশ্বাস টানিবার সময় সেই মাংস সকল পাঁজরা-গুলিকে উপর হইতে টানিয়া ঘুরাইয়া খাড়া করিয়া তুলিয়া দেয়; সুতরাং দুইদিকের পাঁজরা সকল উঠিয়া দাঁড়ানতে অনেক জায়গা হয় ও অনেক বাতাস প্রবেশ করিতে পাবে।

যখন প্রশ্বাস ফেলিতে হয় তখন এত কাণ্ড করিতে হয় না। রবার যেমন স্থিতিস্থাপক, ফুস্‌ফুস্ দুইটীও সেইরূপ স্থিতিস্থাপক। রবারকে টানিয়া লম্বা করার পর যেমন আর চাপিয়া ছোট করিয়া দিতে হয় না, তেমনি নিশ্বাস টানিবার সময় আমরা

বাতাস পুরিয়া ফুস্ফুস্কে স্ফীত করিয়া দিলে আর কিছুই করিতে হয় না, ফুস্ফুস্দ্বয় আপনারাই বাতাস তাড়াইয়া আকুঞ্চিত হইতে থাকে। যেমন বাক্সের হাতল তুলিয়া ধরিয়া না থাকিলে পড়িয়া যায় সেইরূপ পাঁজরাগুলিও পড়িয়া যাইতে থাকে, তাহাতে সমস্ত বক্ষস্থল সঙ্কুচিত হইয়া যায়। এইরূপে সমস্ত প্রশ্বাস ক্রিয়া আমাদের বিনা চেষ্টায় সম্পন্ন হয়।

শ্বাস প্রশ্বাসের কতকগুলির ব্যতিক্রম।

হাঁচি, কাশি প্রভৃতি কার্য্যে হঠাৎ জোরে প্রশ্বাস ফেলিতে হয় বলিয়া নিজের চেষ্টা আবশ্যক। রাত্রিদিন শরীরের যে সকল কার্য্য হয় তাহার মধ্যে কতকগুলি কার্য্য সাধারণ নিশ্বাস প্রশ্বাসের একটু ব্যতিক্রম মাত্র। সেগুলি এত প্রয়োজনীয় যে, তাহাদের বিষয় কিছু জানা আবশ্যক।

১ম। দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ। ইহাতে তিনটী কার্য্য হয়:—

ক। একটী দীর্ঘনিশ্বাস টানিয়া ফুস্ফুস্ দুইটীকে স্ফীত করা হয়।

খ। তখন ফুস্ফুস্ দ্বয় উদরস্থ সকল যন্ত্রগুলিকে নীচের দিকে ঠেলিতে থাকে; তাহারা গিয়া মল ও মূত্র দ্বারে চাপ দিয়া মল মূত্র বাহির করিয়া দিবার চেষ্টা করে। কিন্তু ঐ সকল দ্বারে "অবরোধক" নামে যে মাংস আছে তাহারা সেই সময় মলদ্বার ও মূত্রদ্বারের মুখ বন্ধ করিয়া দেয়; সেইজন্য দীর্ঘ নিশ্বাস টানিলে মল মূত্র বাহির হইয়া যায় না।

গ। পরিশেষে সাধারণ প্রশ্বাস ত্যাগের সমুদায় কার্য্য হয়।

২য়। হিক্কা। এই কার্য্যে ফুস্ফুস্ দুইটী সহসা স্ফীত হইতে থাকে। সুতরাং হঠাৎ অধিক বাতাসের আবশ্যক হওয়াতে

আমরা তাড়াতাড়ি নিশ্বাস টানি। তখন স্বররজ্জু দুইটী এত খোলা থাকে না যে এত বাতাস নির্ব্বিঘ্নে ঢুকিতে পারে, কাযেই স্বররজ্জুর উপর দিয়া বাতাস যাইবার সময় রজ্জু দুইটীকে কাঁপাইয়া এক প্রকার হিক্ হিক্ শব্দ করিতে করিতে নামিয়া যায়।

৩য়। কাশি। এই কার্য্যে সাধারণ নিশ্বাস লইয়া তাহা ত্যাগ করিবার সময় একটু কষ্ট হয়। সাধারণ প্রশ্বাস ত্যাগের সময় যেমন স্বররজ্জু দুইটি শিথিল ও তাহাদের মধ্যস্থল খোলা থাকে, এখানে তাহা না হইয়া স্বররজ্জু দুইটী বন্ধ হইয়া যায়, সুতরাং প্রশ্বাসের বাতাস নীচে হইতে উঠিয়া তাহাদের জোরে ঠেলিয়া বাহির হইবার সময় খক্ খক্ শব্দ হয়।

৪র্থ। হাঁচি। ইহাও ঠিক কাশির ন্যায়; বিভেদ এই যে, এখানে প্রশ্বাসের বাতাস তালু দ্বারা বাধা পাইয়া মুখ দিয়া বাহির হইতে পারে না, সুতরাং নাসিকার ভিতর প্রবেশ করিয়া হিঁচ্ হিঁচ্ করিয়া অনুনাসিক শব্দ উৎপন্ন করে।

৫ম। হাস্য। ইহা হিক্কার ঠিক বিপরীত। হিক্কার সময় বাতাস তাড়াতাড়ি ভিতরে প্রবেশ করে, হাস্যের সময় তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া যায়; তখন স্বররজ্জু দুইটী কাঁপিতে থাকে ও হাঃ হাঃ শব্দ উৎপন্ন হয়।

৬ষ্ঠ। হাই বা জৃম্ভণ। ইহা কেবল মুখ খুলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস টানা ভিন্ন আর কিছুই নহে। ফুসফুস্মধ্যে বাতাস কম পড়িলে হাই তুলিতে হয়, এবং অন্যকে হাই তুলিতে দেখিলেও কখন কখন ঐরূপ ইচ্ছা হয়।

৭ম। মল ও মূত্রত্যাগ। আমরা এই দুই কার্য্যের প্রথমে দীর্ঘনিশ্বাস লইয়া তৎপরে স্বররজ্জু দুইটীকে বন্ধ করিয়া, ফুস্-

ফুস্ ও উদরস্থ মাংস সকল দ্বারা বেগ দিতে থাকি; তখন মল বা মূত্রদ্বারের 'অবরোধক' মাংস খুলিয়া যায় এবং মল মূত্র বাহির হইতে থাকে। মূত্রদ্বারের অবরোধক বন্ধন বা মাংস খুলিতে যত বেগ দিতে হয়, মলদ্বারের অবরোধক মাংস খুলিতে তাহা অপেক্ষাও অধিক বেগ আবশ্যক; সুতরাং মল ত্যাগ করিতে গেলে প্রথমেই মূত্র ত্যাগ হয়। কিন্তু যদি মলদ্বারে অধিক মল আসিয়া অবরোধক বন্ধনকে শিথিল করিয়া রাখিয়া থাকে, তাহা হইলে সামান্য বেগেই প্রথমে মলত্যাগ পরে মূত্রত্যাগ হয়।

৮ম। কথা কহা। এই কার্য্যে ধীরে ধীরে প্রশ্বাস ফেলিতে হয়। স্বররজ্জু দুইটী কথা কহিবার উপযুক্ত রূপ খোলা থাকাতে তাহারা কম্পিত হইয়া শব্দ উৎপন্ন করে; মুখ ও দন্তাদি দ্বারা সেই শব্দকে আমরা বাক্যরূপে ব্যবহার করি। বাক্শক্তির বর্ণনা কালে ইহার সম্পূর্ণ বিবরণ দেওয়া যাইবে।

৯ম। গান করা। ইহা ঠিক কথা কহার ন্যায়; বিভেদ এই যে, স্বররজ্জু দুইটীর অবস্থান্তর বশতঃ উচ্চ স্বর উৎপন্ন হয়।

শ্বাস প্রশ্বাসের ফল বা মূল উদ্দেশ্য।

ইহা দ্বিবিধ। প্রথমতঃ, শরীরের আবর্জ্জনা বাহির করা। দ্বিতীয়তঃ, রক্ত পরিষ্কার করা।

প্রথমতঃ শরীরের আবর্জ্জনা বাহির করা :—নিশ্বাস লইবার সময় আমরা পরিষ্কার বাতাস গ্রহণ করিয়া থাকি, কিন্তু প্রশ্বাসের বাতাসের সহিত কত আবর্জ্জনা বাহির হয় দেখা যাউক :—

১। নিশ্বাসের বাতাস শীতল, কিন্তু প্রশ্বাসের বাতাস তদপেক্ষা অনেক উষ্ণ। মুখে কাপড় দিয়া তাহাতে প্রশ্বাস ফেলিলে এই উষ্ণতা অনুভব করা যায়। ইহার কারণ অন্যত্র বলা যাইবে।

২। প্রশ্বাসের বায়ুতে আঙ্গারিকাম্ল বৃদ্ধি হয়। নিশ্বাসের বায়ুতে আঙ্গারিকাম্ল বাষ্প অল্পই থাকে; কিন্তু প্রশ্বাসের সহিত শরীর হইতে ইহা প্রচুর পরিমাণে নির্গত হয়। বহু লোক একত্রিত হইয়া এক ঘরের ভিতর দ্বার বন্ধ করিয়া নিদ্রা গেলে যে দুর্গন্ধ বাহির হয়, এবং আঁটা বাড়ীতে যাত্রা প্রভৃতি আমোদ উপলক্ষে বহুসংখ্যক লোক অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত একত্রিত হইয়া থাকিলে সেখানকার বায়ুতে যে দুর্গন্ধ পাওয়া যায়, তাহা প্রধানতঃ এই বাষ্পের গন্ধ। এই বিষ প্রতিবার প্রশ্বাসে শরীর হইতে এত অধিক পরিমাণে বাহির হয় যে, পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, সমস্ত দিনরাত্রিতে আমাদিগের প্রশ্বাসের সঙ্গে প্রায় পাকি এক সের ওজনের আঙ্গারিকাম্ল-বিষ বাষ্পরূপে বাহির হইয়া যায়। ইহা শরীর হইতে বাহির না হইলে মানবগণ শীঘ্রই মরিয়া যায়, এবং নিশ্বাসের সঙ্গে অধিক পরিমাণে লইলেও মৃত্যু হয়। কুখ্যাত অন্ধকূপহত্যায় যে এক শত তেইশ জন লোক মারা গিয়াছিল, তাহারা কেবল আঙ্গারিকাম্ল-বাষ্প-পরিপূর্ণ বাতাস নিশ্বাস লইয়াই কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিল। এই বাষ্প শরীরের ভিতর কিরূপে উৎপন্ন হয়, তাহা সপ্তম অধ্যায়ে বর্ণিত হইবে।

৩। প্রশ্বাসের বায়ুতে অম্লজান কমিয়া যায়। পরিষ্কার বাতাসে যে প্রচুর পরিমাণে অম্লজান থাকে, তাহা আমরা নিশ্বাস দ্বারা গ্রহণ করি; তাহার পর এই অম্লজান শরীরের ভিতর গিয়া রক্ত পরিষ্কার করে, শরীরকে উত্তপ্ত রাখে এবং অন্য কার্য্যে ব্যয়িত হয়। যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহার কিয়দংশ আঙ্গারিকাম্ল হইয়া এবং কিয়দংশ জলীয় বাষ্প হইয়া বাহির হয়, আর অপর কিয়দংশ কোন কার্য্যে না লাগিয়া বিশুদ্ধ অবস্থায় প্রশ্বাসের সহিত বাহির হয়।

৪। প্রশ্বাসের বাতাসের সহিত প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প নির্গত হইতে থাকে ; কাচ বা প্রস্তরপাত্রে ইহা ধরা যায়।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য রক্ত পরিষ্কার করা :—উপরে যে সকল আবর্জ্জনার কথা বলা হইল, তাহারা বাহির হইয়া গেলে রক্ত স্বয়ংই অনেকটা পরিষ্কার হইয়া যায়। কিন্তু রক্ত পরিষ্কার করিবার প্রধান উপায় অম্লজান বাষ্পের সংযোগ। এই বায়ু রক্তের সহিত মিশ্রিত ও সংযুক্ত হইয়া রক্তকে অধিক লালবর্ণ, সতেজ ও কর্ম্মক্ষম করিয়া তুলে।

নিশ্বাস প্রশ্বাসের হিসাব।

প্রতি মিনিটে যত বার নাড়ী চলে নিশ্বাস প্রশ্বাস প্রায় তাহার চতুর্থাংশের একাংশ বার হয়। যথা পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তি স্থির হইয়া বসিয়া থাকিলে নাড়ী প্রতি মিনিটে ৭৫ হইতে ৮০ বার চলে শ্বাস প্রশ্বাস ১৬ হইতে ১৮ বার পর্য্যন্ত হয়। পরিশ্রম করিলে বা পীড়া হইলে নাড়ীর গতি যত বৃদ্ধি হয় শ্বাস প্রশ্বাসের মাত্রাও সেইরূপ অনুপাতে বৃদ্ধি হয়।

সুস্থ যুবা বা প্রৌঢ় ব্যক্তি স্থির হইয়া থাকিলে প্রতি নিশ্বাসে ৩০ হইতে ৩৫ ঘন ইঞ্চ বায়ু গ্রহণ ও পরিত্যাগ করে এবং সমস্ত দিবা রাত্রিতে প্রায় ৭ লক্ষ ঘন ইঞ্চ বায়ু ব্যবহার করে। ১৫ হইতে ৩৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শ্বাস প্রশ্বাসের বায়ুর মাত্রা বাড়ে এবং ৩৫ হইতে ৬৫ পর্য্যন্ত একটু একটু কমে। যাঁহারা যোগ অভ্যাস করেন, চেষ্টা দ্বারা তাঁহারা শ্বাস প্রশ্বাসের সংখ্যা অতি আশ্চর্য্যরূপ কমাইয়া দিতে পারেন।

সপ্তম অধ্যায়।

মনুষ্য শরীরে তাপোৎপত্তি।

অচেতন পদার্থ সকল যেমন তাপ পাইলে উত্তপ্ত হয়, এবং শীতল রাখিলে চিরদিনই শীতল থাকে, জীবিত মানুষের শরীর সেরূপ নহে। কি শীতকাল, কি গ্রীষ্মকাল, সকল সময়েই আমাদের সুস্থ শরীর প্রায় একই পরিমাণে উত্তপ্ত থাকে। গ্রীষ্মকালের ভয়ানক গ্রীষ্মের সময় ঘর্ম্ম হইয়া শরীর শীতল হয় এবং শীতকালে শরীরের ভিতর হইতে অধিক তাপ জন্মাইয়া শরীরকে উত্তপ্ত করে। বস্ত্রাদি দ্বারাও ঐ কার্য্য সাধিত হয়। গো, মেষ, মহিষাদি স্তন্যপায়ী জীব এবং পক্ষিগণেরও এই নিয়ম। এইরূপে বারো মাস শরীর একই রকম উত্তপ্ত থাকে। যে দিন এই তাপ না থাকে, সেই দিন এই জীবনও গত হয়।

তবে যে সামান্য পরিমাণে হ্রাস বৃদ্ধি না হয় এমন নহে। কথা এই যে, হ্রাস বৃদ্ধি দীর্ঘস্থায়ী হইলেই বিপদ্। (১) পীড়ার সময় শরীরের উত্তাপ বাড়িয়া কমিয়া যায়, কিন্তু যদি শীঘ্র শীঘ্র এই তাপের পরিমাণ স্বাভাবিক না হয়, তাহা হইলে জীবন সংশয় হয়। (২) গ্রীষ্মকালের ভয়ানক গ্রীষ্মের সময় তাপমান যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিলে অতি সামান্য বৃদ্ধি বোধ হয়। (৩) অতি শৈশবকালে শরীরের তাপ সামান্য পরিমাণে অধিক থাকে। (৪) রাত্রিতে ও প্রাতঃকালে দিনের অপেক্ষা সামান্য পরিমাণে কম তাপ থাকে। (৫) দৌড়াইয়া গেলে ও অন্যান্য পরিশ্রম করিলে তাপের কিঞ্চিৎ

বৃদ্ধি হয়। (৬) আহার করিলে তাপ অতি সামান্য বৃদ্ধি হয়। এই সকল কারণে যে বৃদ্ধি ও হ্রাস হয়, তাহা সামান্য ও সকল সময় দেখা যায় না; কেবল পীড়ার সময়ের হ্রাসবৃদ্ধিই অধিক।

মনুষ্য এবং গো, মহিষ, বানর, কুকুর প্রভৃতি স্তন্যপায়ী জীব এবং পক্ষিগণও এইরূপে বারোমাস প্রায় একরূপ তাপ সংরক্ষণ করিতে সমর্থ। এইজন্য প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ এই সকল জীবকে উষ্ণ-শোণিতক জীব কহেন। পক্ষান্তরে সর্প ও সরীসৃপাদি জীব সকল গ্রীষ্মকালের তাপে অস্থির হয় ও শীতকালে শীত সহ্য করিতে না পারিয়া লুক্কায়িত থাকিবার চেষ্টা করে। পণ্ডিতেরা ইহাদিগকে শীতল-শোণিতক জীব কহেন।

তাপের উৎপত্তি।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, মনুষ্য-শরীরের এই তাপ কোথা হইতে কিরূপে উৎপন্ন হয়? রসায়নবিদগণ বলেন যে, প্রদীপের উত্তাপ বা কাষ্ঠ দগ্ধ করিলে উত্তাপ যেরূপে হয়, মনুষ্যশরীরের উত্তাপও ঠিক সেইরূপে উৎপন্ন হয়। প্রদীপ জ্বালিলে বা কাষ্ঠ পোড়াইলে, কাষ্ঠ ও তৈলের 'অঙ্গার' ও 'জলজান' নামক উপাদানের সহিত বাতাসের অম্লজান সংযুক্ত হইতে থাকে। সংযুক্ত হওয়াতে এক দিকে তাপ ও আলোক উৎপন্ন হয় ও অপর দিকে জলীয় বাষ্প ও আঙ্গারিকাম্ল নামক এক প্রকার বাষ্প উৎপন্ন হইয়া ধূমরূপে উড়িয়া যায়। শরীরের ভিতর ঠিক সেইরূপ হয়। খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে অঙ্গার ও জলজান আছে। সেই অঙ্গার ও জলজান রক্তের ভিতর প্রবেশ করিয়া কতক অংশ শরীর পোষণ করিতে লাগে ও অবশিষ্ট অংশ নিষ্কর্ম্মা হইয়া রক্তের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ায়। এই অতিরিক্ত

পদার্থকে পোড়াইয়া শরীর তপ্ত রাখিবার জন্য অতি সুন্দর আয়োজন করা হইয়াছে। প্রতি নিশ্বাসে আমরা বাহিরের বাতাস হইতে প্রচুর পরিমাণে অম্লজান বাষ্প টানিয়া লইতেছি। এই অম্লজান নাসিকার ভিতর দিয়া ফুস্‌ফুস্ যন্ত্রের প্রান্তস্থ কোষে ও তথা হইতে রক্তে চলিয়া যাইতেছে। রক্তে গিয়া কিয়দংশ রক্ত পরিষ্কার করিতেছে ও অবশিষ্ট অংশ উপরোক্ত নিষ্কর্ম্মা অঙ্গার ও জলজানের সহিত সংযুক্ত হইয়া অগ্নি উৎপাদন করিতেছে। সেই অগ্নিতে রক্ত উত্তপ্ত হইয়া চারিদিকে ছুটিতেছে ও সমস্ত শরীর উত্তপ্ত করিয়া তুলিতেছে। ইহারই সঙ্গে সঙ্গে জলীয় বাষ্প ও আঙ্গারিকাম্ল ধূম উৎপন্ন হইতেছে।

আবার যেমন বড় আগুন জ্বালিয়া তাহার নিকটস্থ ভূমি ঝাঁট দিয়া শুষ্ক ডালপালা প্রভৃতি আবর্জ্জনা ঐ অগ্নিতে ফেলিয়া দিলে পুড়িয়া যায়, সেইরূপ যখন রক্তের ভিতর পূর্ব্বোক্ত প্রকারে তাপ উৎপন্ন হয়, তখন মাংস পেশী, স্নায়ু প্রভৃতি শারীরিক বিধান সকল নিজ নিজ কায করিতে তাহাদের যে যে অংশ নষ্ট হইয়াছে, সেই সেই অংশ রক্তের ভিতর ফেলিয়া দেয়। এখন যদি এই সকল আবর্জ্জনা রক্তে থাকিয়া যাইত, তাহা হইলে রক্ত খারাপ হইয়া যাইত, সুতরাং এই নষ্ট পদার্থ সকলের অনেকাংশ সেই অম্লজানের সহিত সংযুক্ত হইয়া পুড়িয়া যায়।

রাত্রিদিন শরীরের ভিতর এইরূপে অগ্নি উৎপন্ন হইতেছে। এই অগ্নি উৎপন্ন হওয়াতে আমরা উত্তপ্ত ও জীবিত রহিয়াছি। আর অগ্নি উৎপাদনের সঙ্গে যে জলীয় বাষ্প ও আঙ্গারিকাম্লের ধূম উৎপন্ন হইতেছে, তাহা প্রশ্বাসের সহিত বাহির হইয়া

যাইতেছে। যেমন প্রজ্বালিত প্রদীপের ধূম ও কাষ্ঠের ধূম বাহির হয়, যেমন কল-কারখানা ও রেলগাড়িতে কয়লা পুড়িয়া ধূম উঠে, আমাদের শরীর হইতেও সেইরূপে ধূম বাহির হয়। এই সকল ধূম যেমন উত্তপ্ত হইয়া বাহির হয়, আমাদের শরীরের ধূমও সেইরূপ উত্তপ্ত হইয়া বাহির হয়; শীতল হস্তের উপর প্রশ্বাস ফেলিলেই এই তাপ অনুভব করা যায়। যে জলীয় বাষ্প উহার সহিত রাত্রি দিন বাহির হইতেছে পরিষ্কার শ্লেটের উপর মুখ দিয়া জোরে প্রশ্বাস ফেলিয়া বিদ্যালয়ের বালকগণ তাহাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলবিন্দু আকারে দেখিতে পান। অনন্তজ্ঞানী বিধাতা বিশ্বকাণ্ডের কত কার্য্য যে একসূত্রে গাঁথিয়াছেন, তাহা কে নিশ্চয় করিবে? কে হঠাৎ বলিতে পারে যে, যে উপায়ে আমরা উত্তপ্ত রহিয়াছি, সেই উপায়েই আমাদের অন্ন রন্ধন হইতেছে, রেলগাড়ী চলিতেছে ও প্রদীপ জ্বালা হইতেছে?

তাপক্ষয়।

এখন হয় ত কেহ জিজ্ঞাসা করিবেন যে, যদি এত তাপ সর্ব্বদাই উৎপন্ন হইতেছে, তবে আমরা তাহাতে পুড়িয়া মরি না কেন? ইহার উত্তর এই যে, তাপ যেমন সর্ব্বদাই উৎপন্ন হইতেছে তেমনি সর্ব্বদাই নষ্ট হইতেছে। প্রথমতঃ, শরীর উত্তপ্ত হওয়ার পর অধিকাংশ তাপ বিকীর্ণ হইয়া যায়। যেমন তোমার গরম দুগ্ধের বাটি অনেকক্ষণ শীতল বাতাসে রাখিলে তাহার তাপ চারিদিকের বাতাসে মিশাইয়া যায় এবং দুগ্ধ ঠাণ্ডা হইয়া পড়ে, তেমনি ভিতরের তাপে চর্ম্ম গরম হইলে চর্ম্মের তাপও চারিদিকের বাতাসে মিশাইয়া যায়। শরীর উত্তপ্ত হইলে আমরা যখন পাখার বাতাস করি তখন উহাতে তাপ বিকীর্ণ হয় বলিয়াই

শরীর শীতল বোধ হইতে থাকে। দ্বিতীয়তঃ, রাত্রিদিন শরীর হইতে বাষ্প উড়িয়া যাইতেছে এবং তাহাতে জল ও তাপ বাহির হইয়া যাইতেছে। গ্রীষ্মকালে অধিকাংশ তাপ এই উপায়ে নষ্ট হয়। সে সময়ে বাহিরের উত্তপ্ত বাতাসে শরীর ভয়ানক গরম হইয়া উঠে, তখন শিরা ধমনী প্রভৃতি রক্তের নলগুলি শিথিল চর্ম্মের ভিতর দিয়া প্রচুর পরিমাণে জল বাহির করিয়া দেয়। ইহাকেই আমরা ঘর্ম্ম বলি। যেমন জল জ্বাল দিয়া বাষ্প করিতে অনেক অগ্নি নষ্ট হয়, তেমনি শরীরের জল যখন বাষ্পাকারে ঘর্ম্ম হইয়া উড়িয়া যায়, তখন অনেক তাপ নষ্ট করিয়া যায়। সেইজন্য ঘর্ম্মের পর শরীর শীতল বোধ হয়। যখন ভিতর হইতে তাপ উৎপন্ন হয়, তখনও এইরূপ বাষ্প হইয়া ঠাণ্ডা হয়। এইজন্য জ্বর ছাড়িবার সময় ও অত্যন্ত ক্রোধের পর ঘর্ম্ম হয়। তৃতীয়তঃ, শীতল দ্রব্যের সহিত আমাদের সংযোগ হইলে অনেক তাপ সঞ্চালিত হয়, এই জন্য শীতল জলে স্নান করিলে শরীরের অনেক তাপ নষ্ট হয়। চতুর্থতঃ, প্রশ্বাসের সহিত তাপ বাহির হইয়া যায়, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

শরীরের ভিতর তাপ যে সর্ব্বদাই অধিক জন্মাইতেছে এমনও নহে। কখন কখন তাপ কম পড়ে, তখন কি হয়? শীতপ্রধান দেশেও শীতকালে তাপের অভাব হয়। ইহা পূরণ করিবার দুইটী উপায় আছে। প্রথমতঃ বস্ত্রাচ্ছাদন। মোটা ও কালবর্ণের বস্ত্রে অধিক তাপ সংরক্ষিত হয়, এই জন্য শীতপ্রধান দেশবাসীরা সেই সকল বস্ত্র পরিধান করেন। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সে পরিমাণে তাপ রক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই বলিয়া আমরা এতদ্দেশবাসিগণ

শ্বেত ও সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করি। দ্বিতীয়তঃ, খাদ্য। গ্রীষ্মপ্রধান দেশ অপেক্ষা শীতপ্রধান দেশের লোক অধিক খাদ্য ভক্ষণ করেন। এতদ্দেশবাসিগণও শীতকালে অপেক্ষাকৃত অধিক খাইয়া থাকেন। অধিক খাদ্যে যে অধিক পরিমাণে অঙ্গার ও জল জান পাওয়া যায়, তাহা দগ্ধ হইয়া অধিক তাপ উৎপন্ন করে। কিন্তু তাহার জন্য অধিক অম্লজানও আবশ্যক, নহিলে অধিক অঙ্গার পুড়িবে কিসে? অধিক অম্লজান, বাতাস হইতে লইতে হইলে হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া অধিক নিশ্বাস লওয়া উচিত; কিন্তু সে বড় কষ্টের কথা। অতএব আমাদের উপকারের জন্য বিধাতা এমনি নিয়ম করিয়াছেন যে, শীতকালে বাতাস ঘন হইয়া যাইবে ও অল্প স্থানে অধিক অম্লজান থাকিবে, সুতরাং অল্প নিশ্বাস লইলে অনেক অম্লজান পাওয়া যাইবে ও তাহাতে অধিক তাপ উৎপন্ন করিবার উপায় হইবে। ইহা নিশ্চয়ই স্রষ্টার অগাধ জ্ঞানের পরিচয়।

অষ্টম অধ্যায়।

ভোজন ও পচন।

ভোজন মনুষ্য-জীবনের এক অতি প্রধান কার্য্য, সুতরাং ইহার বর্ণনা একটু বিস্তৃত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাব আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে ভোজনের প্রধান সহকারী দুইটী যন্ত্র ও দুইটী প্রবৃত্তির কথা অল্প অল্প বলিব। যন্ত্র দুইটী দন্ত ও জিহ্বা এবং প্রবৃত্তি দুইটী ক্ষুধা ও তৃষ্ণা। ক্ষুধা ও তৃষ্ণা না থাকিলে যেমন কিছুই খাইতে ইচ্ছা হইত না, তেমনি দন্ত ও জিহ্বা না থাকিলে অধিকাংশ খাদ্যই খাওয়া যাইত না। ইহারাই আহারের প্রধান সহকারী।

১। দন্ত ও জিহ্বা।

দন্ত দ্বারা দুইটী প্রধান কার্য্য হয়; প্রথম, খাদ্যদ্রব্য চর্ব্বণ, দ্বিতীয় পরিষ্কাররূপে বাক্য কথন। প্রথম কার্য্যই এই স্থানে বর্ণনীয়, দ্বিতীয় কার্য্যের কথা অন্যত্র বলা যাইবে। খাদ্য-চর্ব্বণের সময় ভিন্ন ভিন্ন দন্ত দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য হইয়া থাকে। মুখের ঠিক সম্মুখভাগে উপরে চারিটী ও নীচের চারিটী সর্ব্বশুদ্ধ আটটী ছেদক দন্ত আছে। আমরা ইহাদের দ্বারা কোমল অথচ বড় বড় দ্রব্য কাটিয়া খাই। ছেদন দন্তগুলি চওড়া ও পাতলা। কথা কহিতে আরম্ভ করিলেই ছেদক দন্ত দেখা যায়, উচ্চহাস্য করিলে সম্পূর্ণরূপ বাহির হয়। উপরের ছেদক দন্ত চারিটির ডাইন দিকে একটী ও বামদিকে একটী বেধক দন্ত আছে। ঐরূপ নীচেও ছেদকদন্তের উভয় পার্শ্বে দুইটী বেধক দন্ত আছে; ইহাদের

উদ্দেশ্য খাদ্যদ্রব্য বিদ্ধ করা। মাংসাদি ভক্ষণ করিতে ইহারা কার্য্যে লাগে। ছেদক দন্তগুলি যেমন পাতলা ও চওড়া, বেধক দন্তগুলি সেরূপ নহে, তাহারা তীক্ষ্ণাগ্র ও সরু। যখন দুধেদাঁত থাকে, তখন উপরকার বেধক দন্তের বহির্দিকে দুই দুইটী করিয়া দুই দিকে চারিটী এবং নীচে ও ঐরূপ চারিটী সর্ব্বশুদ্ধ আটটী পেষক দন্ত থাকে। ইহারা জাঁতার মত, চওড়া ও কঠিন। বালক বালিকাগণ ইহাদের দ্বারা কঠিন দ্রব্য ভাঙ্গিয়া ও গুঁড়াইয়া খায়। দুধেদাঁত পড়িয়া যখন আসল দাঁত উঠে, তখন প্রত্যেক স্থানের পেষক দন্তের যায় গায় দুইটী করিয়া দ্বিমূল দন্ত উঠে। ইহাদের দুইটী করিয়া মূল বা শিকড় থাকে বলিয়া ইহাদিগকে দ্বিমূল দন্ত কহা যায়। বাল্যকালে যে আটটী পেষক দন্ত ছিল তাহার স্থানে আটটী দ্বিমূল দন্ত হইল। আসল দাঁত উঠিলে দ্বিমূল দন্তের বহির্ভাগে আবার তিন তিনটী করিয়া পেষক দন্ত উঠে। নিম্নলিখিত তালিকা দেখিলে উপরের কথাগুলি বুঝা যাইবে :—

দুধে দাঁত		পেষক	বেধক	ছেদক	বেধক	পেষক
	উপরের শ্রেণী	২,	১,	৪,	১,	২,
	নীচের শ্রেণী	২,	১,	৪,	১,	২,

অর্থাৎ সর্ব্বশুদ্ধ $\frac{\text{উপরে } ১০}{\text{নীচে } ১০} = ২০$

আসল দাঁত		পেষক	দ্বিমূল	বেধক	ছেদক	বেধক	দ্বিমূল	পেষক
	উপরের শ্রেণী	৩,	২,	১,	৪,	১,	২,	৩,
	নীচের শ্রেণী	৩,	২,	১,	৪,	১,	২,	৩,

অর্থাৎ সর্ব্বশুদ্ধ $\frac{\text{উপরে } ১৬}{\text{নীচে } ১৬} = ৩২$

সুতরাং দুধেদাঁতের মোট সংখ্যা ২০ ও আসল দাঁতের মোট সংখ্যা ৩২। জিহ্বা দ্বারা খাদ্যদ্রব্যের আস্বাদ বোধ হয় এবং মুখমধ্যে খাদ্যদ্রব্য চর্ব্বণ ও গলাধঃকরণ করার সাহায্য হয়। কথা কহিতে জিহ্বার সাহায্য একান্ত আবশ্যক। যথাস্থানে এই সকল কথা বর্ণনা করা যাইবে।

২। ক্ষুধা ও তৃষ্ণা।

সমস্ত শরীরে খাদ্য দ্রব্যের অভাব হইলেই আমরা ক্ষুধা অনুভব করি। মনে এইরূপ অনুমান হয় যেন পাকস্থলীই ক্ষুধার আধার। সেইজন্য যখন বলি যে, "ক্ষুধায় জঠর জ্বলিতেছে" তখন বোধ হয় যেন পাকস্থলী ভিন্ন শরীরের অন্য কোন অংশের সহিত ক্ষুধার সম্বন্ধ নাই। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। যদিও আহার করিলে পাকস্থলীই প্রথমে শান্ত হয়, এবং তাহাতেই ক্ষুধা নিবৃত্ত হয়, তথাপি পাকস্থলী ভিন্ন অন্য কোন স্থান দিয়া খাদ্য প্রবেশ করাইলেও ক্ষুধা শান্তি হইয়া থাকে। দেখা গিয়াছে যে, রোগ হইয়া যাহাদের খাদ্যদ্রব্য গিলিবার ক্ষমতা না থাকে তাহাদিগের মলদ্বারে পিচকারী দ্বারা খাদ্য প্রবেশ করাইলেও ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়। ইহাতে স্পষ্টই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, সমস্ত শরীরে খাদ্যের অভাব হইলে মন সেই সংবাদ জানিতে পারে। ক্ষুধা সেই সংবাদের বাক্য বা চিঠি এবং পাকস্থলী সেই সংবাদবাহক দূত। আহার করিলে সমস্ত শরীরের অভাব পূরণ হয় বটে, কিন্তু যাহা দ্বারা সংবাদ গিয়াছিল সেই পাকস্থলীতে প্রথমেই সকল খাদ্য জমা হয় বলিয়া তাহার নিজের অভাব প্রথমে মোচন হয়। সেই জন্য উপবাসের পরদিন আহার করিলে পাকস্থলী তৎক্ষণাৎ শান্ত হয়, কিন্তু খাদ্যদ্রব্য জীর্ণ হইয়া দুর্ব্বলশরীরের

সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িতে এবং তদ্দ্বারা সমস্ত শরীর সুস্থ হইতে অনেক ক্ষণ সময় লাগে।

পণ্ডিতেরা পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, যদি খাদ্যদ্রব্য ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ খাওয়া যায়, যথা তূলা, রবার, কাঁইবীজ প্রভৃতি তাহা হইলে একবার একটু ক্ষুধা শান্ত হয়, তাহার পর যেমন ক্ষুধা তেমনি বোধ হইতে থাকে।

খাদ্যের অভাব হইলে যেমন ক্ষুধাবোধ হয় জলের অভাব হইলে সেইরূপ তৃষ্ণা অনুভূত হয়। ক্ষুধা অনুভব করিবার জন্য যেমন একটী বিশেষ স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে, তৃষ্ণা অনুভব করিবার জন্য ও তদ্রূপ একটী নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে। গলার ভিতর এই নির্দ্দিষ্ট স্থান। অল্প অল্প জল দিয়া গলা ভিজাইলে তৃষ্ণা সম্পূর্ণ নিবারণ হয় না, কিন্তু মলদ্বারে বা গলার ভিতর পিচকারী দিয়া জল প্রবেশ করাইলেও তৃষ্ণা নিবারণ হয়। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, তৃষ্ণা কেবল গলায় নহে। সমস্ত শরীরের অভাব জ্ঞাপক ক্ষুধা ও তৃষ্ণা একই প্রকারের প্রবৃত্তি।

ভোজন ও পচনের বিবিধ অবস্থা।

আমরা যে সকল পদার্থ ভক্ষণ করি তাহার অধিকাংশই জীর্ণ হইয়া রক্তে পরিণত হয়, এবং শরীরের সকল স্থানে গমন করিয়া সেই সকল স্থানের অভাব পূরণ ও তদ্দ্বারা জীবন রক্ষা করে। কিন্তু হরিদ্বর্ণ উদ্ভিদ্ সিদ্ধ পক্ক অন্ন ব্যঞ্জন এবং অপক্ক বা কঠিন খাদ্য সকল রক্তে পরিণত হইবার পূর্ব্বে বহু প্রক্রিয়ার আবশ্যক। খাদ্য পদার্থ ১মতঃ, মুখমধ্যে বহুবিধ প্রকারে রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া; ২য়তঃ, পাকস্থলীতে গমন করে; সেখানে নানারূপ অবস্থান্তরের পর, ৩য়তঃ, ক্ষুদ্র অন্ত্র নলীতে প্রেরিত হয় এবং তথা হইতে;

৪র্থতঃ, বৃহৎ অন্ত্র নলী মধ্যে গমন করিয়া পচন-ক্রিয়ার শেষ অবস্থায় উপস্থিত হয়। আমরা একে একে এই চারিটী প্রক্রিয়া বর্ণনা করিব।

১ম। মুখ মধ্যে খাদ্যদ্রব্যের অবস্থা।

খাদ্য চর্ব্বণকালে মুখগহ্বরে কোমল, কঠিন প্রভৃতি খাদ্য পদার্থ সকল দন্ত দ্বারা ভগ্ন, পিষ্ট ও চূর্ণীকৃত হইতে থাকে এবং এই সময়ে মুখমধ্যস্থ জলীয় পদার্থের সহিত মিশ্রিত হইয়া গলাধঃকরণের উপযুক্ত হয়। ভিন্ন ভিন্ন দন্ত দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের খাদ্যদ্রব্য আক্রান্ত হয়। আমরা লুচি, মিঠাই প্রভৃতি কোমল অথচ বিস্তৃত পদার্থগুলি সম্মুখের ছেদক দন্ত দ্বারা প্রথমে কাটিয়া লইয়া তৎপরে পেষক ও দ্বিমূল দন্তের উপর ফেলিয়া চূর্ণ করিতে থাকি। মুড়ি, মটরভাজা, ইক্ষু, প্রভৃতি কঠিন পদার্থ প্রথম হইতেই দ্বিমূল ও পেষকরূপ যাঁতার উপর ফেলিয়া সজোরে চাপিতে থাকি, আর মাংস প্রভৃতি পদার্থ প্রথমে বেধক দন্ত দ্বারা বিদ্ধ করিয়া তৎপরে চর্ব্বণ করিবার চেষ্টা করি। এই সকল দেখিয়া অনেকে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, মানুষের দন্ত উদ্ভিদ্ ও জন্তু উভয়ই ভক্ষণ করিবার উপযুক্ত সুতরাং আমাদিগের পক্ষে মাংস খাওয়া সৃষ্টি কর্ত্তার অভিপ্রেত, এই মত কত দূর সত্য, তাহা বলা যায় না, কিন্তু বেধক দন্তগুলি যে মাংস বিদ্ধ করিবার উপযুক্ত তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

চর্ব্বণকালে খাদ্যদ্রব্য মুখমধ্যস্থ যে জলীয় পদার্থের সহিত মিশ্রিত হইতে থাকে তাহার নাম লালা। ইহা মুখমধ্যস্থিত চারি জোড়া (আটটী) গ্রন্থি হইতে নিঃসৃত হয় এবং মুখ হইতে শ্লেষ্মার ন্যায় যে এক প্রকার পদার্থ নির্গত হয় তাহার সহিত

একত্রিত হইয়া খাদ্যদ্রব্যের সহিত মিশ্রিত হয়। লালার সহিত বায়ু মিশ্রিত হইতে শ্বেতবর্ণ বুদ্‌বুদ্‌ উৎপন্ন হয়, তখন ইহাকে থুথু কহে।

লালাক্ষার রসযুক্ত। শতভাগ লালার ৯৪$\frac{1}{2}$ ভাগ জল, ১$\frac{1}{2}$ ভাগ লালাসার নামক পদার্থ এবং অবশিষ্ট অংশ মেদ, শ্লেষ্মা, সোডা, পোটাস, সামান্য লবণ, চূর্ণক ও ম্যাগ্‌নীসিয়া নামক পদার্থ আছে। মুখস্থির থাকিলে অতি সামান্য পরিমাণে লালা নিঃসৃত হয়, কিন্তু মুখ নাড়িলে, বিশেষতঃ মুখে খাদ্য দিয়া জিহ্বা নাড়িলে অথবা ক্ষুধার সময় খাদ্যদ্রব্য দর্শন বা চিন্তা করিলে ইহা প্রচুর পরিমাণে নির্গত হয়। অভ্যাসের সহিত ইহার কিয়ৎ পরিমাণে সম্বন্ধ আছে; দুর্গন্ধময় পদার্থ আঘ্রাণ করিলে আমাদের (বাঙ্গালী প্রভৃতি জাতির) মুখ যেমন লালা পূর্ণ হয়, অন্য কোন জাতীর সেরূপ দেখা যায় না।

এইরূপে সমস্ত দিন রাত্রি (বা ২৪ ঘণ্টায়) প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির মুখ হইতে প্রায় দেড় সের লালা নির্গত হয়। লালাদ্বারা চারিটি কার্য্য সাধিত হয়। প্রথমতঃ ইহা দ্বারা খাদ্যদ্রব্য কোমল ও গিলিবার উপযুক্ত হয়। দ্বিতীয়তঃ ইহাদ্বারা মুখের অভ্যন্তরভাগ আর্দ্র থাকে তাহাতে আমরা জিহ্বা নাড়িয়া কথা কহিতে পারি। তৃতীয়তঃ ইহা দ্বারা খাদ্যদ্রব্যের কিয়দংশ গলিয়া যায়, এবং ঐ গলা অংশ জিহ্বার স্নায়ুর উপর পতিত হওয়াতে মিষ্ট কষায় প্রভৃতি নানাবিধ স্বাদ বোধ হয়। চতুর্থতঃ ইহা দ্বারা কোন কোন প্রকার খাদ্যদ্রব্য জীর্ণ হয়। যে সকল খাদ্যে শ্বেতসার অধিক আছে, তাহা পাকস্থলীর দ্রাবক রসে জীর্ণ হয় না, কেবল মুখমধ্যস্থিত লালার সহিত মিশ্রিত হইয়া, চিনির ন্যায়

এক প্রকার পদার্থে পরিণত হয়, তাহাই পাকস্থলীতে পড়িলে শীঘ্র জীর্ণ হয়। এই নিমিত্ত চাউল, আলু প্রভৃতি শ্বেতসার-প্রধান পদার্থ-ভক্ষণ করিতে উত্তমরূপে চর্ব্বণ করিয়া লালার সহিত মিশ্রিত করিয়া লওয়া উচিত। সম্ভবতঃ লালাসার নামক লালার উপাদানের সংযোগেই শ্বেতসার চিনি হইয়া যায়।

লালার সহিত উত্তমরূপ মিশ্রিত ও চর্ব্বিত হইলে খাদ্যদ্রব্য গলাধঃ কৃত হয়। গলাধঃকরণের প্রক্রিয়াকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম প্রক্রিয়ায় খাদ্যদ্রব্য মুখগহ্বর হইতে তালুর পশ্চাদ্ভাগ পর্য্যন্ত গমন করে। তথা হইতে দ্বিতীয় প্রক্রিয়ায় গলনলীর ভিতর প্রবিষ্ট হয়, এবং তৎপরে শেষ প্রক্রিয়ায় অন্ন নালীর ভিতর দিয়া পাকস্থলীতে পতিত হয়। এই তিনটী প্রক্রিয়ার প্রত্যেকটি এত শীঘ্র শেষ হয় যে, আমরা তাহা অনুধাবন করিতে পারি না, সুতরাং গলাধঃকরণ ক্রিয়া সামান্য এবং অবিভাজ্য বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু এই তিন প্রক্রিয়ার প্রাকৃতিক বৈষম্য শিক্ষার্থী মাত্রেরই জানা উচিত।

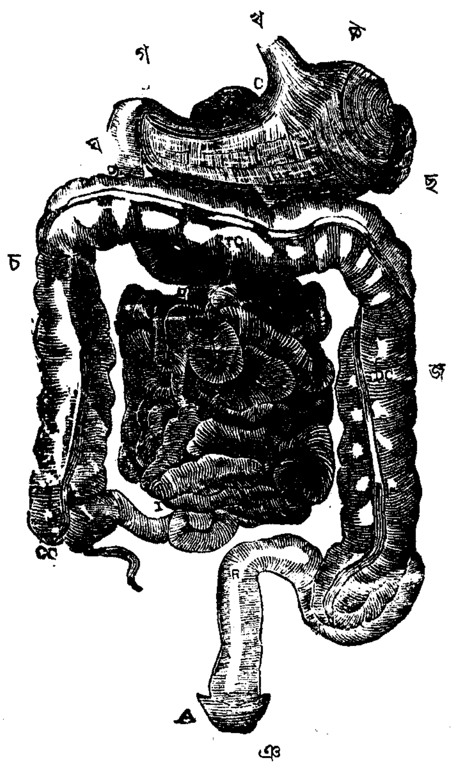
প্রথম প্রক্রিয়া আমাদিগের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন। ইহাতে জিহ্বার অগ্রভাগ এবং কপোলদেশের (গালের) মাংস সকল খাদ্যদ্রব্যকে টানিয়া প্রথমতঃ ঊর্দ্ধ দিকে ঠেলিতে থাকে। সেখানে বাধা পাইয়া খাদ্যদ্রব্য মুখের বাহিরে আসিয়া পড়িতে পারিত; কিন্তু এই সময়ে জিহ্বার অগ্রভাগ উপরকার দন্ত শ্রেণীর অব্যবহিত পশ্চাদ্ভাগে এত দৃঢ়রূপে সংলগ্ন থাকে যে, খাদ্যদ্রব্য বাহিরে আসিতে পারে না, সুতরাং চাপ পাইয়া পশ্চাৎদিকেই যাইতে থাকে। পশ্চাদ্ভাগে যাইবার বিশেষ সুবিধাও হয়, কারণ জিহ্বার অগ্রভাগ যখন ঊর্দ্ধদিকে সংলগ্ন

হইয়া খাদ্যদ্রব্যকে ঠেলিতে থাকে তখন জিহ্বার মধ্যভাগ খোলা হইয়া যায়, সুতরাং তাহাতে প্রণালী বা নরদামার ন্যায় পথ হয়, এবং সেই প্রণালীর উপর দিয়া খাদ্যদ্রব্য গড়াইয়া যাইবার বিশেষ সুবিধা হয়। এইরূপে খাদ্য পদার্থ জিহ্বার পশ্চাদভাগ পর্য্যন্ত গমন করে। এই প্রক্রিয়ার সমস্তই আমাদিগের ইচ্ছা-ধীন। আমরা ইচ্ছা করিলে খাদ্যদ্রব্য মুখ হইতে বাহিরে ফেলিতে পারি।

দ্বিতীয় প্রক্রিয়া এরূপ নহে; ইহার প্রায় কোন অংশই আমাদের ইচ্ছাধীন নহে। যখন খাদ্যদ্রব্য জিহ্বার পশ্চাদ্‌ভাগ হইতে গলনলীর ভিতর প্রবেশ করে তখন ইহার উপর যত মাংসপেশীর চাপ পড়ে, যদিও তাহাদের অনেকগুলি আমাদের ইচ্ছাধীন (অর্থাৎ ইচ্ছা করিলে নাড়িতে পারি বা স্থির রাখিতে পারি) তথাপি এই কার্য্যের অধিকাংশই আমাদের আয়ত্তাধীন নহে। তাহার কারণ এই যে, জিহ্বার পশ্চাদ্‌ভাগে খাদ্য পদার্থ উপস্থিত হইলে তত্রত্য "স্পর্শ বোধক" স্নায়ু সকল 'খাদ্য পদার্থ উপস্থিত হইয়াছে" এই সংবাদ মস্তিষ্কে লইয়া যায়, এবং তথা হইতে প্রতিফলিত কার্য্যের নিয়মানুসারে এরূপ উপায় অবলম্বিত হয় যে, আমাদিগের ইচ্ছা থাকুক বা নাই থাকুক খাদ্যদ্রব্যের উপর চারি পার্শ্বের মাংস সকল চাপিয়া তাহাকে গলনলীর ভিতর ঠেলিয়া দেয়। প্রতিফলিত কার্য্য কিরূপ তাহা পশ্চাৎ বর্ণিত হইবে। এক্ষণে তাহার একটী দৃষ্টান্ত দিলেই শিক্ষার্থিগণ বর্ত্তমান বিষয় বুঝিতে পারিবেন। চক্ষের ভিতর ধূলিকণা পতিত হইলে চক্ষু স্নায়ু সেই সংবাদ মস্তিষ্কে লইয়া যায় এবং তাহাতে যে 'প্রতিফলিত কার্য্য' উৎপন্ন হয়, তাহাতে আমাদের

ইচ্ছা থাকুক বা নাই থাকুক চক্ষুর পাতা তৎক্ষণাৎ আপনা আপনি বন্ধ হইয়া পড়ে। এখানেও ঠিক সেই রূপ কার্য্য হয়।

পঞ্চম প্রতিকৃতি। পরিপাক যন্ত্র। *



* ক, পাকস্থলী। খ, পাকস্থলীর উপরের মুখ। গ, নীচের মুখ। ঘ, দ্বাদশাঙ্গুলীক অংশ। ঙঙঙ, ক্ষুদ্র অন্ত্রনলীর গুটান অংশ সমূহ। চ, বৃহদন্ত্রনলীর ঊর্দ্ধগামী অংশ, ছ, বৃহদন্ত্রনলীর সমতল অংশ, জ, ঐ অন্ত্রনলীর নিম্নগামী অংশ। এ, মলদ্বার।

দ্বিতীয় প্রক্রিয়ায় খাদ্য পদার্থ কণ্ঠনালীর ঊর্দ্ধভাগ অতিক্রম করিয়া গমন করে। সকলেই জানেন যে, কণ্ঠনালীর ভিতর এক বিন্দু জল প্রবেশ করিলে বা সুপারির কণা বাধিলে কত কাশি উপস্থিত হয়। বাস্তবিক এইরূপ অবস্থায় সুপারির কণা বা জলের বিন্দু কণ্ঠনালীর ভিতর পড়িয়া পাছে নিশ্বাস যন্ত্রের কোন হানি করে, এই জন্য যতক্ষণ উহা না বাহির হইয়া যায়, ততক্ষণ কাশি হইতে থাকে। অতএব স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, অন্নের ডেলা বা অন্য কোন খাদ্য পদার্থ তন্মধ্যে প্রবেশ করিলে তৎক্ষণাৎ প্রাণ নষ্ট হয়, অথচ খাদ্য পদার্থ যদি এই নলের উপর দিয়া গমন না করে, তাহা হইলে অন্ননালীর ভিতর প্রবেশ করিতে পারে না। এই বিষম সমস্যা পূরণ ও ভয়ানক বিপদ নিরাকরণের একটী সুন্দর উপায় আছে। জিহ্বার অব্যবহিত পশ্চাতেই কণ্ঠনালী, তাহার পশ্চাতে গলনলী। কণ্ঠনালীর উপর একখানি ঢাকনি আছে উহার নাম উৎকণ্ঠা-বরণ। ঐ ঢাকনি জিহ্বার সহিত এরূপভাবে সংযুক্ত আছে যে, প্রথম প্রক্রিয়ার শেষে যখন খাদ্যদ্রব্য জিহ্বার পশ্চাদ্ভাগে ও তালুর নিকট আসিয়া কণ্ঠনালীর উপর যাইবার উপক্রম করে, তখন জিহ্বাও নীচে নামিয়া ঢাকনি খানিকে কণ্ঠনালীর মুখের উপর ফেলিয়া দেয় এবং তাহাতে যে মসৃণ সেতু বা পুল প্রস্তুত হয়, খাদ্যদ্রব্য তাহারই উপর দিয়া গড়াইয়া গিয়া গলনলীর ভিতর প্রবেশ করে * যখন কণ্ঠনালীর উপর দিয়া খাদ্যদ্রব্য যায়,

* যাঁহারা এই বিষয়টী উত্তমরূপ বুঝিবার জন্য কৌতুহলাবিষ্ট হইবেন, তাঁহারা প্রথমে এক টুকরা কাগজে একটী মানুষের মুখ আঁকিবেন এবং উহার যথাস্থানে জিহ্বা আঁকিয়া, জিহ্বার অব্যবহিত পশ্চাদ্ভাগ হইতে একটী সরু

তখন ঢাকনি খানি পড়িয়া যাওয়াতে কণ্ঠনালীর মুখ বন্ধ হইয়া যায়, সুতরাং মুহূর্ত্তকালের জন্য নিশ্বাস প্রশ্বাসও বন্ধ থাকে, কিন্তু যেই খাদ্যদ্রব্য নামিয়া যায়, অমনি ঢাকনি উঠিয়া দাঁড়ায় এবং নিশ্বাস পূর্ব্ববৎ চলিতে থাকে।* কেবল খাদ্যকে যাইতে দিবার জন্য ঢাকনি খানি 'কোঁৎ' শব্দ করিতে যতক্ষণ লাগে, ততক্ষণের জন্য পড়ে। যেমন আমি একটী নালার এপার হইতে ওপার যাইতে ইচ্ছা করিলে যদি লাফাইয়া যাই, তবে তাহার মধ্যে পড়িয়া যাওয়া সম্ভব, কিন্তু যদি একখানি তক্তা ফেলিয়া তাহার উপর দিয়া অপর পারে যাই এবং তৎক্ষণাৎ এ পারের কোন লোক তক্তাখানিকে তুলিয়া লয়, তাহা হইলে আমারও নর্দ্দামায় পড়িবার ভয় থাকে না, নর্দ্দমার উপর ভাগও এক মুহূর্ত্তমাত্র বন্ধ হইয়া আবার তখনই পূর্ব্বের ন্যায় খোলা থাকে। এখানেও উৎকণ্ঠাবরণ ঠিক সেইরূপ তক্তার কার্য্য করে।

তৃতীয় প্রক্রিয়ায় খাদ্যদ্রব্য গলনলী হইতে অন্ননালীর ভিতর

নল নামাইয়া দিবেন। এই নলটীর "কণ্ঠনালী" এই নাম লিখিয়া দিবেন এবং ইহার উপরে একখানি ঢাকনি এমনি ভাবে আঁকিবেন যে, ঢাকনির একধারে জিহ্বার সঙ্গে আঁটা, অন্য ধার খোলা, যেন কণ্ঠনালীর উপর উঠিতেছে ও পড়িতেছে। তৎপরে কণ্ঠনালীর অব্যবহিত পশ্চাদ্‌ভাগে (পৃষ্ঠের দিকে) আর একটী নল আঁকিবেন এবং তাহার "গলনলী" এই নাম লিখিয়া দিবেন। গলনলীর উপরভাগ কিছু মোটা, এবং উপর মুখ খানি এমনভাবে খোলা থাকিবে যে, জিহ্বার উপর দিয়া একটী ক্ষুদ্র মিঠাই গড়াইতে গড়াইতে আসিয়া কণ্ঠনালীর উচ্চ ঢাকনিকে হঠাৎ কণ্ঠনালীর উপর ফেলিয়া দিয়া তাহার উপর দিয়া আসিয়া গলনলীর মধ্যে পড়িবে।

* মনোযোগ করিলেই বুঝাযায় যে, যখন আমরা কোন পদার্থ গিলিয়া ফেলি, তখন ঐ পদার্থ না নামিয়া গেলে নিশ্বাস প্রশ্বাস হয় না।

প্রবেশ করে।* এই নলের ভিতর দিয়া খাদ্যদ্রব্য নদীর তরঙ্গের ন্যায় আন্দোলিত হইতে হইতে ক্রমে পাকস্থলীতে পতিত হয়।

২য়। পাকস্থলীতে খাদ্যদ্রব্যের অবস্থা।

খাদ্যদ্রব্য এইরূপে চর্ব্বিত ও লালা-মিশ্রিত হইয়া পাকস্থলী নামক যে যন্ত্রের মধ্যে পতিত হয়, সেই যন্ত্র চর্ম্মনির্ম্মিত ভিস্তির ন্যায়। উহা যেমন জল পরিপূর্ণ হইলে এক দিক মোটা ও অপর দিক সরু এবং মধ্যস্থল বক্রভাবাপন্ন হয়, পাকস্থলীও ঠিক সেইরূপ। কিন্তু পাকস্থলীর দুইটী মুখ। উপরকার মুখ অন্ননলীর সহিত সংযুক্ত। ইহার ভিতর দিয়া খাদ্য আসিয়া পড়িতে থাকে এবং পাকস্থলীতে কিয়ৎকাল থাকিয়া সমুদায় খাদ্যদ্রব্য নীচের মুখ দিয়া ক্ষুদ্র অন্ত্র নামক নলের ভিতর যাইতে থাকে। যতক্ষণ খাদ্যদ্রব্য পাকস্থলীর ভিতর থাকে; ততক্ষণ যে যে কার্য্য হয়, প্রথমে তাহাই বর্ণনা করিব।

যে মুহূর্ত্তে পাকস্থলীর ভিতর খাদ্যদ্রব্য প্রবেশ করে, সেই মুহূর্ত্ত হইতে এই থলিয়ার ভিতর চারি দিক হইতে এক প্রকার জলীয় পদার্থ বাহির হইতে থাকে। এই জলীয় পদার্থ খাদ্যদ্রব্যকে কিয়ৎ পরিমাণে দ্রবীভূত করে বলিয়া ইহাকে 'দ্রাবক রস' কহে। ইহা কোথা হইতে কিরূপে উৎপন্ন হয়, তাহা জানা উচিত। পাকস্থলীর অভ্যন্তর ভাগে অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দৃষ্টি করিলে দেখা যায় যে, ইহার ভিতর শত শত ক্ষুদ্র গর্ত্ত রহিয়াছে। এই সকল গর্ত্তে কিছুই নাই। ইহাদের তলে পরীক্ষা করিলে

* গলনলীর নিম্নভাগের নাম অন্ননালী। অন্ননালী একটী সরু নল মাত্র। ইহার নিম্নপ্রান্তে একটী থলিয়া আছে। ঐ থলিয়ার নাম পাকস্থলী।

দেখা যায় যে, প্রত্যেক গর্ত্তের নীচে একটি করিয়া অতি সরু নল রহিয়াছে। এই সকল নলের ভিতর হইতে দ্রাবক রস নিঃসৃত হয়, এবং গর্ত্তের ভিতর দিয়া আসিয়া খাদ্যদ্রব্যকে ভিজাইয়া দেয়।

দ্রাবক রস।

দ্রাবক রস অম্ল আস্বাদযুক্ত। এই পদার্থের সহস্র ভাগের মধ্যে ৯৯৪২ ভাগ জল, ৩১৯ ভাগ পেপ্‌সীন্‌ বা পরিপাচক নামক পদার্থ, এবং অবশিষ্ট অংশ লবণ দ্রাবক, সামান্য লবণ, লৌহ, প্রস্ফুরক ইত্যাদি। প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির পাকস্থলীতে ২৪ ঘণ্টায় ইহা পাঁচ হইতে দশ সের পর্য্যন্ত নিঃসৃত হইয়া থাকে। সম্ভবতঃ লবণ দ্রাবক থাকাতেই দ্রাবক রস অম্ল আস্বাদ যুক্ত হয়।

দ্রাবক রস খাদ্যদ্রব্যের সহিত যতই মিশিতে থাকে, খাদ্য-দ্রব্যও ততই তরল হইতে থাকে। এইরূপে কিয়ৎক্ষণের মধ্যে খাদ্য পদার্থ প্রথমে পুল্‌টীশ্‌ বা মোহনভোগের ন্যায় ঘন এবং তৎপরে দেখিতে ক্ষীরের ন্যায় এক প্রকার তরল পদার্থ হইয়া যায়। যত দ্রব্য ভক্ষণ করা হইয়াছিল, ক্রমে সেই সমুদায় দ্রব্য একত্র মিশ্রিত হইয়া এরূপ অবস্থাপন্ন হয় যে, তখন আর কোন্‌টি কি খাদ্য পদার্থ, তাহা চিনিতে পারা যায় না; কেবল মাত্র ইহাই বুঝা যায় যে, খাদ্য সকল মিশিয়া ও তরল হইয়া ক্ষীরের ন্যায় এক প্রকার পদার্থ হইয়াছে। এই ক্ষীরবৎ পদার্থ অতিশয় দুর্গন্ধবিশিষ্ট ও অম্ল আস্বাদযুক্ত হয়। সময়ে সময়ে অল্প পিত্ত মিশ্রিত হওয়াতে ইহা ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণাক্ত হয়।

যে সকল পদার্থ কোমল, সাধারণতঃ তাহাই এই রসে শীঘ্র গলিয়া যায়, এবং কঠিন পদার্থ বিলম্বে ও অল্প পরিমাণে গলে।

কিন্তু কোমল পদার্থ হইলেই যে পুষ্টিকর হইবে, তাহা নহে। ছোলা মটর প্রভৃতি অনেক কঠিন পদার্থ জীর্ণ করিতে কষ্ট হয় বটে, কিন্তু জীর্ণ হইলে ভাত, সাগুদানা প্রভৃতি কোমল পদার্থ অপেক্ষা অনেক পুষ্টিকর। তবে কিরূপ পদার্থ পুষ্টিকর? যাহা সহজে রক্তশিরার ভিতর প্রবেশ করিয়া রক্ত হইয়া পড়ে, তাহাই অধিক পুষ্টিকর। দ্রবীভূত পদার্থ ভিন্ন রক্তশিরার ভিতর প্রবেশ করিতে পারে না। অতএব ইহা সহজেই বুঝা যাইতেছে যে, যে দ্রব্য রন্ধন দ্বারা, বা আহারের সময় জলে, অথবা চর্ব্বণের সময় মুখের লালা দ্বারা গলে নাই, তাহা যদি দ্রাবক রসেও না গলে, তাহা হইলে উহা জীর্ণ হওয়া কঠিন। জল, লালা ও দ্রাবক রসেও যে খাদ্য দ্রবীভূত না হয়, তাহার মধ্যে দুই একটি কিরূপে জীর্ণ হয়, তাহা পরে বলিব।

ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের পরিপাকের নিয়ম।

জল পাকস্থলীতে পড়িবামাত্র ইহার চারিদিকের রক্তশিরা দ্বারা শোষিত হয়। ঝোল দাইল প্রভৃতিতে যে জল থাকে, তাহাও এইরূপে অতি শীঘ্র জীর্ণ হয়। যে সকল দ্রব্যে জল মিশাইয়া খাওয়া যায়, তাহার জল প্রথমে জীর্ণ হইয়া যায়। সুতরাং যে খাদ্য এইরূপে খাওয়া হইয়াছে, তাহাও পূর্ব্বোক্ত ক্ষীরবৎ পদার্থ হয়, দ্রাবক রস তখন উহাকে গলাইতে আরম্ভ করে।

জল ব্যতীত অন্যান্য সকল খাদ্যও এত শীঘ্র জীর্ণ হইবার পথে আইসে যে, অন্ন, ব্যঞ্জন, মাংসাদি সম্বলিত পূর্ণ আহারের পর এক ঘণ্টার মধ্যে তাহার সমুদায়ই "ক্ষীরবৎ পদার্থ" হইয়া পড়ে এবং দুই হইতে তিন ঘণ্টার মধ্যে অনেকগুলি খাদ্য পাকস্থলী হইতে চারিদিকের রক্তাধারে প্রবেশ করে (অর্থাৎ জীর্ণ

হইয়া যায়) এবং যে সকল খাদ্য পাকস্থলীতে জীর্ণ না হয়, তাহারা অন্ত্র মধ্যে প্রবেশ করে।

পাকস্থলীর অভ্যন্তরে ভাত এক হইতে দেড় ঘণ্টার মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণে জীর্ণ হয়, দুগ্ধ ও মৎস্য ২ ঘণ্টায়, কোমল মাংস ও আলু আড়াই ঘণ্টায়, কঠিন মাংস ৩ ঘণ্টায় জীর্ণ হয়। সাধারণতঃ উদ্ভিদ্ অপেক্ষা মাংস শীঘ্র "ক্ষীরবৎ পদার্থ" হইয়া পড়ে। উদ্ভিদের সবুজ অংশ অর্থাৎ খোসা কোন প্রকারেই জীর্ণ হয় না। মৎস্য, মাংস, দুগ্ধ, ডিম্ব, ছোলা ও মটরের কতক অংশ পাকস্থলীতে দ্রাবক রস দ্বারা জীর্ণ হয়। তৈল, ঘৃত প্রভৃতি এখানে ক্ষণেক কাল থাকে মাত্র তাহারা এখানে জীর্ণ হয় না। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, দ্রাবক রস অম্ল আস্বাদযুক্ত, সুতরাং যে দুগ্ধ খাওয়া যায়, তাহার সহিত দ্রাবক রস সংযুক্ত হইলে ঐ দুগ্ধ দধিবৎ পদার্থ হয়, তৎপরে দধিবৎ পদার্থ পুনরায় গলিয়া রক্তের ভিতর প্রবেশ করিতে থাকে। শিশুগণের অজীর্ণ রোগ হইলে তাহারা যে দুগ্ধ বমন করে, তাহা দধিবৎ পদার্থ কেন হয়, আমরা এক্ষণে তাহা বুঝিতে পারিলাম। চিনি দ্রাবক রসে মিশ্রিত হইয়া অতি শীঘ্র জীর্ণ হয়। ভাত, রুটী প্রভৃতি যে সকল পদার্থে অনেক শ্বেতসার আছে, সেই সকল পদার্থের শ্বেতসার দ্রাবক রসে জীর্ণ হয় না। শ্বেতসার লালার সহিত মিশ্রিত হইয়া চিনির ন্যায় এক প্রকার পদার্থ হইয়া পড়ে; তাহাই পাকস্থলীতে পতিত হইয়া অল্প পরিমাণে জীর্ণ হইয়া থাকে। কিন্তু শ্বেতসার জীর্ণ হওয়া এখানেও শেষ হয় না। যে অংশ পাকস্থলীতে জীর্ণ না হয়, তাহা অন্ত্রনলী মধ্যে প্রবেশ করে, এবং তথায় লালার ন্যায় আরও দুই এক প্রকার রসের সহিত মিশ্রিত হইয়া চিনি হইয়া

যায়, তাহাই জীর্ণ হয় (অর্থাৎ রক্তে প্রবেশ করে)। তৈল, ঘৃত প্রভৃতি পাকস্থলীতে জীর্ণ হয় না, অন্ত্রমধ্যে জীর্ণ হয়।

পাকস্থলীতে এইরূপে সমুদায় খাদ্য একত্রিত ও ক্ষীরবৎ পদার্থে পরিণত হইলে কোন কোন দ্রব্য উপরোক্ত প্রকারে এই স্থান হইতেই রক্তাধারের ভিতর প্রবেশ করে, অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপ জীর্ণ হইয়া যায়। অবশিষ্ট সমুদায় ক্ষীরবৎ পদার্থ পাকস্থলীর নীচের খমু দিয়া অন্ত্রনলীর ভিতর প্রবেশ করিতে থাকে।

কিন্তু খাদ্যদ্রব্য তো অনেকক্ষণ পাকস্থলীতে আসিয়াছে, তবে এতক্ষণ এ সকল দ্রব্য অন্ত্রনলীমধ্যে পড়ে নাই কেন, এখনই বা পড়িতে চলিল কেন? যখন পাকস্থলীতে খাদ্যদ্রব্য না থাকে, তখন ইহা একটী সামান্য থলিয়ার ন্যায় থাকে এবং ইহার দুইটী মুখই অতি অল্প খোলা থাকে। কিন্তু যেই আমরা কিছু মাত্র আহার করিতে থাকি, সেই উপরকার মুখ অতি সাবধানে খুলিতে ও বন্ধ হইতে থাকে; অর্থাৎ যখনই আমরা খাদ্যটী গিলি তখনই খাদ্যটীকে পাকস্থলীতে প্রবেশ করিতে দিয়া মুখ বন্ধ হয়, আবার যখন গিলি তখনই খাদ্যটীকে যাইতে দিয়া পুনরায় বন্ধ হয়। এরূপ হওয়ার উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য এই যে, পাকস্থলী অতিশয় স্থিতিস্থাপক বলিয়া যে পরিমাণে খাদ্য ইহাতে প্রবেশ করুক না কেন, পাকস্থলী ঐ দ্রব্যকে শক্তরূপে আঁটিয়া ধরে, কেবল আঁটিয়া ধরিয়াই ছাড়ে না, খাদ্যটীকে চাপিয়া ঠেলিতে থাকে। এখন যদি কোথাও খোলা মুখ থাকে, তাহা হইলে চাপা চাপিতে খাদ্যদ্রব্য সেই মুখ দিয়া বাহির হইয়া যাইবে। সুতরাং উপরকার মুখ যদি এত

সাবধানে বন্ধ না হইত, তাহা হইলে আমরা যখন যাহা খাইতাম তাহাই বমি হইয়া উঠিয়া পড়িত।

ইহা যদি বুঝা গেল, তাহাহইলে নীচের মুখের কি অবস্থা হইবে তাহা বুঝিতে কোন ক্লেশ নাই। আমরা যে সময়ে আহার করিতে থাকি, তখন পাকস্থলীর উপরকার মুখের জন্য পূর্ব্বোক্ত-রূপ বন্দোবস্ত না থাকিলে যেমন খাদ্যদ্রব্য বমি হইয়া উঠিয়া পড়িত, তেমনি নীচেকার মুখ যদি বন্ধ না হইত, তাহা হইলে খাদ্যদ্রব্য আপনা আপনিই নীচেকার মুখ দিয়া অন্ত্রমধ্যে পড়িয়া যাইত, বিশেষতঃ পাকস্থলীর চাপাচাপিতে অতি শীঘ্রই পড়িত; তাহাতে পরিপাক কার্য্যের এত বিঘ্ন হইত যে, সকল মানুষই উদরাময় বা পেটের পীড়ায় কষ্ট পাইত। এই জন্য আহারের সময় এবং আহারের অনেকক্ষণ পরেও পাকস্থলীর নীচেকার মুখ এত দৃঢ়ভাবে বন্ধ হইয়া থাকে যে, যদি একটী কুকুরকে পূর্ণ আহার দিয়া আহারের পরেই তাহার পাকস্থলী কাটিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে দেখা যায় যে অন্য সকল স্থান দিয়া খাদ্যপদার্থ পড়িতে থাকিবে, কিন্তু নীচেকার আঁটামুখের ভিতর দিয়া একটুও পড়িবে না।

পাকস্থলীর দ্রাবকরসে সকল পদার্থ দ্রবীভূত হয় না, আর এখানকার রক্তশিরায় চুষিয়া সকল খাদ্যকে রক্তও করিতে পারে না। সুতরাং আহার করার দুই তিন ঘণ্টা পরে যখন সকল খাদ্য পাকস্থলীতে মিশ্রিত ও ক্ষীরবৎ পদার্থ হইয়া যায়, তখন এই খাদ্যের কিছু কিছু অংশ জীর্ণ হয় ও রক্তাধারে প্রবেশ করিয়া রক্ত হইয়া যায়। তখন অবশিষ্ট খাদ্যের অবস্থা কি হইবে? তাহাদিগকে কিরূপে জীর্ণ করিয়া শরীরের উপকারে লাগান যাইবে? এই অবশিষ্ট খাদ্যের জন্য

এইরূপ নিয়ম হইয়াছে যে, যেই পাকস্থলীর মধ্যে এক অংশ খাদ্য জীর্ণ হইল, অমনি তাহার অন্য অংশ, অর্থাৎ যাহা পাকস্থলীতে জীর্ণ হইবে না, সেই সকল অংশ, পাকস্থলীর চাপ পাইয়া নীচেকার মুখের দিকে যাইতে লাগিল। * এই সময়ে নীচেকার মুখ ও আস্তে আস্তে একটু একটু করিয়া খুলিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে আহারের পর খাদ্যদ্রব্যের কিয়দংশ পাকস্থলীতে জীর্ণ হয় ও অপর সমুদায় অংশ তিন চারি ঘণ্টার মধ্যে ক্রমে ক্রমে পাকস্থলী ত্যাগ করিয়া অন্ত্রনলীর মধ্যে প্রবেশ করে, তখন পাকস্থলী পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় একটী শূন্য থলিয়ার মত পড়িয়া থাকে।

৩য়। ক্ষুদ্র অন্ত্রনলী মধ্যে খাদ্যদ্রব্যের অবস্থা।

যে তরল ক্ষীরবৎ পদার্থ এইরূপে অন্ত্রনলীর ভিতর প্রবেশ করিল, তাহাতে কি কি পদার্থ আছে দেখ। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ঘৃত ও তৈলময় দ্রব্য পাকস্থলীতে জীর্ণ হয় না, এবং চাউল, ময়দা প্রভৃতির শ্বেতসার মুখগহ্বরে জীর্ণ হইবার পথে আইসে, কিন্তু পাকস্থলী মধ্যে ইহার প্রায় কিছুই জীর্ণ হয় না। সুতরাং এই দুই শ্রেণীর পদার্থ পাকস্থলী হইতে অন্ত্রনলী মধ্যে প্রবেশ করিল। এতদ্ব্যতীত দুগ্ধ মাংসাদির যে সকল অংশ পাকস্থলীতে জীর্ণ হয় না, তাহাও অন্ত্রনলীর মধ্যে প্রেরিত হইল। এই সকল দ্রব্য ক্ষীরবৎ অবস্থায় যখন পাকস্থলী হইতে অন্ত্রনলীর ভিতর প্রবেশ করে, তখন ইহাদের সহিত প্রচুর পরিমাণে

* এ স্থলে বলা উচিত যে আহারের ৩। ৪ ঘণ্টা পরে পাকস্থলীর চাপের এরূপ পরিবর্ত্তন হয় যে, তখন খাদ্যদ্রব্য কেবল নীচের মুখের দিকেই ঠেলা হইতে থাকে।

দ্রাবক রস মিশ্রিত হওয়াতে ইহাদের দুর্গন্ধ ও অম্ল আস্বাদ পূর্ব্বে (পাকস্থলীতে) যেরূপ ছিল তাহা অপেক্ষাও বাড়িয়া উঠে।

ক্ষুদ্র অন্ত্রনলী একটী মোটা ও প্রকাণ্ড বড়নল। ইহা প্রায় সাড়ে তের হাত লম্বা ও একগাছি বাঁশের লাঠির ন্যায় মোটা। চিত্র দেখিলে জানা যায় যে, এত বড় লম্বা নল কেবল গুটাইয়া থাকে বলিয়াই অল্প স্থানের ভিতর থাকিতে পারিয়াছে। এই নলের ভিতর খাদ্যদ্রব্যের অনেকগুলি পদার্থ জীর্ণ হয়। খাদ্য-দ্রব্য পাকস্থলী হইতে প্রথমেই এই নলের যে অংশে প্রবেশ করে, তাহার নাম "দ্বাদশাঙ্গুলীক অংশ।" ইহা বার বা তের অঙ্গুলী পরিমাণ দীর্ঘ বলিয়া ইহাকে দ্বাদশাঙ্গুলীক অংশ কহে। যকৃৎ নামক যন্ত্র ও দ্বাদশাঙ্গুলীক অংশের মধ্যে একটী সরু নল আছে। এই স্থলে যকৃতের বিষয় কিছু বলা উচিত।

যকৃৎ।

আমাদিগের উদরের ডাইন দিকের পাঁজরার হাড় যেখানে শেষ হইয়াছে নিম্নে সেই স্থান ও উর্দ্ধে ষষ্ঠ পাঁজরার অস্থি পর্য্যন্ত ব্যাপৃত হইয়া এই যন্ত্র রহিয়াছে। পিত্ত নামক এক প্রকার রস এই যন্ত্র হইতে নিঃসৃত হয়। কোন কোন বৃক্ষ হইতে যেরূপ নির্য্যাস বা আটা বাহির হয় সেইরূপ যকৃৎ হইতে পিত্তও একটু একটু করিয়া নিরন্তর বাহির হয়। উহা দেখিতে পীত বা ঈষৎ লাল মিশ্রিত হরিদ্রাবর্ণ বিশিষ্ট ও অতিশয় তিক্ত আস্বাদ যুক্ত। শতভাগ পিত্তে ৮৬ ভাগ জল ও ১৪ ভাগ কঠিন পদার্থ। এই ১৪ ভাগের ভিতর ৯ ভাগ পিত্ত-সার নামক এক প্রকার ক্ষার ও অম্ল সংযুক্ত পদার্থ, ৩ ভাগ বর্ণক পদার্থ। উহাতেই পিত্তের বর্ণ পীত। অবশিষ্ট ১ ভাগ মেদ ও ১ ভাগ লবণ প্রভৃতি পদার্থ।

যকৃতের সর্ব্বত্র হইতে বাহির হইয়া যকৃৎ নল নামক একটী নলের ভিতর দিয়া পিত্ত ক্ষুদ্র অন্ত্র নলীর ভিতর গিয়া পড়িতে থাকে ও সেখানে খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া পরিপাক কার্য্যের সাহায্য করে। কিন্তু মানুষ তো দিবারাত্রি আহার করে না সুতরাং পরিপাক কার্য্যও সর্ব্বদা হয় না। অথচ পিত্ত দিবা রাত্রই বাহির হইতেছে। এমন কি সমস্ত দিন রাত্রে ১৫ হইতে ২০ ছটাক পর্য্যন্ত পিত্ত বাহির হইয়া থাকে। অতএব এত পিত্ত যায় কোথায় ও কি কাজে লাগে?

ইহার উত্তর এই যে, যে সময় পরিপাক কার্য্য হয় না তখন, পিত্ত নলের যে মুখ দিয়া পিত্ত সচরাচর আসিয়া অন্ত্রনলীতে পড়িতে থাকে, উহা কুঞ্চিত হইয়া থাকে সুতরাং পিত্ত ঐ পথে আসিতে না পাইয়া পিছে হটিয়া যায় এবং একটী সরু নলের ভিতর দিয়া গিয়া পিত্তাধার নামক একটী ছোট ব্যাগ বা থলিয়ার ভিতর জমা হইতে থাকে। পরে যখন খাদ্য দ্রব্য পাকস্থলী হইতে অন্ত্রনলীর দ্বাদশাঙ্গুলীক অংশে উপস্থিত হয় তখন ঐ অংশ ও তাহার নিকটস্থ যকৃৎ নল নাচিতে থাকে, যকৃৎ নলের সরুমুখ ঢিলা হইয়া যায়, এবং ঐ অবসরে পিত্তাধার হইতে সঞ্চিত পিত্ত গড় গড় করিয়া আসিয়া অন্ত্রনলী মধ্যে পড়িতে থাকে।

কিন্তু মানুষ যখন অনেকক্ষণ উপবাস করিয়া থাকে, ৮।১০ ঘণ্টা বা তাহার ও অধিক সময় কিছু না খায় তখন পিত্ত ঐ ব্যাগের ভিতর জমিতে জমিতে উহা পূর্ণ হইয়া যায়, এবং বর্ষাকালে পুষ্করিণী পূর্ণ হইয়া গেলে উহার অতিরিক্ত জল যেমন উচ্ছ্বলিত হইয়া নিকটস্থ নর্দ্দমা, খানা প্রভৃতিও পূর্ণ করিয়া দেয় সেইরূপ পিত্ত যখন ঐ থলিয়া পূর্ণ করিয়া বাহির হইয়া পড়িতে

থাকে, তখন যকৃৎনল ও পূর্ণ হইয়া যায়, এবং অন্ত্রনলীর দিকের সরুমুখ ঠেলিয়া অল্প অল্প আসিয়া অন্ত্রনলীর ভিতর পড়িতে থাকে। সেখানে আসিয়া দেখে যে খাদ্য দ্রব্য উপস্থিত নাই। ইহাকেই সাধারণ ভাষায় পিত্ত পড়া কহে।

পিত্তের কার্য্য।

পিত্ত যকৃৎ হইতে কেন উৎপন্ন হয়? কেনই বা আবার সেখান হইতে অন্ত্রনলীর ভিতর যায়? পিত্তের চারিটী কর্ম্ম।

১। যে রক্ত আমাদের শরীরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহা পরিষ্কৃত করিবার জন্য ফুস্‌ফুস্‌ যন্ত্র যেমন সর্ব্বদা ব্যস্ত যকৃৎও সেইরূপ সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকে। নিশ্বাস প্রশ্বাসের সময় যেমন আমরা প্রশ্বাস ফেলিলে ফুস্‌-ফুসের ভিতর দিয়া রক্তের আবর্জ্জনা আসিয়া সেই বাতাসের সহিত বাহির হইয়া যায়, ও তাহাতে রক্ত পরিষ্কার হইতে থাকে, তেমনই অপর কতকগুলি আবর্জ্জনা যকৃতের ভিতর দিয়া বাহির হইয়া পিত্ত নাম ধারণ করে। নিশ্বাস বন্ধ করিয়া দিলে যেমন আমরা শীঘ্রই মারা যাই, তেমনই যকৃতের ভিতর দিয়া যদি পিত্ত না বাহির হয়, অর্থাৎ যদি রক্তের মধ্যেই পিত্ত থাকিয়া যায়, তাহা হইলেও নানা রোগ হইয়া মৃত্যু হয়।

২। কিন্তু যেমন বুদ্ধিমান ও মিতব্যয়ী গৃহস্থ কাষ্ঠের জ্বালে রন্ধন করিয়া তাহার কয়লাগুলি ফেলিয়া দেয় না, অন্য উপকারে লাগায়, সেইরূপ মনুষ্য-শরীর যন্ত্রের পরিচালক এমনই নিয়ম করিয়াছেন যে, রক্ত পরিষ্কার করিয়া পিত্তরূপ যে আবর্জ্জনা বাহির হয়, তাহাও আবার শরীরের উপকারে লাগিবে। দেখা যায় যে, পিত্তের সঙ্গে তৈল, ঘৃত প্রভৃতি পদার্থ মিশাইলে ঐ তৈলাদি দ্রবীভূত হইয়া যায়। এই জন্যই শরীরের ভিতর এমন

উপায় করা হইয়াছে যে, যেখানে পিত্ত তৈয়ারি হইয়াছে সেই-খান হইতেই একটী নলের ভিতর দিয়া অন্ত্রনলীর ভিতর তাহাকে আনা হইতেছে। পিত্ত এখানে আসিয়া খাদ্য দ্রব্যের সঙ্গে উত্তমরূপে মিশ্রিত হইতেছে, এবং খাদ্যের মধ্যে যে সকল তৈল, ঘৃতাদি পদার্থ আছে, তাহাদের এমন দ্রব করিয়া দিতেছে যে, তাহারা সহজেই রক্তাধারে প্রবেশ করিয়া শরীরের পোষণ করিতেছে।

৩। ইহা দ্বারা খাদ্য দ্রব্যের দুর্গন্ধ নিবারণ হয়। পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, পিত্ত নিঃসরণ না হইলে অন্ত্রনলীর মধ্যে খাদ্যদ্রব্য শীঘ্র পচিয়া উঠে ও ভুক্ত দ্রব্যের অধিকাংশই আমাদের শরীরের উপকার না করিয়া অপকার করে।

৪। পিত্তদ্বারা মল নিঃসরণ কার্য্যের অনেক সাহায্য হয়। যদি পিত্তনিঃসরণ না হইত, তাহা হইলে আমাদিগের মলত্যাগ করিতে অতিশয় ক্লেশ হইত।

ক্ষুদ্র অন্ত্রনলীর ভিতর সর্ব্বত্রই অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, চুলের ন্যায় সূক্ষ্ম কতকগুলি উচ্চ পদার্থ দণ্ডায়মান আছে। ইহা-দের আকৃতি চুলের ন্যায় বলিয়া ইহাদিগকে 'কৈশিকাগুচ্ছ' কহা যায়। তৈল, ঘৃতাদি পদার্থ পিত্তদ্বারা দ্রব হইয়া গেলে পর, এই সকল কৈশিকাগুচ্ছ ঐ দ্রবীভূত তৈলাদি শোষণ করিয়া রক্তা-ধারের ভিতর লইয়া যায়।

[illegible] অন্ত্রনলীর ভিতর তৈল ঘৃতাদি ভিন্ন অন্য পদার্থও জীর্ণ [illegible] এই স্থানে শ্বেতসার হইতে চিনি উৎপন্ন হয়, এবং ঐ চিনি [illegible]ধারের ভিতর শোষিত হয়। মৎস্য, মাংসাদি ও তরল ভুক্ত পদার্থের যে অংশ পাকস্থলীতে জীর্ণ না হয়, তাহাও এখানকার

রক্তাধার দ্বারা জীর্ণ হয়। ক্ষুদ্র অন্ত্রনলী মধ্যে আর এক প্রকার রসের দ্বারা পরিপাক কার্য্যের সাহায্য হয়, উহার নাম ক্লোম রস অতএব ক্লোম নামক ঐ যন্ত্রের বিষয় একটু জানা আবশ্যক।

ক্লোম।

দ্বাদশাঙ্গুলীক অংশ বক্র হইয়া থাকাতে যে ঘের বা অর্দ্ধ-চন্দ্রাকার স্থান নির্মিত হইয়াছে ঐ স্থানে ক্লোম নামে একটী ক্ষুদ্র যন্ত্র আছে। দাড়ি বা বগলের নীচে যে সকল গ্রন্থি আছে তাহা আমরা টীপিলেই বুঝিতে পারি। উহা যেরূপ যন্ত্র, ক্লোম ও সেইরূপ, তবে উহাদের অপেক্ষা বড়। ইহা হইতে এক প্রকার রস নির্গত হয়, উহাকে ক্লোম রস বলে। ঐ রস পিত্তের ন্যায় একটী সরু নলের ভিতর দিয়া গমন করিয়া ক্ষুদ্র অন্ত্রনলীর মধ্যে পতিত হয়, এবং খাদ্য দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত হয়।

পূর্ব্বকালে পণ্ডিতগণ ক্লোমকে পিপাসা স্থান বলিতেন। এক্ষণে জানা গিয়াছে, যে তাহা নহে। (১) ক্লোমরস দ্বারা ভাত, সাগু, প্রভৃতি শ্বেতসার-প্রধান দ্রব্য অতি শীঘ্র জীর্ণ হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে লালার সহিত মিলিত হইলে শ্বেতসার শীঘ্র জীর্ণ হয়। বাস্তবিক লালা দ্বারা যেমন শ্বেতসার চিনির ন্যায় এক প্রকার পদার্থ হইয়া যায়, ক্লোমরসেও তাহাই হয়, সুতরাং অন্ন ভোজী জাতীর পক্ষে এই রস উপকারী। (২) ক্লোমরস দ্বারা তৈল ঘৃত পদার্থ প্রভৃতি ও সহজে জীর্ণ হয়। ঐ সকল পদার্থের সহিত ক্লোমরস মিলিত হইলে সাবানের ন্যায় এক প্রকার পদার্থ [illegible] হয়, উহা সহজেই রক্ত মধ্যে প্রবেশ করে। (৩) হাঁসের [illegible] ভিতর যে ঘন ও চট চটে জলবৎ পদার্থ থাকে উহাকে [illegible] কহে। অনেক উদ্ভিদ খাদ্যেও ঐ পদার্থ ন্যুনাধিক পরিমাণে

আছে। ঐরূপ পদার্থের সহিত ক্লোমরস মিশ্রিত হইলে ঐ সকল পদার্থ সহজেই জীর্ণ হইয়া যায়।

এইরূপে ক্ষীরবৎ অবস্থায় ভুক্তদ্রব্য সমস্ত ক্ষুদ্র অন্ত্রনলীর সকল ঘেরগুলি ঘুরিয়া যখন তাহার শেষ ভাগে উপস্থিত হয়, তখন ভুক্ত দ্রব্যের অধিকাংশই জীর্ণ হইয়া যায়। যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা পিত্তের সহিত মিশ্রিত থাকাতে পীতবর্ণবিশিষ্ট হয়। তখন তাহার অম্ল আস্বাদ আর পাওয়া যায় না। এইরূপ অবস্থায় অবশিষ্ট ভুক্ত পদার্থ একটী পর্দ্দা ঠেলিয়া বৃহৎ অন্ত্রনলীর ভিতর প্রবেশ করে।

৪র্থ। বৃহৎ অন্ত্রনলী মধ্যে খাদ্যদ্রব্যের অবস্থা।

এই নল ক্ষুদ্র অন্ত্রনলী অপেক্ষা অধিক মোটা, কিন্তু দৈর্ঘ্যে ছোট। ইহা প্রায় চারি হাত লম্বা। ৮৬ পৃষ্ঠায় চিত্র দেখিলে জানা যায় যে, এই চারি হাত লম্বা মোটা নলটী ক্ষুদ্র অন্ত্রনলীকে ঘেরিয়া রাখিবার জন্য উর্দ্ধগামী, সমতল ও নিম্নগামী এই তিন অংশে বিভক্ত হইয়াছে, এবং মলদ্বারে গিয়া শেষ হইয়াছে।

এই নলের ভিতর ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ হইবার বিশেষ নূতন উপায় নাই, সুতরাং ক্ষুদ্র অন্ত্রনলীর ভিতর ভুক্ত দ্রব্য যেরূপ নিয়মে জীর্ণ হইতেছিল, এখানে আসিয়াও সেইরূপ কার্য্য চলিতে থাকে। কিন্তু ক্ষুদ্র অন্ত্রনলীতে যেরূপ কৈশিকাগুচ্ছ আছে, এখানে তাহা না থাকাতে তৈল ঘৃতাদি এখানে অধিক জীর্ণ হইতে পায় না। খাদ্যের তরল এবং কঠিন অংশের মধ্যে যাহা কিছু পাকস্থলীও ক্ষুদ্র অন্ত্রনলীতে জীর্ণ হয় নাই, কেবল তাহাই এ স্থলে জীর্ণ হয়। অধিকন্তু এই নলের ভিতর হইতে এক প্রকার রস নিঃসৃত হয়। এখানে আসিয়া ভুক্ত দ্রব্যের অধিকাংশ জীর্ণ হইয়া গেলে পর

যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহার সহিত এই রস মিশ্রিত হইয়া তাহাকে একটী বিশেষ গন্ধযুক্ত করিয়া তুলে। আবার এই নলের ভিতর দিয়া ঐ গন্ধযুক্ত পদার্থ যতই সকল ঘেরগুলি ঘুরিয়া নীচে যাইতে থাকে, উহার তরল অংশ ততই জীর্ণ হইয়া রক্তমধ্যে প্রবেশ করে, সুতরাং যে অংশ মলদ্বারের নিকট আসিতে থাকে, তাহা ক্রমেই অধিক ঘন ও অবশেষে কঠিন হইয়া যায়। ইহাকেই মল বা বিষ্ঠা কহে। সাধারণ লোকে বিষ্ঠাকে অতিশয় ঘৃণার্হ পদার্থ বিবেচনা করে, কিন্তু যে সকল পণ্ডিত বিজ্ঞানের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহারা অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা ইহার সম্বন্ধে অনেক কথা নির্ণয় করিয়াছেন। তাঁহারা স্থির করিয়াছেন যে, মনুষ্য মলের সহস্র ভাগে ৭৩৩ ভাগ জল এবং অবশিষ্ট ২৬৭ ভাগের মধ্যে অন্ত্রনলীর দুর্গন্ধময় রস, আর লৌহ, চুণ, সোডা, ম্যাগনীসিয়া প্রভৃতি ধাতু এবং পিত্ত ও অন্ত্রনলীর শ্লেষ্মা আর খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে হাড়, শুষ্ক মটর প্রভৃতি কঠিন পদার্থ ও উদ্ভিদের হরিৎ অংশ বা খোসা ইত্যাদি পদার্থ আছে।

পাকস্থলী হইতে আরম্ভ করিয়া মলদ্বার দিয়া মলত্যাগ পর্য্যন্ত যে সময় লাগে, তাহা সকলের পক্ষে সমান নহে। সাধারণতঃ ভুক্তদ্রব্য পাকস্থলীতে দুই ঘণ্টা, ক্ষুদ্র অন্ত্রনলীতে দশ ঘণ্টা এবং বৃহৎ অন্ত্রনলীতে ১৫ হইতে ২০ বা ২২ ঘণ্টা অবস্থিতির পর মলত্যাগ হয়। সুস্থ শরীরে একবার আহারের পাঁচ ছয় ঘণ্টা পরে যে মলত্যাগ হয়, তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব আহারের ফল।

অপান বায়ু।

মনুষ্যের অন্ত্রনলীর মধ্যে সর্ব্বদাই প্রচুর পরিমাণে বায়ু সঞ্চিত থাকে, ইহাকে অপান বায়ু কহা যায়। ইহাদ্বারা অন্ত্রনলী স্ফীত

হইয়া না থাকিলে খাদ্যদ্রব্য এই নলের ভিতর দিয়া স্বচ্ছন্দে গমন করিতে পারে না। অন্ত্রনলীর মধ্যে নানাবিধ দুর্গন্ধময় বাষ্প উৎপন্ন হইয়া এই বায়ুর সহিত মিশ্রিত হয় এবং ক্রমে মলদ্বার দিয়া নির্গত হয়। এই সকল বায়ু কোথা হইতে কিরূপে আসে দেখা যাউক। প্রথমতঃ। আমরা খাদ্যদ্রব্য গলাধঃকরণ করিবার সময় তাহার সঙ্গে বাহিরের বাতাস কিয়ৎ পরিমাণে প্রবেশ করে। দ্বিতীয়তঃ। ভুক্তদ্রব্যগুলি অন্ত্রনলীর ভিতর অতি সুন্দর-রূপে জীর্ণ হয় সত্য বটে, তথাপি তাহার কিয়ৎপরিমাণ পচিয়া দুর্গন্ধময় বাষ্প উৎপন্ন করে। নরদামার পচা দুর্গন্ধ অথবা গৃহস্থ বাটীতে খাদ্য দ্রব্য পচার দুর্গন্ধ যেরূপ কারণে হয়, অন্ত্রনলী মধ্যেও সেইরূপে খাদ্য দ্রব্য কিয়ৎ পরিমাণে পচিয়া যাওয়াতে দুর্গন্ধময় বাষ্প উৎপন্ন হয়। তৃতীয়তঃ। নিশ্বাস লইবার সময় বাহিরের পরিষ্কার বাতাসে যদি কোন দূষিত বায়ু থাকে তাহা নাসিকা পথে রক্তে প্রবেশ করিয়া অন্ত্রনলীর ভিতর নির্গত হয়। অম্লজান, জলজান, যবক্ষারজান, আঙ্গারিকাম্ল, আর্দ্রভৌমিক বায়ু, এবং জলজনিত গন্ধক, প্রধানতঃ এই ছয়টী বাষ্পে অন্ত্রনলী পরিপূর্ণ থাকে।

সময়ে সময়ে সমস্ত অন্ত্রনলী দ্রুতবেগে সঙ্কুচিত ও বিস্তৃত হইয়া তাহার মধ্যস্থিত বায়ুকে আন্দোলিত করে। ইহা দ্বারা যে গড়্ গড়্ শব্দ উৎপন্ন হয়, তাহা আমরা সকলেই শুনিয়াছি। এইরূপ বায়ু যখন তীব্রবেগে মলদ্বারের পর্দ্দা ঠেলিয়া বাহির হয়, তখন এই বায়ুর আঘাতে ঐ পর্দ্দা কম্পিত হওয়াতে বাজনার ন্যায় এক প্রকার শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। অতিশয় আহার করিলে পাকস্থলী ও অন্ত্রনলী মধ্যে খাদ্য দ্রব্য জীর্ণ না হইয়া অতি শীঘ্র

পচিয়া উঠে এবং তাহাতে যে ভূরি প্রমাণ আঙ্গারিকাম্ল, আর্দ্র-ভৌমিক বায়ু ও জলজনিত গন্ধক প্রভৃতি দুর্গন্ধময় বাষ্প উৎপন্ন হয়, তাহা পাকস্থলীর উপরকার মুখ দিয়া উদ্গার রূপেও মলদ্বার দিয়া শীঘ্র শীঘ্র নির্গত হইয়া অন্ত্রনলীর অত্যধিক স্ফীততা নিবারণ করে।

নবম অধ্যায়।

শোষণ ও সমীকরণ।

যদি একটী কাচের গেলাসে কিয়ৎ পরিমাণে চিনির সরবৎ রাখিয়া ঐ গেলাসের মুখ একখানি অতি পাতলা চাম্‌ড়া দ্বারা আঁটিয়া দিই এবং তৎপরে গেলাসটী উলটাইয়া (উপুড় করিয়া) একটী জলপূর্ণ পাত্রের ভিতর ধরিয়া রাখি, তাহা হইলে চাম্‌ড়ার বাহিরে জল ও ভিতরে সরবৎ থাকিবে। সুতরাং এই দুই পদার্থ পরস্পর মিশিতে পাইবে না। কিন্তু জল ও সরবৎ এই দুইয়ের মধ্যে চামড়াখানি ব্যবধান থাকাতে একটী বড় কৌতুকাবহ ফল হইবে। চামড়াখানির কোথাও এক বিন্দু রন্ধ্র বা ছেঁদা নাই, অথচ বাহিরের জল প্রথমে চামড়াকে ভিজাইবে এবং কিয়ৎকাল পরে একটু একটু করিয়া চাম্‌ড়ার ভিতর দিকে প্রবেশ করিয়া সরবতের সহিত মিশিতে থাকিবে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানশাস্ত্রে এইরূপ ক্রিয়াকে অন্তর্ব্বাহ কহে। আবার গেলাসের ভিতর যে সরবত রহিয়াছে, তাহাও একটু একটু করিয়া চামড়ার ভিতর দিয়া বাহিরে আসিয়া পড়িবে ও জলের সহিত মিশিতে থাকিবে। ইহাকে বহির্ব্বাহ কহে। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত ও মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি মহোদয়গণের পদার্থবিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করিলে এই দুই ক্রিয়ার অনেক কথা জানিতে পারা যায়।

মনুষ্যশরীরেও সর্ব্বদা এইরূপ অন্তর্ব্বাহ ও বহির্ব্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছে। পাকস্থলী ও অন্ত্রনলীর মধ্যে ভুক্ত পদার্থ যখন তরল অবস্থায় পরিণত হয়, তখন ঐ তরল পদার্থ নিকটস্থ অসংখ্য

রক্ত শিরার গাত্রে সংলগ্ন হইতে থাকে। কিন্তু রক্তশিরাগুলি নলের মত, সেই নলের ভিতর দিয়া রক্ত চলিতেছে, অতএব তাহাদের বাহিরে ভুক্ত পদার্থ লাগিলে নলের অভ্যন্তরস্থ রক্তের সহিত কিরূপে মিশিবে? উপরে গেলাসের মুখে যে চামড়া দেওয়ার কথা হইল, মনে কর সেইরূপ চামড়ায় রক্তের নল প্রস্তুত হইয়াছে। গেলাসের ভিতর যেমন সরবত আছে, রক্তনলের ভিতর সেইরূপ রক্ত রহিয়াছে, গেলাসের চামড়ার বাহিরে যেমন জল আছে, রক্তশিরার বাহিরে তেমনি তরল ভুক্ত পদার্থ রহিয়াছে। জল যেমন অন্তর্ব্বাহ ক্রিয়া দ্বারা চামড়ার ভিতর দিয়া গেলাসের ভিতর গিয়া সরবতের সঙ্গে মিশিতেছে, সেইরূপ ভুক্ত পদার্থও অন্তর্ব্বাহ ক্রিয়া দ্বারা রক্তশিরার আবরণ ভেদ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া রক্তের সঙ্গে মিশিতেছে ও রক্তস্রোতের সহিত শরীরের সর্ব্বত্র গমন করিতেছে। পক্ষান্তরে রক্তশিরা হইতে সর্ব্বদাই এক প্রকার রস বহির্ব্বাহ ক্রিয়া দ্বারা বহির্গত হইতেছে। ঐ রস আর এক শ্রেণীর নল দ্বারা শোষিত হইয়া পুনরায় রক্তে প্রেরিত হইতেছে। ঐ নল গুলিকে লসীকা-শিরা কহে। এতদ্ব্যতীত যে কৈশিকাগুচ্ছের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহারা অন্ননলী হইতে তৈল, ঘৃতাদি শোষণ করিয়া থাকে।

সমুদায় ভুক্ত পদার্থ প্রাগুক্ত তিন শ্রেণীর শিরাদ্বারা অন্তর্ব্বাহ ক্রিয়া বশতঃ শোষিত হইয়া রক্তস্রোতে প্রক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু ভুক্ত পদার্থ যখন শোষিত হয়, তখন উহা আর খাদ্যের আকারে থাকে না, উহা হয় জলবৎ অবস্থায়, নতুবা দুগ্ধবৎ অবস্থায় রক্তস্রোতে নীত হয়। এই জলবৎ বা দুগ্ধবৎ পদার্থের নাম লসীকা। এই পদার্থে রক্তের কি শ্রীবৃদ্ধি হয়? ইহার গুণ রক্তের সঙ্গে কিরূপে

সমান হয়? ইহার উত্তর এই যে, এই দুগ্ধবৎ পদার্থকে রক্তে পরিণত বা সমীকৃত করিবার জন্য কতকগুলি কারখানা আছে। দাড়ির নিম্নে ও উহার উভয় প্রান্ত ভাগে টিপিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, অনেকগুলি গ্রন্থি আছে। ঐরূপ বাহুমূলে (বগলে) বন্ধন-গ্রন্থিতে (কুঁচ্‌কিতে) ও অন্যান্য অনেক স্থলে বহুসংখ্যক গ্রন্থি আছে, এ গুলি আমরা হাত দিয়া টিপিলেই বুঝিতে পারি। ইহা ছাড়া প্লীহা, যকৃৎ, গলগণ্ড প্রভৃতি কতকগুলি যন্ত্র আছে। এই সমুদায় গুলিই রক্ত প্রস্তত করিবার যন্ত্র। চিনির কারখানায় যেমন গুড় পরিষ্কার করিয়া চিনি প্রস্তত করা হয়, তেমনি শোষিত ভুক্ত পদার্থ যখন রক্তস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে এই সকল গ্রন্থির ভিতরদিয়া গমন করে, তখন ঐ পদার্থের দুগ্ধবৎ বা জলবৎ অবস্থা ঘুচিয়া গিয়া রক্তবৎ অবস্থা হয়। প্রথমে শ্বেত কণিকা পরে লোহিত কণিকা হইয়া উঠে, এবং তৎপরে সম্পূর্ণ লোহিত বর্ণের রক্ত হইয়া যায়। সুতরাং ঘণ্টা কয়েক পূর্ব্বে যাহা বৃক্ষের ফল বা জলের মৎস্য বা বনের পশু ছিল, তাহা প্রথমতঃ রন্ধন, দ্বিতীয়তঃ চর্ব্বণ, তৃতীয়তঃ পচন, চতুর্থতঃ শোষণ ও পঞ্চমতঃ সমীকরণ ক্রিয়া দ্বারা লোহিত বর্ণ রক্তের আকার ধারণ করে, এবং চারি দিকে ছুটিয়া শরীরের অভাব পূরণ করিতে থাকে। বহুরূপীর রূপান্তর ইহার তুলনায় সামান্য, আরব্য উপন্যাসের ঐন্দ্রজালিক গল্প সকল ইহার সঙ্গে তুলনায় আশ্চর্য্য কোথায়?

দশম অধ্যায়।

স্রবণ বা ক্ষরণ।

শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে নানা প্রকারের রস নিঃসৃত হয়, তন্মধ্যে আমরা কতকগুলি সর্ব্বদা দেখিতে পাই, অপর কয়েক স্থানের ক্ষরণ-কার্য্য শরীরের অভ্যন্তরে হয় বলিয়া দেখা যায় না। যত প্রকারের রস শরীর হইতে বাহির হয় তৎসমুদায়ই হয় ঝিল্লী নামক এক প্রকার চর্ম্ম দ্বারা নতুবা কতকগুলি গ্রন্থির ভিতর হইতে নিঃসৃত হয়। প্রথমে ঝিল্লী ও তৎপরে গ্রন্থির বর্ণনা করিব।

ঝিল্লী বা পাতলা চর্ম্ম।

মানব-শরীরের উপরে যেরূপ চর্ম্ম আছে মুখের ও নাসিকার ভিতরের চর্ম্ম যে তাহা অপেক্ষা পাতলা ও লালবর্ণ-বিশিষ্ট তাহা সকলেই দেখিতে পান। এই প্রকার চর্ম্মের নাম শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লী। আবার শরীরাভ্যন্তরস্থ হৃদয় ফুস্‌ফুস্ প্রভৃতি যন্ত্রের উপর আর এক্ প্রকার চর্ম্মের আবরণ আছে উহা হইতে জলবৎ রস নিঃসৃত হয় ঐ চর্ম্মকে স্রাবক ঝিল্লী কহে। এতদ্ব্যতীত হাঁটু, কনুই প্রভৃতির সন্ধিস্থলের ভিতর এক প্রকার আবরণ আছে, তাহা হইতে তৈলবৎ পদার্থ নির্গত হয়। ঐ আবরণের নাম স্নৈহিক-ঝিল্লী। একে একে এই তিনের বিশেষ বর্ণনা করিব।

১। শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লী।

যে পাতলা চর্ম্ম বা ঝিল্লী হইতে শ্লেষ্মার ন্যায় পদার্থ নির্গত হয় তাহাকে শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লী কহে। ইহা অতি কোমল এবং

বহুসংখ্যক কৈশিকা-নাড়ী ইহার নিম্নে থাকাতে দেখিতে উজ্জ্বল ও লোহিতবর্ণ-বিশিষ্ট। শরীরের তিনটী বৃহৎ পথে এই ঝিল্লীর আবরণ দেখা যায়। যথা :—

ক। শ্বাসযন্ত্রের পথ। নাসারন্ধ্রে এই ঝিল্লী আরম্ভ হইয়া পশ্চাৎভাগে দুইদিকে গিয়াছে। প্রথমতঃ চক্ষুর যে কোণ নাসিকার দিকে আছে, সেই কোণ হইতে "অশ্রুপথ" নামে একটী অতি সূক্ষ্ম নল নাসিকার ভিতর গিয়াছে। এই পথে নাসিকা হইতে শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লী চক্ষুর ভিতর গিয়া উপরের ও নীচের পাতার অভ্যন্তর ভাগ এবং চক্ষু গোলক আবৃত করিয়াছে। সুতরাং চক্ষু গোলকের উপর এবং চক্ষের পাতা টানিয়া দেখিলেই এই লোহিতাভ ঝিল্লী দেখা যায়. দিবারাত্রি এই ঝিল্লী হইতে অশ্রু নামে যে রস নির্গত হইতেছে অশ্রুপথ নামক সরুনলের ভিতর দিয়া তাহা গড়াইয়া নাসিকার ভিতর চলিয়া যাইতেছে। কিন্তু যদি কোন কারণে অত্যধিক অশ্রু নিঃসৃত হয় তাহা হইলে ঐ নলে যাইবার পথ সঙ্কুলান হয় না, তখন চক্ষের পাতার উপর দিয়া বাহিরে জল পড়ে। ইহাকেই অশ্রুপাত কহে। দ্বিতীয়তঃ নাসা পথের পশ্চাদ্দিকে গমন করিয়া এই ঝিল্লী গলনলীর উপরিভাগ পার হইয়া যাইবার সময় কর্ণে এক শাখা প্রেরণ করিয়া, কণ্ঠনালী ও বায়ুনলীর ভিতর গিয়া ফুসফুসদ্বয়ের ভিতর সর্ব্বত্র গমন করিয়াছে এমন কি ফুস্‌ফুসের প্রান্তস্থ কোষগুলিকেও এই ঝিল্লী আবৃত করিয়াছে।

খ। পরিপাক যন্ত্রের পথ। এই পথে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী ওষ্ঠের উপর আরম্ভ হইয়া ওষ্ঠের অভ্যন্তর ভাগ, মুখগহ্বর, জিহ্বা, তালু প্রভৃতি সম্পূর্ণ আবৃত করিয়া গলনলীর ভিতর দিয়া অন্ননালী,

পাকস্থলী এবং ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অন্ত্রনলীর সমস্ত ঘের গুলির ভিতর-ভাগ আবৃত করিয়া মলদ্বারে গিয়া শেষ হইয়াছে।

গ। জনন ও মূত্রযন্ত্রের পথ। এই পথে এই ঝিল্লী প্রথমে মূত্রপথের মুখে আরম্ভ হইয়া পশ্চাতে মূত্রাধার, মূত্রপিণ্ড ও তদভ্যন্তরস্থ ক্ষুদ্র নলগুলির ভিতর পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে।

২। স্রাবক ঝিল্লী।

একটী বালিশের ওয়াড় খুলিয়া লইয়া ঐ ওয়াড়ের খোলা মুখটী সেলাই করিয়া দিলে যেমন চতুর্দ্দিক বন্ধ করা একটী থলিয়া হয়, স্রাবক ঝিল্লীগুলিও তদ্রূপ এক একটী থলিয়া বা ব্যাগের ন্যায়। ঐরূপ চতুর্দ্দিক সেলাই করা ওয়াড়ের উপর যদি একটী ক্ষুদ্রতর বালিশ রাখিয়া ওয়াড় দ্বারা ঢাকিয়া দিই তাহা হইলে যেমন ঐ ক্ষুদ্র বালিশটীর চারিদিকেই ডবল বা দ্বিগুণিত ওয়াড় দ্বারা আবরণ করা হয়, সেইরূপ যে যন্ত্রগুলির উপর স্রাবক ঝিল্লী আছে তাহাও দ্বিগুণিত থলিয়ার আবরণ বিশিষ্ট। মস্তিষ্ক, হৃদয়, ফুস্‌ফুস্‌ ও অণ্ডকোষ এইরূপে আবৃত।

স্রাবক ঝিল্লীর যে অংশ আবৃত যন্ত্রের উপর অবস্থিত সেই অংশ হইতে অত্যল্প পরিমাণে রস নিঃসৃত হইয়া যন্ত্রটীকে এরূপ ভাবে কোমল ও মসৃণ রাখে যে, উহা অনায়াসেই ঐ থলিয়ার দ্বিগুণিত আবরণের ভিতর নড়িতে পারে। থলিয়ার অভ্যন্তর-ভাগ অতি মসৃণ এবং প্রয়োজনাধিক রস থাকে না বলিয়া উহার উভয় দিক এমন ওতপ্রোতভাবে পরস্পরের গাত্রে সংলগ্ন যে, দেখিলে উহাকে থলিয়া বলিয়া বোধ হয় না, বোধ হয় যেন কেবল মাত্র একখানি পাতলা চর্ম্ম রহিয়াছে। কিন্তু পীড়া বশতঃ এই থলিয়ার ভিতর এক এক সময় বহুপরিমাণে জলবৎ পদার্থ সঞ্চিত হয়।

৩। স্নৈহিক ঝিল্লী।

স্কন্ধ, কনুই, হাঁটু প্রভৃতি যত স্থানে সন্ধি আছে, যেখানে এক হাড় অন্য হাড়ের সহিত সংযুক্ত হইয়া ঘুরিতেছে সেই সকল সন্ধির ভিতরেই স্নৈহিক ঝিল্লী নামক আবরণ আছে। উহার গঠন ঠিক স্রাবক ঝিল্লীর ন্যায়, কেবল মাত্র বিভেদ এই যে, উহা হইতে যে রস ক্ষরণ হয় তাহা স্নেহ বা তৈলবৎ। দুয়ার জানালার কবাট যেমন কব্জার সহিত সংযুক্ত হইয়া ঘুরিতে থাকে, আমাদের শরীরের সন্ধি বা গাঁইট গুলিও সেইরূপ পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইয়া ঘুরিতে সমর্থ। কব্জায় যেমন তৈল দিলে দুয়ার জানালা ভালরূপ ঘুরিতে পারে আমাদের গাঁইটগুলিও সেইরূপ এক প্রকার তৈলবৎ পদার্থ দ্বারা আর্দ্র থাকে বলিয়াই ঘুরিতে সমর্থ হয়। স্নৈহিক ঝিল্লী হইতে এই পদার্থ নিঃসৃত হয়।

স্রাবক গ্রন্থি।

গের দেওয়া, বা গাঁইট দেওয়া, পৈতা গ্রন্থি দেওয়া প্রভৃতি কথা সকলেই জানেন। এ সকল স্থলে যেমন বহুসংখ্যক সূত্র একত্রিত হইয়া একটী কঠিন গ্রন্থি হয় মনুষ্য শরীরেও সেইরূপ গ্রন্থি আছে। এইরূপ বহুসংখ্যক সরু সরু নল একত্রিত হইয়া গের বাঁধিয়া স্তন হয়। অণ্ডকোষ নামক যন্ত্র বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নলের সমষ্টি মাত্র। মূত্রপিণ্ড নামক যন্ত্রও বহুসংখ্যক নল একত্রিত হইয়া হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থি বা গাঁইটে যে বহু সংখ্যক নল আছে তাহাদের এক মুখ খোলা অপর মুখ বন্ধ। বন্ধ দিক হইতে নিঃসৃত হইয়া খোলা মুখ দিয়া রস বাহির হইয়া যায়।

স্রুত রস।

একই প্রকার খাদ্য দ্বারা পুষ্ট হইয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানের গ্রন্থি সমূহ কেন ভিন্ন ভিন্ন প্রকার রস নিঃসরণ করে, কি গূঢ় উপায়ে যকৃৎ হইতে পিত্ত, লালাগ্রন্থি হইতে লালা, ও স্তন হইতে দুগ্ধ নিঃস্থত হয় তাহা আমরা বলিতে পারি না। কেবল মাত্র যে যে প্রক্রিয়া দ্বারা রস নিঃস্থত হয় তাহা দেখিয়াই আমরা বিস্মিত হই, কেবল মাত্র শরীরের এক স্থান হইতে রস উৎপন্ন হইয়া কিরূপে অন্য স্থানের উপকার সাধন করে তাহা দেখিয়াই সৃষ্টিকর্ত্তার বুদ্ধি কৌশল ভাবিয়া স্তব্ধ হই। লালা, দ্রাবক রস, পিত্ত ও ক্লোম রস দ্বারা পচন কার্য্যের সাহায্য হয় তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। অন্যদিকে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীগুলির শ্লেষ্মা নামক রস নিঃস্থত হইয়া আপন আপন পথ আর্দ্র রাখে। স্রাবক ঝিল্লীর মসৃণতা ও আদ্রভাব বশতঃ তদভ্যন্তবস্থ যন্ত্রগুলি প্রয়োজন হইলে অতি সহজে স্ব স্ব কার্য্যের উপযুক্ত রূপ নড়িতে পারে। স্নৈহিক ঝিল্লীর রসে হাঁটু কনুই প্রভৃতি গাঁইট গুলি অতি সহজে ঘুরিতে পারে। অতএব শরীরেব মঙ্গল সাধন করাই সকল প্রকার রসের উদ্দেশ্য।

স্রবণক্রিয়ার তারতম্য।

উত্তেজনা ও রক্তাধিক্য বশতঃ স্রবণ কার্য্য অধিক হয়। শিশু স্তন পান করিলে দুগ্ধ অধিক ক্ষরণ হয়, মুখে তেঁতুল বা অন্য খাদ্য রাখিলে অধিক লালা নিঃস্থত হয়, নাভিতে অঙ্গুলি দ্বারা উত্তেজিত করিলে প্রস্রাব করিতে ইচ্ছা হয়। স্নায়ু যন্ত্রের উত্তেজনা বা অবসন্ন অবস্থা বশতঃ ও স্রবণ কার্য্যের তারতম্য হয়; যথা ভয়ে মুখের অভ্যন্তর ভাগ শুষ্ক হইয়া যায়, দুশ্চিন্তা

বশতঃ ক্ষুধা লোপ হয়, এবং ঐরূপ অবস্থায় আহার করিলেও দ্রাবক রসের নিঃসরণ অভাবে খাদ্য জীর্ণ হয় না। দুঃখে ও আনন্দে চক্ষু দিয়া অধিক জল পড়ে। উদ্বেগ বশতঃ শীঘ্র শীঘ্র প্রস্রাব হয়, ক্রোধ ও দুঃখ বশতঃ স্তনদুগ্ধ বিকৃত হইয়া যায় এবং অধ্যয়নাদি উচ্চ চিন্তা কবিলে শুক্র নিঃসবণ কম হইয়া যায়।

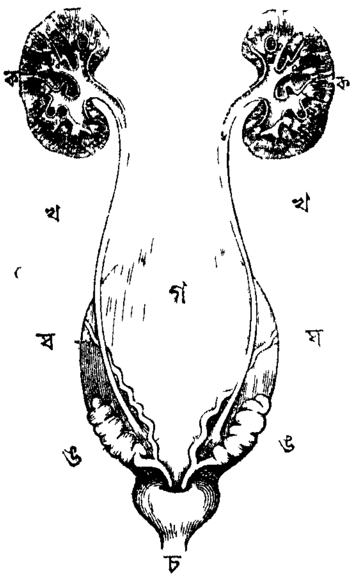
একাদশ অধ্যায়।

মূত্রযন্ত্র ও মূত্রক্ষরণ।

মনুষ্যাদি অনেক জীবকেই মূত্রত্যাগ করিতে দেখা যায়। কিন্তু ইহা কিরূপে উৎপন্ন এবং সঞ্চিত হয, কি উপায়েই বা পবিত্যক্ত হয়, ইহা দ্বাবা কি উপকাব সাধিত হয়, তাহা জানিতে হইলে প্রথমেই ইহাব উৎপত্তিব উপায জানা উচিত।

ছাঁকিয়া বাহিব কবিবাব কল।

ষষ্ঠ প্রতিকৃতি। মূত্রপিণ্ড, মূত্রবাহক নল ও মূত্রাশয়।



আমাদিগেব কটিদেশের অভ্যন্তবে, মেরুদণ্ডের দুই দিকে মূত্র-পিণ্ড নামক দুইটী যন্ত্র আছে। এই দুইটী যন্ত্রই মূত্র প্রস্তুত কবিবাব কল বা কাব-খানা। বব্বটী নামক কলাই অথবা '৫' এই অঙ্ক যেমন এক দিকে কুব্জ ও অপব দিকে ন্যুব্জ, এই যন্ত্র দ্বয় ও তদ্রূপ আকৃতি বিশিষ্ট। বহু-সংখ্যক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নল

* কক, মূত্র পিণ্ডদ্বয়। খখ, মূত্রবাহক নলদ্বয়। গ, মূত্রাশয়। মূত্রাশয়ের পশ্চাৎভাগে মূত্রবাহক নলদ্বয় বক্রভাবে প্রবিষ্ট হইয়াছে, সুতরাং প্রতিকৃতিতে

একত্রিত হইয়া এই যন্ত্র দ্বয় গঠিত হইয়াছে। প্রত্যেক যন্ত্রটী যে দিকে কুঞ্চিত হইয়া কুব্জ হইয়াছে, ঐ দিকে সকল নলের মুখ আসিয়া খুলিয়াছে, আর যে দিকে যন্ত্রটী বিস্তৃত ঐ দিকে সকল নলের মুখ বন্ধ ও কুঁজ নামক জলপাত্র যেমন যে দিক বন্ধ ঐ দিকে স্ফীত, নল গুলির ও বন্ধ দিক স্ফীত। নলের এই স্ফীত বা বন্ধ অংশকে ভেদ করিয়া বহু সংখ্যক কৈশিকা ধমনী ইহার ভিতর প্রবেশ করিয়া আছে। এই স্থানের কৈশিকা ধমনী গুলি কাপড়ের ন্যায় পাতলা, সুতরাং উহাদের ভিতর মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে যে রক্ত আসিতেছে তাহা হইতে জল পড়িয়া যাইতেছে। জলে ময়দা গুলিয়া পাতলা কাপড় দিয়া ছাঁকিলে যেমন জল নীচেয় পড়িয়া যাইতে থাকে এখানেও এই সকল কৈশিকা নাড়ীর ভিতর রক্ত আসিলে তেমনি তাহার অতিরিক্ত জল পড়িয়া যাইতেছে। রক্ত সঞ্চালন বশতঃ মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নূতন রক্ত এখান দিয়া চলিয়া যাইতেছে এবং এক মিনিট সময়ের মধ্যে শরীরের সমস্ত রক্ত একবার এখান দিয়া ঘুরিয়া যাইতেছে এ কথা মনে থাকিলেই বুঝা যাইবে যে, এই স্থানটীতে যেন সমস্ত শরীরের জল ছাঁকিবার জায়গা। রক্ত এখান দিয়া যেমন চলিয়া যাইতেছে অমনি নিজের অতিরিক্ত বা অপ্রয়োজনীয় জল এই ছাঁকনীর ভিতর দিয়া ফেলিয়া দিয়া যাইতেছে। জল যেখানে পড়িতেছে উহা কুঁজর ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট নলের মোটা দিক। এই স্থানে বিন্দু বিন্দু জল জমিয়া ক্রমে নলের খোলা

যন্ত্রগুলির পিছন দিক দেখা যাইতেছে। ঘঘ, অণ্ডকোষ হইতে আগত শুক্রবাহক নলদ্বয়। ঙ,ঙ, শুক্র সঞ্চয়ের ক্ষুদ্র আধার। চ, লিঙ্গস্থ মূত্রপথ এবং মূত্রাশয় এই উভয়ের মধ্যস্থিত গ্রন্থি।

মুখের দিকে যাইতেছে। এক একটী মূত্র পিণ্ডের ভিতর এইরূপ সহস্র সহস্র নল আছে, সেই সমুদায় নলের খোলা মুখ এক জায়গায় আসিয়া বড় মুখ হইয়াছে সুতরাং এই সহস্র সহস্র নলের ভিতর দিয়া যত জল আসিতেছে সকলই এক স্থানে আসিয়া মিলিত হইয়া একটী মোহানার ন্যায় স্থান দিয়া বাহির হইতেছে।

মোহানার মুখে একটা বড় নল বসান আছে, ঐ নল নীচে তল পেটের দিকে নামিয়া গিয়াছে, উহার নাম মূত্র বাহক নল। দুই দিকের মূত্র পিণ্ডেই এই নল আছে। উহা প্রায় এক হাত দীর্ঘ। যেমন জল আসিয়া ঢুকিতেছে অমনি এই দুইটী নলের ভিতর দিয়া নীচে তল পেটের দিকে যাইতেছে। এখানে গিয়া জল একেবারে শরীর হইতে বাহির হইয়া যায় না, চামড়ার একটী গোল থলিয়ার ভিতর জমা হইতে থাকে। প্রতি নিয়ত যতটুকু প্রস্রাব মূত্রপিণ্ড দ্বয় হইতে নীচের দিকে নামিয়া আসিতেছে তৎসমুদায়ই এই দুইটী নল দিয়া গিয়া সেই থলিয়াতে জমিতেছে।

ভাণ্ডার।

এই থলিয়ার নাম মূত্রাশয়। যদি এইরূপে জমা হইয়া থাকিবার জন্য এই ভাণ্ডার বা পাত্র না থাকিত, তাহা হইলে মানুষের কি অসুবিধাই হইত! সর্ব্বদাই দুই চারি ফোটা প্রস্রাব বাহির হইত, এবং উহাতে সকল মানুষই অতি জঘন্য রূপে অপরিস্কৃত হইত। এই অসুবিধা যাহাতে না হয় তজ্জন্যই মূত্রাশয় নির্ম্মিত হইয়াছে। দুই দিক হইতে দুইটী মূত্র বাহক নল আসিয়া ইহার পশ্চাৎ ভাগকে বক্র ভাবে ভেদ করিয়া মূত্রাশয়ে

প্রবিষ্ট হইয়াছে। উহাদের প্রবেশ দ্বারে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্দ্দা আছে, সুতরাং যখন এক ফোটা মূত্র নামিয়া আসিয়া মূত্রাশয়ের ভিতর প্রবেশ করিবার চেষ্টা করে, তখনই প্রবেশ দ্বারে অতিক্ষুদ্র বাক্সর ডালায় ন্যায় যে পর্দ্দা আছে তাহাকে ঠেলিয়া তুলিয়া ধরে। পর্দ্দাটুকু উঠিলেই মূত্র ফোটাটী তাহার নীচে দিয়া গড়াইয়া গিয়া মূত্রাশয়ে পতিত হয়, এবং পর্দ্দাটীও সুতরাং পড়িয়া যায়, তখন আর কোন ছিদ্র বা গর্ত্ত থাকে না।

মূত্রত্যাগ।

মূত্র এইরূপে জমিতে জমিতে যখন মূত্রাশয়কে পরিপূর্ণ করিয়া তুলে তখন ঐ স্ফীততা বশতঃ যে কষ্ট অনুভূত হয়, তাহাতেই প্রস্রাব ত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয়। যদি মূত্রাশয় সম্পূর্ণরূপ স্ফীত না হয় তথাপি অনেক সময়েই কিয়ৎ পরিমাণে মূত্র জমিলে তাহারই উত্তেজনা বশতঃ মূত্রত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয়। তখন নিশ্বাস বন্ধ করিয়া উদরের মাংসে চাপ দিলেই মূত্রাশয়ের উপরে ও চাপ পড়ে, এবং মূত্রাশয় কুঞ্চিত হইতে থাকে। কাযেই মূত্রাশয়ের নীচেকার খোলা মুখ দিয়া মূত্র পথে বেগে প্রস্রাব বাহির হইতে থাকে।

উপাদান ও পরিমাণ।

মূত্র কেবল জল নহে। রক্তের নানা প্রকার বিষাক্ত পদার্থ এই জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া বাহির হয়। এই জন্যই মূত্রের বর্ণ ঈষৎ পাটল ও আপেক্ষিক গুরুত্ব ১০২০। এই সকল দূষিত পদার্থ যদি কোন কারণে রক্ত হইতে বাহির না হয় তাহা হইলে রক্ত শীঘ্রই এত বিষাক্ত হইয়া উঠে যে, তাহাতেই মানুষ মারা যায়। বিসূচিকা নামক রোগে কোন কোন রোগীর আসল

পীড়া আরাম হইয়া কেবল মূত্র-পিণ্ডের পীড়া জন্মায়, সুতরাং প্রস্রাব হয় না, এবং তজ্জন্য এই সকল বিষাক্ত পদার্থ রক্তে থাকিয়া যায় তাহাতেই রোগী অজ্ঞান হইয়া অচিরাৎ মারা পড়ে। সাধারণতঃ এই বিপদ নিরাকরণের জন্য অতি সুন্দর উপায় আছে। মনুষ্য যতদিন জীবিত থাকে ততদিন এই সকল বিষময় পদার্থ নিয়তই মূত্রের সহিত বাহির হইয়া যায়। যদি কোন কারণে মূত্রের মাত্রা অল্প হয় তাহা হইলেও এই সকল বিষ যথা নিয়মে বাহির হয়, কিন্তু অল্প জলে অধিক বিষাক্ত পদার্থ গোলা থাকে বলিয়া প্রস্রাবের বর্ণ গাঢ় হয় ও মূত্র ত্যাগ কালে জ্বালা করে। জ্বর হইলে অনেকেই এই কষ্ট অনুভব করিয়াছেন, কিন্তু এই নিয়ম না থাকিলে অল্প প্রস্রাব হইলেই মানুষ মারা যাইত।

মূত্রের পরিমাণ, সকলের সকল সময়ে একরূপ হয় না। জল বা জল মিশ্রিত পদার্থ পান করিলে, আহার করিলে, শ্রমাদি কার্য্য করিলে বা দীর্ঘ নিশ্বাস লইলে মূত্রক্ষরণ অধিক হয়। উপবাস করিলে, ঘর্ম্ম হইলে, জ্বরাদি পীড়া বশতঃ শরীর অত্যন্ত উত্তপ্ত হইলে কম হয় বসিয়া বা দাঁড়াইয়া থাকিলে উভয় দিকের মূত্র বাহক নলদ্বয় ঝুলিতে থাকে ও টান প্রাপ্ত হয়, সুতরাং তাহাদের ভিতর দিয়া মূত্র শীঘ্র শীঘ্র আসিয়া মূত্রাশয়ে পড়ে, কিন্তু শয়ন করিয়া থাকিলে অত শীঘ্র পড়িতে পারে না, কেবল যখন মূত্রবাহক নল পরিপূর্ণ হইয়া যায় তখনই অল্প অল্প মূত্রাশয়ে প্রবেশ করিতে থাকে। এই কারণেই জাগ্রত অবস্থায় যত শীঘ্র শীঘ্র প্রস্রাব হয়, নিদ্রিত হইলে তাহা অপেক্ষা অধিক বিলম্বে মূত্রত্যাগের প্রয়োজন হয়।

সমস্ত দিবারাত্রিতে কত প্রস্রাব হয়? বয়স, স্বাস্থ্য ও জল-

পানের ইতর বিশেষ বশতঃ ইহার ন্যূনতা বা আধিক্য হয়। তথাপি ভূয়োদর্শন দ্বারা পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে সুস্থ-দেহী প্রৌঢ় ব্যক্তি দিবারাত্রিতে প্রায় ১ সের ১০ ছটাক পরিমাণ মূত্র ত্যাগ করে। শীতকালে এবং অন্যান্য সময়ে যখন ঘর্ম্ম অল্প হয় তখন অধিক প্রস্রাব হয়, এবং গ্রীষ্মকালে ঘর্ম্ম হইয়া বহুল পরিমাণে জল ও বিষাক্ত পদার্থ বাহির হইয়া যায় বলিয়া প্রস্রাবের মাত্রাও কম হয়।

দ্বাদশ অধ্যায়।

স্নায়ুযন্ত্র।

স্নায়ুসূত্র ও স্নায়ুকেন্দ্র।

কোন দূরস্থ বন্ধুর নিকট শীঘ্র সংবাদ পাঠাইতে হইলে, অধুনা যেমন তারের খবর দেওয়া হইয়া থাকে রাত্রিদিন আমাদিগের শরীরের চারিদিকে যে সকল ঘটনা ঘটিতেছে, শরীরের ভিতর-নিবাসী মনের নিকট সেই সকল সংবাদ পাঠাইবার জন্য সেই-রূপ এক শ্রেণীর যন্ত্র কার্য্য করিতেছে। স্নায়ুযন্ত্রই মনুষ্যশরীরের সংবাদবাহক।

মনুষ্যের মস্তকের খুলি কাটিয়া ফেলিলেই প্রায় দুই সের ওজনের একটী কোমল দ্রব্যের তাল দেখা যায়। ইহার উপর চারিদিকে উচ্চ নীচ স্থান আছে। এই দ্রব্যের নাম মস্তিষ্ক। মনুষ্যের জ্ঞান বুদ্ধি,, সুখ দুঃখ, ধর্ম্মাধর্ম্মের সহিত ইহার অতি নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। এই মস্তিষ্কের নীচে হইতে একটী অতি কোমল, সাধারণ লাউডাঁটার ন্যায় মোটা, শ্বেতবর্ণ স্নায়ু-পদার্থ পৃষ্ঠের শিরদাঁড়ার ভিতর দিয়া নামিয়া গিয়া বস্তিগহ্বরের পশ্চাদ্-ভাগে জন্ম হাড়ের ভিতর শেষ হইয়াছে। ইহাকে মেরুদণ্ডীয় বা কশেরুকা মজ্জা কহে।

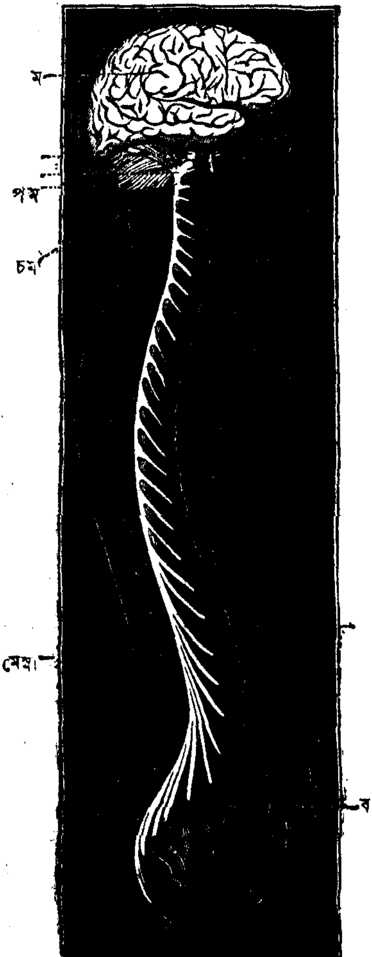
তোমার সম্মুখে এই পুস্তকখানি রহিয়াছে, ইহাতে কি লেখা আছে, তাহা পড়িবার জন্য কেবল চক্ষু ও মস্তিষ্কের আবশ্যক; কিন্তু এই পুস্তকখানি গাত্রে স্পর্শ করিলে কিরূপ বোধ হইবে,

তাহা জানিতে মেরুদণ্ডীয় মজ্জা ও মস্তিষ্ক উভয়েরই আবশ্যক। মেরুদণ্ডীয় মজ্জা বহির্জগৎ হইতে সংবাদ লইয়া মস্তিষ্কের নিকট দিলে পর, মস্তিষ্ক মনকে জানাইবে অমুক দ্রব্য কোমল কি কঠিন, সুখদায়ক কি দুঃখদায়ক ইত্যাদি। মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডীয় মজ্জাতে বহির্জগতের স্পর্শাদি ভাব গৃহীত হয়, এবং এই দুই স্থান হইতে অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির উপর কার্য্য করিবার হুকুম বাহির হয় বলিয়া এই উভয়কে স্নায়ুকেন্দ্র কহা যায়।

মেরুদণ্ডীয় স্নায়ু।

কিন্তু মেরুদণ্ডীয় মজ্জা পিঠের শিরদাঁড়ার ভিতর রহিয়াছে; তবে হাতে, পায়ে বা গাত্রে কোন দ্রব্য স্পর্শ করিলে মেরুদণ্ডীয় মজ্জা অত দূর হইতে কিরূপে জানিবে? ইহার উত্তর এই যে, মেরুদণ্ডীয় মজ্জার উভয় পার্শ্ব হইতে অনেকগুলি স্নায়ু বাহির হইয়াছে। উপর হইতে নীচে পর্য্যন্ত গণনা করিলে দেখা যায় যে, প্রত্যেক পার্শ্ব হইতে ৩১টী স্নায়ু বহির্গত হইয়াছে। তাহাদিগকে দেখিলে মেরুদণ্ডের শাখার ন্যায় বোধ হয়। ইহার প্রত্যেকটী ব্রাহ্মণের গলার তিন চারি দণ্ডি পৈতার ন্যায় মোটা, সেইরূপ শাদা এবং পৈতা যেমন নয় গাছি সূতা একত্রিত হইয়া হইয়াছে, এক একটী স্নায়ুও সেইরূপ বহুসংখ্যক অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সূতার ন্যায় স্নায়ু একত্রিত হইয়া হইয়াছে। মেরুদণ্ডীয় মজ্জার ডাইন দিক হইতে ৩১টী স্নায়ু বাহির হইয়া, শিরদাঁড়ার অস্থি ভেদ করিয়া, ডাইন দিকের হাত, পা, বুক, পিঠ প্রভৃতি সর্ব্বত্র গিয়াছে, এবং বাম দিক হইতেও সেইরূপ ৩১টী স্নায়ু বাহির হইয়া, সেইরূপ অস্থি ভেদ করিয়া বাম হাত, পা ইত্যাদিতে গিয়াছে। এই ৩১ জোড়া মেরুদণ্ডীয় স্নায়ু গলা হইতে পায়ের

সপ্তম প্রতিকৃতি। মস্তিষ্ক ও মেরু দণ্ডীয় মজ্জা।*



অঙ্গুলি পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র এত বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে যে, শরীরের যেখানেই কিছু স্পর্শ করিবে, তাহা ইহারা জানিতে পারিবে। এই সকল স্নায়ুর প্রত্যে কটী এত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়াছে যে, শরীরের চর্ম্মে বা চর্ম্মের নীচে বা অন্য কোন স্থানে এমন এক বিন্দু স্থান নাই, যেখানে ইহাদের শাখা প্রশাখা যায় নাই। সুতরাং হস্তের কনিষ্ঠ অঙ্গুলির মাথায় একটী সূচিকা ফুটাইলে বা পায়ের তলায় একটী কাঁকর বাধিলে, তাহাও এই সকল স্নায়ুর কোন না কোন একটী শাখার উপর

* করোটি বা মস্তকের খুলি কাটিয়া ফেলাতে মস্তিষ্ক বাহির হইয়া পড়ি-

আঘাত করিবে, এবংঅমনি আমরা জানিতে পারিব যে, হাতের আঙ্গুলে স্চ ফুটিয়াছে বা পায়ের তলায় জুতার ভিতর কাঁকর আছে।

একত্রিশ জোড়া মেরুদণ্ডীয় স্নায়ু ব্যতীত আর কতকগুলি স্নায়ু আছে, তাহারা মস্তিষ্ক হইতে বহিষ্কৃত হইয়া চক্ষে, নাসিকায়, কর্ণে ও জিহ্বা প্রভৃতি স্থানে গিয়া আমাদিগকে দর্শন, শ্রবণ প্রভৃতি কার্য্য করিবার ক্ষমতা দিতেছে। ইহারা মস্তিষ্ক হইতে বহির্গত হইয়া ঐ সকল স্থানে গিয়াছে। যথাস্থানে তাহাদিগের বর্ণনা করা যাইবে।

এতক্ষণে বুঝা গেল যে, মস্তিষ্ক, মেরুদণ্ডীয় মজ্জা ও স্নায়ুস্ত্র, এইগুলির সমষ্টিকে স্নায়ুযন্ত্র কহে। স্নায়ুযন্ত্রের ভিতর আর যে এক প্রকার স্নায়ুস্ত্র ও কেন্দ্র আছে, তাহাদের কথা যথাস্থানে বলিব। এক্ষণে ইহা বলিলেই চলিবে যে, এই সমস্তগুলি দ্বারাই আমরা কোথায় আছি, কি করিতেছি, তাহা জানিতে পারি, এগুলির জন্যই সুখ দুঃখ ভোগ এবং হিতাহিত বিবেচনা করিয়া থাকি। ইহাদের অভাব থাকিলে মনুষ্যগণ জীবিত থাকিয়াও উদ্ভিদ্‌গণের ন্যায় অর্দ্ধ-চেতন অবস্থায় থাকিত।

স্নায়ুস্ত্রের কার্য্য।

মেরুদণ্ডীয় স্নায়ুগুলি মোটা পৈতার ন্যায় বাহির হইয়া স্তার ন্যায় শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া শরীরের সর্ব্বত্র গিয়া কি কি কার্য্য করিতেছে দেখা যাউক :—

রাছে। ম, সম্মুখ বা বৃহৎ মস্তিষ্ক, ইহার উপর বহুসংখ্যক উচ্চ নীচ স্থান দেখা যাইতেছে প,ম, পশ্চাৎ বা ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক. চ,ম, চতুষ্কোণ মজ্জা। পৃষ্ঠের কশেরুকা বা হাড়গুলি কাটিয়া ফেলাতে ৩১ জোড়া স্নায়ু মজ্জা হইতে আরম্ভ হইয়াছে তাহা দেখা যাইতেছে। মেস্না, মেরুদণ্ডীয় স্নায়ু ব, বস্তি গহ্বরের স্নায়ুমণ্ডলী।

প্রথমতঃ। একখানি লৌহনির্ম্মিত হাতার এক দিক অগ্নিতে ডুবাইলে যেমন তাহার ভিতর দিয়া তাপ প্রবেশ করিয়া ক্রমে অন্ত দিকটীকেও উত্তপ্ত করিয়া তুলে, স্পর্শবোধক ভাবও ঠিক সেইরূপে স্নায়ুর ভিতর দিয়া যায়। মনে কর, আমি একটী পোকা হাতে করিয়া লইলাম, উহার নড়াচড়াতে আমার হাত সড়্সড়্ করিতে লাগিল, অথবা অগ্নি হাতে লইলাম, তাহাতে হাত জ্বালা করিতে লাগিল। এখানে সড়্সড়্ করা বা জ্বালা করা বুঝিলাম কিরূপে ? ইহার উত্তর এই যে, পোকার নড়াচড়া বা অগ্নির উত্তাপে হাতের অভ্যন্তরস্থ কতকগুলি স্নায়ু উত্তেজিত হইয়া উঠিল, সেই উত্তেজনা স্নায়ুসূত্রের ভিতর দিয়া বড় বড় স্নায়ুতে গেল এবং তথা হইতে মেরুদণ্ডীয় মজ্জায় ও পরিশেষে সেখান হইতে মস্তিষ্কে গমন করিল। তখন জানিতে পারিলাম যে, হাতে অমুক দ্রব্য (পোকা বা অগ্নি), রহিয়াছে এবং তাহাতেই হাত সড়্সড়্ করিতেছে বা জ্বালা করিতেছে। যে সকল স্নায়ুসূত্রের ভিতর দিয়া এই উত্তেজনা গমন করে, সেই সকল স্নায়ু বহির্জগৎ হইতে মস্তিষ্করূপ স্নায়ুকেন্দ্রে স্পর্শবোধক ভাব লইয়া যায় বলিয়া তাহাদিগকে "কেন্দ্রাভিমুখ" স্নায়ু কহা যায়; কারণ, তাহারা যে ভাব বা অবস্থান্তর উৎপন্ন করে, তাহা বাহির হইতে ভিতরের দিকে মেরুদণ্ডীয় মজ্জা ও মস্তিষ্ক এই দুই বৃহৎ স্নায়ু-কেন্দ্রের নিকট গমন করে। ইহাদিগের দ্বারা স্পর্শবোধ জন্মায় বলিয়া ইহাদিগকে "স্পর্শবোধক" স্নায়ুও কহে।

দ্বিতীয়তঃ। ইহাদেরই মধ্যে অন্ত কতকগুলি স্নায়ুসূত্র ইহার ঠিক বিপরীত কায করে। প্রথমোক্তগুলি যেমন বাহির হইতে ভিতরের দিকে স্পর্শ বা অনুভববোধক ভাব লইয়া যায়,

এই দ্বিতীয় শ্রেণীগুলি তাহা না করিয়া ভিতর হইতে বাহিরের দিকে মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডীয় মজ্জার আজ্ঞা লইয়া আইসে। প্রথমগুলিকে কেন্দ্রাভিমুখ বলিলে, ইহাদিগকে "কেন্দ্রবিমুখ" স্নায়ু নাম দেওয়া উচিত। মস্তিষ্ক ও মেরুমজ্জার আজ্ঞাক্রমে এই সকল কেন্দ্রবিমুখ স্নায়ু দিবারাত্রি আমাদিগের শরীরের একটী না একটী অঙ্গ বা অঙ্গের ক্ষুদ্র অংশ নড়াইয়া দিতেছে। মন বলিল "পুস্তকখানি হাত হইতে ফেলিয়া দাও"; তখনি মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডীয় মজ্জার ভিতর দিয়া সেই আজ্ঞা হাতের কেন্দ্রবিমুখ স্নায়ুতে গেল, তাহারা হাত নড়াইয়া পুস্তক ফেলিয়া দিল। কেন্দ্রবিমুখ স্নায়ু গুলি শরীর নড়াইয়া দেয় বলিয়া তাহাদিগকে বেগোৎপাদক স্নায়ুও বলা যায়। এতদ্ব্যতীত আর দুই এক শ্রেণীর স্নায়ু আছে তাহাদের কথা পরে বলা যাইবে।

মেরুদণ্ডীয় মজ্জার কার্য্য।

মেরুদণ্ডীয় মজ্জা দ্বারা দুইটী কার্য্য সাধিত হয়। প্রথমতঃ, স্নায়ুসূত্রের ন্যায় ইহা দ্বারাও বাহির হইতে ভিতরে স্পর্শবোধক ভাবের বহন ও ভিতর হইতে বাহিরে বেগোৎপাদিকা শক্তির প্রেরণ বা সঞ্চালন হয়। ইহাকে স্পর্শ সঞ্চালন কহা যায়। দ্বিতীয়তঃ, ইহা দ্বারা স্পর্শবোধক ভাব প্রতিফলিত হয়। ইহাকে স্পর্শ প্রতিফলন বলে।

প্রথমতঃ, স্পর্শসঞ্চালন।

উপরে দেখাইয়াছি যে, স্নায়ুসূত্রের ভিতর দিয়া স্পর্শবোধক ভাব মস্তিষ্কে গমন করিতে হইলে মেরুদণ্ডীয় মজ্জার ভিতর দিয়া যায়। পায়ের তলায় একটী কাঁকর ফুটিলে বা গাত্রে বা হাতে

কোন দ্রব্য স্পর্শ করিলে, সেই উত্তেজনা পায়ের বা হাতের স্নায়ু বহিয়া মেরুদণ্ডীয় মজ্জার ভিতর গমন করে। মেরুদণ্ডীয় মজ্জা সেই উত্তেজনাকে মস্তিষ্কের নিকট পাঠাইয়া দেয়; তখন মন জানিতে পারে যে, অমুক দ্রব্য শরীর স্পর্শ করিয়াছে। অতএব এই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, আমরা যাহা কিছু স্পর্শ করি, তাহা মনকে জানাইতে যাইবার মেরুদণ্ডীয় মজ্জা ভিন্ন আর অন্য পথ নাই।

পক্ষান্তরে, মন যদি নিজে কোন হুকুম বাহিরে পাঠাইতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলেও এই ভিন্ন আর পথ নাই। হরির মন বলিল "অন্ধকে একটা পয়সা দেও"। তখন মনের সেই হুকুম মস্তিষ্কের ভিতর দিয়া মেরুদণ্ডীয় মজ্জায় আসিল এবং মজ্জা হইতে যে সকল স্নায়ুসূত্র শাখা প্রশাখার ন্যায় বাহির হইয়া হাতের ভিতর গিয়াছে, তাহাদের ভিতর দিয়া ছুটিয়া গিয়া হাতকে এমন ভাবে চালাইয়া দিল যে, হাত প্রথমে পকেটের ভিতর ঢুকিয়া একটী পয়সা লইয়া আসিল, তৎপরে অন্ধের হাতের উপর গিয়া যাহাতে পয়সা পড়িয়া যায় তাহা করিল। বাহির হইতে স্পর্শবোধক ভাব সকল মেরুমজ্জার ভিতর দিয়া মস্তিষ্কে যাওয়াকে মেরুমজ্জার "কেন্দ্রাভিমুখ কার্য্য" কহা যায় এবং ভিতর হইতে মনের আজ্ঞা প্রভৃতি ইহার মধ্য দিয়া বাহিরে আসাকে ইহার "কেন্দ্রবিমুখ কার্য্য" বলা যায়।

যদি বল, মেরুদণ্ডীয় মজ্জার ভিতর দিয়া এই সকল ভাব যাওয়া আসার প্রমাণ কি? তাহা হইলে কাহারও সহিত কেহ মারামারি করিতে গিয়া যখন একজন অপরের পৃষ্ঠের শিরদাঁড়ায় জোরে লাঠি মারে, তখন কি হয় দেখ। যদি এইরূপ বা অন্য

কোন প্রকার আঘাত পাইয়া মেরুমজ্জার এক অংশ নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে বড় রাস্তায় গাড়ি লইয়া ছুটিতে ছুটিতে হঠাৎ গভীর নর্দ্দামা সম্মুখে দেখিলে যেমন আর ঘোড়া দৌড়িতে পারে না, সেইরূপ স্পর্শবোধক ভাব খানিক দূর গিয়া যেখানে মেরুমজ্জা নষ্ট হইয়াছে, তাহার পর আর যাইতে পারে না। সুতরাং যদি কটিদেশের কাছে মেরুদণ্ডীয় মজ্জার কিয়দংশ নষ্ট হয়, তাহা হইলে ইহার নীচে যত অংশ আছে, অর্থাৎ উরু, পা পায়ের অঙ্গুলি প্রভৃতি এত অসাড় হইয়া যাইবে যে, তাহাতে আগুন লাগাইলে বা কাটিয়া ফেলিলেও বুঝা যাইবে না; অথচ যে অংশগুলি ভাল আছে, তাহাদের কার্য্য পূর্ব্ববৎ চলিবে। সুতরাং এরূপ অবস্থাপন্ন ব্যক্তিও হাত নাড়িতে পারিবে এবং পৃষ্ঠে কেহ কিল মারিলে তাহা বুঝিতে পারিয়া শত্রুকে দুই এক ঘা দিতেও পারিবে। কিন্তু যদি একটী তিন মন বস্তা ঘাড়ে পড়িয়া স্কন্ধদেশের অব্যবহিত নীচে মেরুদণ্ডীয় মজ্জার যে অংশ আছে, তাহাকে নষ্ট করিয়া দেয়, তাহা হইলে না পারা যায় হাঁটিয়া বেড়াইতে, না পারা যায় হাতে করিয়া তুলিয়া খাইতে। তখন হাত, পা সকলই বৃথা হইয়া যায়। তখন যদি জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে দেখিয়া শুনিয়া যাহা কিছু বুঝিতে পারা যায়।

এখন মেরুদণ্ডীয় মজ্জার দ্বিতীয় কার্য্য দেখা যাউক :—

দ্বিতীয়তঃ, স্পর্শ প্রতিফলন।

ঘরের ভিতর সূর্য্যের কিরণ আসিয়া দর্পণে পড়িলে দর্পণ হইতে যে একটী দ্বিতীয় আলোক দেওয়ালের উপর গিয়া নাচিতে থাকে, তাহাকে প্রতিফলিত আলোক কহে। এইরূপে

আলোক, তাপ, শব্দ প্রভৃতি * যে কোন প্রাকৃতিক বল এক সরল রেখায় যাইতে যাইতে বাধা পাইয়া ফিরিয়া অন্য সরল রেখায় চলিয়া যায়, তাহাকেই "প্রতিফলিত বল" কহা যায় এবং এইরূপ উপায় দ্বারা যে ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাহাকে "প্রতিফলিত ক্রিয়া" এবং ঐ কার্য্যকে প্রতিফলন বলে।

এই হিসাবে মেরুদণ্ডীয় মজ্জাও ঠিক দর্পণের ন্যায়। বহির্জগৎ হইতে কতকগুলি স্নায়ুসূত্র দ্বারা যে স্পর্শবোধক ভাব মেরুমজ্জাতে আইসে, তাহা যদি বরাবর মস্তিষ্কে চলিয়া না গিয়া অন্য স্নায়ুসূত্র দ্বারা বাহির হইয়া যায়, তাহা হইলে ঐ ভাবটী বাহির হইয়া যাইবার সময় একটী বিশেষ কার্য্য করিয়া যায়। ইহাই মেরু-মজ্জার প্রতিফলিত কার্য্য।

দৃষ্টান্ত। খাদ্য দ্রব্য গিলিবার দ্বিতীয় প্রক্রিয়ায় খাদ্যের স্পর্শ-বোধক ভাব মেরুদণ্ডীয় মজ্জায় গমন করে, সেখান হইতে মস্তিষ্কে এই স্পর্শবোধক ভাব গমন না করিয়া অন্য স্নায়ু দ্বারা গলনলীর উপরকার মাংসের উপর প্রতিফলিত হয়; তখন ভক্ষকের ইচ্ছা না থাকিলেও খাদ্যকে নীচে নামাইয়া দেয়। দেখ, এই কার্য্যের

* শব্দ যখন এক দিক্ হইতে যাইতে যাইতে বাধা পায়, তখন প্রতিফলিত হইয়া, যে দিক্ হইতে আসিয়াছিল, প্রায় সেই দিকেই ফিরে, ইহাকে 'প্রতিধ্বনি' কহে। কাচ, প্রস্তর প্রভৃতির উপর হইতে তাপ কিরূপ তীব্রভাবে প্রতিফলিত হয়, তাহা অনেকেই দেখিয়াছেন। দিনের বেলায় ঘরের দ্বার খুলিয়া রাখিলে যদি রৌদ্র কিছুই প্রবেশ না করে, তথাপি যে আলোক পাওয়া যায়, তাহাতে ছোট বড় সকল জিনিসই দেখা যায়। সূর্য্যের আলোক পৃথিবীতে পড়িয়া প্রতিফলিত হইয়া আমাদের ঘরের ভিতর প্রবেশ করাতেই এই আলোক উৎপন্ন হয়। যদি সূর্য্যরশ্মি পৃথিবী হইতে এইরূপে প্রতিফলিত না হইত, তাহা হইলে যাহার ঘরে রৌদ্র না ঢুকিত, সে দিনের বেলায় দুয়ার জানালা খুলিয়াও অন্ধকারে থাকিত।

সহিত মস্তিষ্কের কোন সম্বন্ধ নাই। পাঁঠা বা ভেড়ার গলা কাটিয়া ফেলিলে মুণ্ডের ভিতর মস্তিষ্ক থাকিয়া যায় এবং পিঠের শির-দাঁড়ার ভিতর মেরুদণ্ডীয় মজ্জা থাকে, তথাপি আমরা দেখিতে পাই যে, পাঁঠা কাটার পর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ মৃত দেহ ধড়্ ফড়্ করিয়া নড়িতে থাকে। এখানে পাঁঠার দেহ ইচ্ছা করিয়া নড়িতেছে না, যন্ত্রণার জন্য ছট্‌ফট্ করিতেছে না; কেন না সে সকল করা মস্তিষ্কের কাজ। এস্থলে কেবল মাত্র অস্ত্রাঘাতের তীব্র উত্তেজনা কাটা গলার ভিতর দিয়া মেরুদণ্ডে যাইয়া এবং তথা হইতে সর্ব্বাঙ্গের স্নায়ুসূত্রে প্রতিফলিত হইয়া হস্তপদাদির কম্পন উপস্থিত করিতেছে।

জীব যতনিম্ন শ্রেণীস্থ এই ক্রিয়া তত অধিক।

একটী অতি আশ্চর্য্য কথা এই যে, মনুষ্য অপেক্ষা যতই নিম্নতর শ্রেণীর জন্তু দেখিবে, মেরুমজ্জার প্রতিফলন কার্য্যও ততই সুন্দররূপ দেখা যাইবে। মানুষ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব বটে, কিন্তু ইহার মেরুমজ্জার প্রতিফলন কার্য্য এত অল্পক্ষণ স্থায়ী যে, মানুষের গলা কাটিয়া ফেলিলে শরীরটা অতি অল্পক্ষণই নড়ে। মানুষ অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইলেও পাঁঠা একটা বড় জন্তু; অতএব ইহার মেরুমজ্জার প্রতিফলন ক্ষমতা মানুষের অপেক্ষা বেশী হইলেও বড় অধিক নহে; সুতরাং গলা কাটিয়া ফেলিলে পাঁঠার শরীর অধিক ক্ষণ ধড়্‌ফড়্ করে না। কিন্তু বিহঙ্গ শ্রেণীতে পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কুক্কুট, পারাবত ও হরিয়াল পক্ষীর গলা কাটিয়া ফেলিলে তাহারা পাঁঠা অপেক্ষা অধিকক্ষণ লুটাইতে থাকে। আর একটু নামিয়া সরীসৃপ শ্রেণীতে পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে সর্পের অর্দ্ধাঙ্গ ছেদন করিলে, লেজের দিকে খণ্ড

দূর মেরুমজ্জা গিয়াছে, সেই সমুদায় কাটা অংশ প্রতিফলিত ক্রিয়া বশতঃ বহুক্ষণ নড়িতে থাকে। মস্তিষ্কের সঙ্গে কোন সংযোগ নাই, ইচ্ছার সঙ্গে বিন্দুমাত্র সংস্রব নাই, তথাপি বহুক্ষণ নড়িতে থাকে। সকলেই দেখিয়াছেন, যে টিক্‌টিকির মধ্যস্থল কাটিয়া দিলে লেজের দিকের কাটা অংশ বহুক্ষণ ছট্‌ফট্‌ করিয়া নড়িতে থাকে। আবার এই কাটা অংশকে যদি পুনরায় টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটা যায়, তাহা হইলে যতগুলি টুক্‌রার মধ্যে মেরুদণ্ডীয় মজ্জা আছে, সে সমস্তগুলিই নড়িতে থাকিবে। কাটা অংশের সহিত সংযুক্ত পা একখানি স্পর্শ করিলেও সমস্ত টুক্‌রাটী সেই উত্তেজনার প্রতিফলন বশতঃ নড়িতে থাকিবে। কিন্তু যেখানে মেরুমজ্জার কোন সম্পর্ক নাই, সে অংশ নড়িবে না। সুতরাং যদি একখানি পা লেজ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া কাটিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে সেখানি আর নড়িবে না। কারণ, লেজের ভিতর মজ্জা রহিয়াছে, তাহার সহিত সংযুক্ত ছিল বলিয়াই পাখানি নড়িতেছিল, এখন সে সম্বন্ধ ঘুচিয়া গেল, মৃত পা আর নড়িবে কেন?

সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, যে সকল জন্তুর মেরুদণ্ডীয় মজ্জা আছে, তাহাদের মধ্যে যতই উচ্চ শ্রেণীতে পরীক্ষা করা যাইবে, ততই মেরুমজ্জার প্রতিফলন ক্রিয়া কম দেখা যাইবে, আর যতই নিম্নতর শ্রেণী পরীক্ষা করা যাইবে, ততই ঐ ক্রিয়া অধিক দেখিতে পাওয়া যাইবে।

মনুষ্যের মস্তিষ্ক ও অন্যজীবের মেরুমজ্জা।

আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মানুষ ভাবিয়া চিন্তিয়া যত কার্য্য করে, নিম্নশ্রেণীর উপরোক্তরূপ প্রাণিগণ কেবল মাত্র মেরুমজ্জার প্রতিফলিত ক্রিয়া দ্বারা তাহার অনেকগুলি কার্য্য করিতে

পারে। আমরা শত্রুকে বাধা দিতে হইলে মস্তিষ্ক ও মন দ্বারা চিন্তা করি "বাধা দিব" তাহার পর বাধা দিই; যদি মাথা কাটা যায়, তবে আর শত্রুর কিছুই করিতে পারি না, তৎক্ষণাৎ মরিয়া যাই। কিন্তু যদি একটী ভেকের মাথা কাটা যায়, এবং কাটার পর তাহার পেটে সুড়সুড়ি দিই, তাহা হইলে ঐ ভেক দেহের পাগুলি এমনভাবে নড়িতে থাকিবে, যেন আমার উপর বিরক্ত হইয়া আমাকে তাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে। ইহা কেবল মেরু-মজ্জার প্রতিফলন দ্বারা সম্পন্ন হয়। কিন্তু মানুষের এই কার্য্য করিতে হইলে মস্তিষ্কের প্রয়োজন হইত, অর্থাৎ চিন্তা করিতে হইত। এই সকল দেখিয়া পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, মনুষ্য-গণের যেমন অধিকাংশ কার্য্য করিবার পূর্ব্বেই চিন্তা বা ইচ্ছা করিতে হয়, এ সকল জীবের তাহা করিতে হয় না; ইহাদের অনেক কার্য্য কেবল মেরুমজ্জার সাহায্যে সম্পন্ন হয়। ইহাদিগের ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক ব্যবহার করিয়া সকল কার্য্য করা অসম্ভব ইহা জানি-য়াই কি ইহাদিগের সৃজনকর্ত্তা মেরুমজ্জার হস্তে অনেক কার্য্যের ভার দিয়াছেন? কিন্তু যতই উচ্চ শ্রেণীর জীব দেখিবে, ততই মস্তিষ্কের প্রাধান্য ও মেরুমজ্জার প্রতিফলিত ক্রিয়ার হ্রাস দেখা যাইবে।

মনুষ্যদেহে এই ক্রিয়ার দৃষ্টান্ত।

অতএব ইহা স্থির যে ভেক সরীসৃপাদি জীবগণের মেরুমজ্জার প্রতিফলিত কার্য্য মনুষ্যের অপেক্ষা অনেক অধিক। তথাপি মনু-ষ্যের মেরুমজ্জার কার্য্যও কম আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আমরা সর্ব্বদা সজাগ থাকিয়া সকল কার্য্যেই মস্তিষ্ক খাটাই বলিয়া মেরু-মজ্জার কার্য্য দেখিতে পাই না। কিন্তু যখন মস্তিষ্ক অলস, অকর্ম্মণ্য,

নিশ্চেষ্ট, অথবা কোন উচ্চতর কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে, তখন যেমন রাজার অনুপস্থিতিকালে মন্ত্রী তাঁহার কার্য্য করেন ও রাজ্যরক্ষার নিমিত্ত ব্যস্ত হয়েন, সেইরূপ মেরুদণ্ডীয় মজ্জা আসিয়া শরীরের মঙ্গল বিধানের চেষ্টা করে। এই কারণেই মানুষ যখন কোন গভীর চিন্তায় নিযুক্ত থাকে, তখন দ্বারের কাছে কেহ আসিয়া ডাকিলে বা হঠাৎ কেহ অঙ্গ স্পর্শ করিলে চমকিয়া উঠে। এ স্থলে মস্তিষ্ক অন্য কার্য্যে নিযুক্ত থাকাতে সেই শব্দ বা স্পর্শ গ্রহণ করিয়া মনকে জাগাইতে পারিল না, উহা কেবল মাত্র মেরুমজ্জার প্রতিফলিত কার্য্য উৎপন্ন করিয়া শরীরকে কাঁপাইয়া দিল। নিদ্রিত শিশুর করতলে সুড়সুড়ি দিলে, শিশুর হাত আপনা আপনিই তোমাকে ধরিবার চেষ্টা করিবে। সম্ভবতঃ নিদ্রিত শিশুর মুখভঙ্গী, হাস্য, স্তনপানের ন্যায় মুখ নাড়া প্রভৃতি যে সকল কার্য্যকে এতদ্দেশীয় রমণীগণ "মা ষষ্ঠীর খেলা" বলিয়া বর্ণন করেন, তৎসমুদায়ই এই শ্রেণীভুক্ত; কারণ, শিশুর যে সামান্য মস্তিষ্ক আছে, তাহাও নিদ্রার সময় অনেকটা স্থির থাকে, তখন কেবল মেরুমজ্জারই প্রাধান্য থাকে। ইহা অপেক্ষাও কৌতুকাবহ দৃষ্টান্ত দেখ। যখন তোমাকে কেহ মারিতে বা কাটিতে অস্ত্র উঠাইয়াছে, তখন তোমার অঙ্গ আপনা আপনিই সরিয়া যায়। গাত্রে এক টুক্‌রা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ পড়িলে, পায়ের তলে হঠাৎ কাঁটা ফুটিলে বা সম্মুখে সহসা অজগর সর্প দেখিলে অঙ্গ যেন জীবিত হইয়া আপনি সরিয়া যায়। চক্ষে বালুকাকণা পড়িলে চক্ষের পাতা আপনিই বন্ধ হইয়া যায়; ইচ্ছা করিয়া বন্ধ করিতে হয় না। উচ্চ স্থান হইতে কেহ পড়িবার সময় বাহু বিস্তারিত করিয়া যাহা সম্মুখে পায়, তাহাই ধরিবার চেষ্টা করে। এরূপ চেষ্টায় অনেকে কেবল দেওয়াল আঁচড়াইয়া

বা গাছের পাতা ছিঁড়িয়া পড়িয়া গিয়াছে দেখা যায়। জলমগ্ন ব্যক্তি তৃণমুষ্টি ধরিয়াও জীবন রক্ষা করিবার চেষ্টা করে। এ সকল স্থলে বিপদ্ এত অধিক যে, মস্তিষ্ক দ্বারা চিন্তা করিয়া কার্য্য করিবার সময় নাই, সুতরাং মেরুদণ্ডীয় মজ্জা স্বীয় প্রতিফলিত ক্রিয়া দ্বারা জীবন রক্ষা করিতে অগ্রসর হয়।

রাত্রিদিন আমরা যে নিশ্বাস প্রশ্বাস করিতেছি, তাহাও এই প্রতিফলিত কার্য্যের নিয়মাধীন। প্রশ্বাসের পর ফুস্‌ফুস্ মধ্যে বায়ুর অভাব হয়, সে অভাব বশতঃ যে উত্তেজনা হয়, তাহাই মেরুদণ্ডীয় ও চতুষ্কোণ মজ্জাতে প্রতিফলিত হইয়া পুনরায় নিশ্বাস লইবার চেষ্টা উৎপাদন করে। দেখ, যদি প্রতিবার মনে ইচ্ছা করিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া নিশ্বাস লইতে হইত, তাহা হইলে কি ক্লেশের বিষয়ই হইত! তাহা হইলে বার কয়েক নিশ্বাস লইয়াই আমরা ক্লান্ত হইয়া পড়িতাম এবং নিদ্রার সময় নিশ্বাস অভাবে নিশ্চয়ই মরিয়া যাইতাম। সেই জন্য আমাদিগের সৃষ্টিকর্ত্তা নিশ্বাস প্রশ্বাস করিবার ক্ষমতা মস্তিষ্ককে না দিয়া মেরুমজ্জা ও চতুষ্কোণ মজ্জার উপর ঐ ভার দিয়াছেন। কারণ, মস্তিষ্ক যদিও রাত্রি প্রভৃতি সময়ে নিদ্রা যায়, কিন্তু মেরুমজ্জা কখনই নিদ্রিত হয় না। নিশ্বাস প্রশ্বাসের উপর মন ও মস্তিষ্কের কেবল এই প্রভুত্ব আছে যে, মন ইচ্ছা করিলে বেশী জোরে বা আস্তে নিশ্বাস লইতে পারে।

চলিয়া যাওয়া, দৌড়ান, লেখা, পড়া, গান করা, বাজান প্রভৃতি কার্য্যের কিয়দংশ মস্তিষ্কের অধীন; অপর সমুদায় অংশ মেরুমজ্জার অধীন। শৈশবাবস্থায় যখন আমরা প্রথম চলিতে শিখি, তখন সেই "হাঁটি হাঁটি পা পা" করিতে ও প্রতিপদ

বিক্ষেপে মস্তিষ্কের সাহায্যের অর্থাৎ ইচ্ছা, সতর্কতা প্রভৃতির প্রয়োজন ছিল ; কিন্তু যখন চলিতে শিখা একবারে উত্তমরূপ অভ্যস্ত হইয়া গেল তখন আর কোন্ ব্যক্তি চলিবার সময় বা দৌড়াইবার সময় প্রত্যেক বার ভাবিয়া চিন্তিয়া পা তুলিয়া থাকেন ? বোধ করি পাঠকগণের মধ্যে কেহ কখনই চলিবার সময় এমন ভাবেন নাই "এই বার ডাইন পা ফেলিয়াছি, এই বার বাম পা তুলিব"। এরূপ করিয়া চলিতে হইলে অল্প দূর চলিয়াই ক্লান্ত হইয়া পড়িতে হইত। বাস্তবিক এই সকল কার্য্যে মস্তিষ্ক বা মন দ্বারা কার্য্য আরম্ভ হয় বটে, কিন্তু পুনঃ পুনঃ কার্য্য করিতে কেবলমাত্র প্রতিফলিত ক্রিয়ার প্রয়োজন। যখন অন্যমনস্ক হইয়া দুইক্রোশ পথ চলিয়া যাও তখন কে তোমাকে চালাইতেছে ? পণ্ডিতেরা বলেন যে, এরূপ অবস্থায় ডাইন্ পা ফেলিবার সময় ঐ পা মাটিতে পড়িয়া যে ঘর্ষণ হয়, তাহার উত্তেজনা মেরুদণ্ডীয় মজ্জায় চলিয়া যায়, এবং তথা হইতে প্রতিফলিত হইয়া বাম উরু ও পা নাড়াইয়া বা চালাইয়া দেয় ; আবার বাম পা মাটিতে পড়িলে যে ঘর্ষণ হয়, তাহার উত্তেজনায় ডাইন পা পুনরায় চালিত হয়। এইরূপে পুনঃ পুনঃ ডাইন্ ও বাম পা পড়িতে থাকে। এইরূপ ব্যাখ্যা যে যথার্থ, চলিবার সময় মস্তিষ্কের সাহায্য যে প্রায় কিছুই প্রয়োজন হয় না, তাহা অনেক সময়ে কার্য্যতঃ দেখা গিয়া থাকে। কখন কখন রণ-ক্ষেত্রে অতিশয় পরিশ্রমের পর সৈন্যদল তৎক্ষণাৎ দূরে যাত্রা করিতে বাধ্য হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় সময়ে সময়ে দলকে দল সৈন্য অর্দ্ধনিদ্রিতাবস্থায় চলিতেছে, অথবা কেহ কেহ ঘুমাইয়া চলিতেছে, কেহ জাগিয়া চলিতেছে এরূপ শুনা যায়। অবশ্য.

এরূপ অবস্থায় নিদ্রা যে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আসিতেছে ও ভাঙ্গিতেছে, তাহার সন্দেহ কি ; কিন্তু চলিতে যদি মস্তিষ্কের বিশেষ সাহায্য প্রয়োজন হইত, তাহা হইলে এ ঘটনা কখনই সম্ভব হইত না।

এইরূপ, যদিও পড়িতে শিখিবার সময় অতি যত্নে প্রতি কথার বানান শিখিতে হয়, যদিও লিখিতে শিখিবার সময় প্রতি অক্ষরের আকৃতি ভাবিতে হয়, তথাপি একবার লেখা পড়া শিখিয়া ফেলিলে তাহার পর লিখিবার বা পড়িবার সময় কোন্ ব্যক্তি বানান বা অক্ষরের আকৃতি ভাবিয়া থাকেন ? পুনশ্চ, গান বা বাদ্য শিখিবার সময় প্রথমতঃ একটা রাগিণী বা একটী তাল শিখিতে কত অধ্যবসায়, কত মনঃসংযোগের প্রয়োজন, কিন্তু সঙ্গীত বিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তি অতি দ্রুতভাবে গাহিতে বা বাজাইতে আরম্ভ করিয়া কিছুমাত্র সাবধান না হইয়াও অতি পরিপাটীরূপে কার্য্য সমাধা করেন। এরূপ অবস্থায় কোন কোন গায়ক বা বাদক অন্য চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়াও নিজ কার্য্যে কিছুমাত্র ভ্রান্ত হয়েন না, অর্থাৎ মস্তিষ্কের সাহায্য না লইয়াও অনেক পরিমাণে কার্য্য করিতে পারেন।

সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, মানবজীবনের অনেকগুলি কার্য্য যদিও প্রথমতঃ কেবলমাত্র চিন্তা, মনঃসংযোগ প্রভৃতি মানসিক বৃত্তি দ্বারা শিখিতে হয় বটে, তথাপি ঐ সকল কার্য্য একবার উত্তমরূপ অভ্যস্ত হইলে আর মস্তিষ্কের পূর্ব্ববৎ অধীন থাকে না। তখন মস্তিষ্ক সেই সকল কার্য্য আরম্ভ করাইয়া দেয় ও তাহাদের তত্ত্বাবধারণ করে, কিন্তু অধিকাংশ কার্য্যই মেরুমজ্জার প্রতিফলিত ক্রিয়া বশতঃ সম্পন্ন হয়। ইহাতে

ফল এই হয় যে, মস্তিষ্ক সামান্য কার্য্য করিতে গিয়া ক্লান্ত হয় না এবং অন্য কার্য্য করিতে অবসর পায়।

সমুদায় বিবেচনা করিলে ইহাই সিদ্ধান্ত হইবে যে, ১ম। প্রতিফলিত কার্য্যের একটীও আমাদের ইচ্ছাধীন নহে। ২য়। প্রতিফলিত কার্য্যের উদ্দেশ্য আমাদের জীবনের মঙ্গল বিধান করা। ৩য়। মস্তিষ্কের সহিত বা চিন্তার সহিত এই কার্য্যের কোন সম্পর্ক নাই।

মস্তিষ্কের কার্য্য।

বর্ণনার সুবিধার জন্য মস্তিষ্ককে সাধারণতঃ তিন ভাগে বিভাগ করা যায়, যথা সম্মুখ বা বৃহৎ মস্তিষ্ক, পশ্চাৎ বা ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক ও চতুষ্কোণ মজ্জা। এই তিনের মধ্যে সম্মুখ মস্তিষ্কই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং কার্য্যেও সর্ব্বপ্রধান, সুতরাং প্রথমেই তাহার বর্ণনা করা যাইবে।

১। সম্মুখ মস্তিষ্ক বা বৃহৎ মস্তিষ্কের কার্য্য।

সম্মুখ মস্তিষ্কই মনুষ্যের জ্ঞান বুদ্ধি ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রধান পথ। কেবল জীবনরক্ষার জন্য এই যন্ত্রের প্রয়োজন নাই, কারণ অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহুতর জীবের মস্তিষ্ক নাই, তথাপি তাহারা জীবিত থাকে। যে সকল জীবের মস্তিষ্ক আছে, তাহারা সকলেই বুদ্ধিমন্ত, কিন্তু যাহার যেমন মস্তিষ্ক, তাহার তেমনই বুদ্ধি। বুদ্ধির এই তারতম্য একটু বিশেষ করিয়া দেখা যাউক।

মৎস্য ও সরীসৃপগণের অতি সামান্য মাত্র সহজ বুদ্ধি আছে, তাহারা তাহাতেই আত্মরক্ষা, বাসস্থান নির্ম্মাণ, খাদ্য অন্বেষণ প্রভৃতি কার্য্য করিতে সমর্থ। সহজ বুদ্ধির প্রধান লক্ষণ এই যে, জন্মগ্রহণের সময় যে জাতির যে পরিমাণে বুদ্ধি থাকে, তাহারই

ব্যবহারে সেই জাতীয় জীব সকল একই প্রকারে কার্য্য করে। মধুমক্ষিকার মধুচক্র ও পক্ষীর কুলায় চিরকাল একই প্রথানুসারে গঠিত হইয়া থাকে। কিন্তু উচ্চ শ্রেণীস্থ পক্ষিগণ ইহা অপেক্ষা একটু মার্জ্জিত বুদ্ধির পরিচয় দেয়। তাহারা খুঁজিয়া খুঁজিয়া ভাল স্থানে ও ভাল দ্রব্য দ্বারা বাসা নির্ম্মাণ করে। সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর পক্ষিগণ স্মরণশক্তির যথেষ্ট পরিচয় দিয়া থাকে। ময়না, কাকাতুয়া প্রভৃতি পক্ষিগণ মনুষ্যোচ্চারিত কথা শুনিয়া তাহা উচ্চারণ করিতে পারে।

স্তন্যপায়ী জীবগণ আরও বুদ্ধিজীবী। গৃহপালিত গো মহিষাদির স্মরণশক্তি ও প্রতিপালকের প্রতি স্নেহের বহুতর প্রমাণ দেখায়। হস্তী, অশ্ব ও কুকুর ইহাদের মধ্যে গরিষ্ঠ প্রমাণ মার্জ্জিত-বুদ্ধিবিশিষ্ট। এই তিন জন্তুর প্রভুভক্তি, উপস্থিত বুদ্ধি, স্মরণশক্তি, জিঘাংসা, স্নেহ, দয়া ও সতর্কতার যে অশেষবিধ কিম্বদন্তী আছে, তাহাতে ইহাদিগকে অতিশয় বুদ্ধিজীবী না বলিয়া থাকা যায় না।

ইহাদের উপর ও মানুষের নীচে দুইটী জন্তু আছে, বানর ও বনমানুষ। ইহাদের বুদ্ধিবৃত্তি এত অধিক ও শরীরের গঠন মনুষ্যের সহিত এত সদৃশ যে, আমাদিগের বাঙ্গালা ভাষায় এই উভয় জন্তুর নামেই মনুষ্যবোধক শব্দ ব্যবহৃত হয়, এবং এক জন ইংরাজ পণ্ডিত নির্ভয়হৃদয়ে মনুষ্যকে বানরের বংশধর বলিয়া আদর করিয়াছেন। বাস্তবিক সর্ব্বদেশেই এই দুই জন্তুর অসাধারণ বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়*। শেষোক্ত জন্তু কয়টীর মস্তিষ্ক বৃহৎ ও সুগঠিত।

* কুকুরের অসাধারণ বুদ্ধি বিষয়ে অনেক গল্প শুনা যায় এবং সর্ব্বদা অনেক প্রমাণ দেখা যায়। হস্তীর বুদ্ধিও অতি প্রখর, তাহা এদেশের অনেকেই

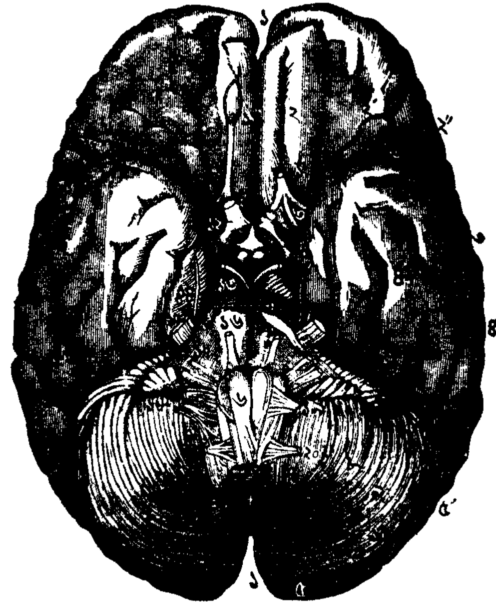
কিন্তু মনুষ্য শ্রেণীতে মস্তিষ্কের যেরূপ উন্নতি দেখা যায়, এত আর কোন জীবের নাই। ইহা দ্বারা মানবগণ (১) স্পর্শ জ্ঞান লাভ করেন, (২) দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা যে জ্ঞানলাভ হয়, তাহা স্মরণ করিয়া রাখেন এবং ভবিষ্যতে তাহা প্রকাশ করিতে পারেন, (৩) ইহা দ্বারা তর্ক বা বিচার করিতে, কার্য্যসিদ্ধির জন্য উপায় উদ্ভাবন করিতে, এবং ভূয়োদর্শন দ্বারা সিদ্ধান্ত বা অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারেন, (৪) ইহারই সাহায্যে দয়া, স্নেহ, ভক্তি, ঈশ্বরজ্ঞান প্রভৃতি লাভ করিতে পারেন।

মস্তিষ্কের সাহায্যে যে এই সকল কার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। প্রমাণগুলি এই ;—

প্রথমতঃ। উপরে দেখিলাম যে, যে জন্তুর যে পরিমাণে মস্তিষ্কের উন্নতি হইয়াছে, সেই জন্তু সেই পরিমাণে বুদ্ধি-জীবী। মনুষ্যগণেরও শৈশবকালে মস্তিষ্ক ক্ষুদ্র থাকে বলিয়া, বুদ্ধি অল্প থাকে, পরে যখন বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্ক বাড়িতে থাকে, তখন জ্ঞান বুদ্ধি প্রভৃতিও বাড়িতে আরম্ভ করে। অধিক বয়সেও যাহাদের মস্তিষ্ক ক্ষুদ্র থাকে, সে সকল মনুষ্য নিতান্ত নির্ব্বোধ হয়, অল্প বয়সেও যাহাদের মস্তিষ্ক বড় হয়, তাহারা সেই সময়েই বুদ্ধিমান হয়। জগতের মধ্যে যে সকল ব্যক্তি অতিশয় বুদ্ধিমান বলিয়া পরিচিত হইয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে মৃত্যুর পর যাঁহার যাঁহার মস্তিষ্ক ওজন করা হইয়াছিল, তাঁহারই মস্তিষ্ক বিলক্ষণ বড় ও ভারী দেখা গিয়াছিল। সুতরাং মস্তিষ্ক যে ঐ সকল কার্য্যের আধার, তাহার সন্দেহ নাই।

জানেন। শান্তিপুরের 'সুখী' নামক অহিফেনপ্রিয় বানরের বিষয়ে অতি আশ্চর্য্য গল্প শুনা যায়। বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি যে, সেই সকল গল্পের অধিকাংশই সত্য।

অষ্টম প্রতিকৃতি। মস্তিষ্কের নিম্নভাগের আকৃতি।*



দ্বিতীয়তঃ। মস্তিষ্কের উপর কোন গুরুতর আঘাত হইলে,

* হাত পা চক্ষু প্রভৃতি যেমন ডাইন দিকে একটী ও বাম দিকে একটী আছে মস্তিষ্কও তদ্রূপ ডাইন অর্দ্ধ ও বাম অর্দ্ধে বিভক্ত। প্রত্যেক অর্দ্ধ তিন তিন খণ্ডে বিভক্ত। ১, ১, এই অর্দ্ধদ্বয়ের মধ্যস্থিত পথ। ২, ২', ২'', সম্মুখ বা বৃহৎ মস্তিষ্কের প্রথম খণ্ড। ৪, ৪', ৪'', সম্মুখ মস্তিষ্কের দ্বিতীয় খণ্ড। ৩, ঐ প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের মধ্যস্থিত পথ। ৫, ৫' সম্মুখ মস্তিষ্কের তৃতীয় খণ্ড। উভয়দিকেই এইরূপ তিন তিন খণ্ড রহিয়াছে। ৬, চতুষ্কোণ মজ্জা। ৭, ৮, ৯, ১০ পশ্চাৎ বা ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক দুই দিকে দুই খণ্ড রহিয়াছে। মস্তিষ্ক হইতে যে যে স্নায়ু নামিয়া গিয়া চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতিতে বিস্তৃত হইয়াছে ১১ হইতে ১৯ পর্য্যন্ত সংখ্যাগুলিতে তাহাদের উৎপত্তি স্থান দেখান হইয়াছে। ২০, গ্রীবা-দেশের প্রথম স্নায়ু। মস্তিষ্কের উপরিভাগ ৭ম প্রতিকৃতিতে দেখান হইয়াছে।

ছাদ হইতে পড়িয়া অথবা লাঠির আঘাতে মাথা ফাটিয়া গেলে বা অন্য কোন কারণে মস্তিষ্কের বিপদ হইলে তৎক্ষণাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়িতে হয়।

তৃতীয়তঃ। মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি বৃদ্ধি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্ক যেরূপ বাড়ে, স্নায়ুযন্ত্রের অন্য কোন অংশ সেরূপ বাড়ে না। ইহা ছাড়া আরও অনেক প্রমাণ আছে, এ ক্ষুদ্র পুস্তকে তাহার বিস্তারিত বর্ণনা হইতে পারে না।

মস্তিষ্ক ও আত্মা।

মস্তিষ্ক দ্বারা কিরূপে এত বড় বড় কার্য্য সাধিত হয়, তাহা এখনও ঠিক হয় নাই। মস্তিষ্কের সঙ্গে মন বা আত্মার কিরূপ সম্পর্ক, তাহাও এখনও ভালরূপ জানা যায় নাই। সমস্ত পৃথিবীর পণ্ডিতগণ বহুকাল হইতে দুই দলে বিভক্ত হইয়াছেন। এক দল বলিতেছেন যে, মস্তিষ্কই সর্ব্বস্ব, ইহা ছাড়া স্বতন্ত্র আত্মা বলিয়া আর কিছু নাই, মনুষ্যজীবনের ক্রিয়াকলাপ, জ্ঞান, ধর্ম্ম প্রভৃতি সকলই মস্তিষ্কের কার্য্য। মৃত্যুর পর মনুষ্যের আর কিছুই থাকে না। মরণের পর স্বর্গ নরক কিছুই নাই। ইহাঁদিগকে জড়বাদী বা প্রত্যক্ষবাদী বলা যায়। উপরে যে সকল কথা বলা হইয়াছে তাহাতে ইহাঁদের কথা সত্য বলিয়া বোধ হইতেও পারে। কিন্তু আর এক দল মহাপণ্ডিত বলিতেছেন যে, শারীর বিধান বিদ্যায় মস্তিষ্কের যে কার্য্য বর্ণিত হয়, তাহাতে মস্তিষ্ককে কেবল দূত বা সংবাদবাহক বলিয়াই বোধ হয়। মস্তিষ্ক মনের নিকট সংবাদ লইয়া যায় এবং মনের হুকুম বাহিরে লইয়া আইসে। ইহাঁদের মতে মন বা আত্মা শরীর হইতে ভিন্ন অথচ শরীরের ভিতর কোন অজ্ঞেয়রূপে বাস করিতেছে। ইহা অনন্ত,

অবিনাশী, ঈশ্বরের অংশ; ইহা যত দিন জগতে থাকে, শরীরের ভিতর বাস করে এবং মস্তিষ্ক দ্বারা জগতের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে, শরীরধ্বংসের পর ইহা ঈশ্বরের নিকট দায়ী ও দুঃখ বা সুখভোগী হয়।

উভয় পক্ষেই বিখ্যাত পণ্ডিতগণ পুস্তক লিখিয়াছেন, কিন্তু অদ্যাবধি অধিকাংশ বিজ্ঞ লোকেই দ্বিতীয় মত গ্রহণ করিয়াছেন। মানুষের সহজ বুদ্ধিতেও দ্বিতীয় মতটীই সত্য বলিয়া বুঝা যায়, এবং সেই জন্যই এই মত জগতের অধিকাংশ লোকের নিকটই আদরণীয়।

ভিন্ন ভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য।

একটী কথা কিয়দংশে ঠিক হইয়াছে। কথাটী এই যে, মস্তিষ্কের ভিন্ন ভিন্ন অংশ দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন মানসিক কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। স্মরণশক্তি, বিচারশক্তি, ধর্ম্মপ্রবৃত্তি প্রভৃতি মানসিক বৃত্তিগুলির প্রত্যেকের নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে। তাহার প্রমাণ এই যে :—

প্রথমতঃ। সকল মানুষেরই বাল্যকাল হইতে ভিন্ন ভিন্ন মানসিক বৃত্তির তেজ বা খর্ব্বতা দেখা যায়। পাঠশালার কোন বালক অঙ্ক কসিতে ভালবাসে, কেহ কবিতা পড়িয়া মহা খুসী হয় ও তাহাই মুখস্থ করে, কেহ বা কাষ্ঠ বাজাইয়া ও গুন্‌গুন্‌স্বরে গান করিয়া সঙ্গীতপ্রিয়তার পরিচয় দেয়, কেহ বাল্যকাল হইতেই একটু একটু দুষ্কর্ম্মের দিকে অগ্রসর হয়, কেহ বা ঐ সময় হইতেই সুপথে যাইবে বলিয়া বুঝা যায়। সত্য বটে শিক্ষা ও সঙ্গের উপর মানুষের মতি গতি অনেকটা নির্ভর করে, তথাপি এই সকল আদিম প্রবৃত্তিগুলি যে মানুষের জ্ঞানবুদ্ধির উন্নতি

সম্বন্ধে অন্তরায় বা সহকারী হইয়া থাকে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। যে বালক বা বালিকা বাল্যকাল হইতে যে বিষয়ে প্রবৃত্তি দেখাইয়া থাকে, রীতিমত শিক্ষা পাইলে সে উত্তরকালে সেই বিষয়ে বিলক্ষণ উন্নতি করিতে পারে *। ইহাতে কি বুঝাইল? বুঝাইল এই যে, এক বিষয়ে বিশেষ আস্থা থাকা কখনই সমগ্র মস্তিষ্কের কার্য্য হইতে পারে না। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে যে ব্যক্তির সঙ্গীতপ্রিয়তা আছে, সে অন্যান্য বিষয়ও সেইরূপ ভালবাসিত; যে সঙ্গীত ভালবাসে না, সে কিছুই ভালবাসিত না। মস্তিষ্কের একস্থানে সঙ্গীত ভালবাসে, রামের মস্তিষ্কের সেই অংশ বড় হইয়াছে; সে সঙ্গীত শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করে। কেদারের সে অংশ ছোট আছে, তাহার গান শুনিতে ভাল লাগে না। মস্তিষ্কের যে অংশে অঙ্ক কসে, কেদারের সেই অংশ বড় হওয়াতে, সে যাত্রা শুনিতে না গিয়া শ্লেট পেন্সিল লইয়া বসে। এইরূপে সাধু ও তস্কর, নম্রস্বভাব ও উদ্ধত, দয়ালু ও নিষ্ঠুর, বুদ্ধিমান ও নির্ব্বোধ, সংক্ষেপতঃ মনুষ্য যত কিছু গুণ ইহজীবনে প্রাপ্ত হয়, তৎসমুদায়ই মস্তিষ্কের স্থানবিশেষের উপর নির্ভর করে। যাহার যে অংশ উন্নত, সে সেই স্থানোপযুক্ত গুণে গুণী ও যে অংশ ক্ষীণ বা হ্রস্ব, সেই স্থানের গুণবর্জ্জিত হয়।

দ্বিতীয়তঃ। শরীরের অন্যান্য বড় যন্ত্রের কার্য্য যখন বিভাগ করা আছে, তখন মস্তিষ্কের কার্য্য ভাগ করা না থাকিবে কেন? পরিপাকযন্ত্র, হৃদয়, ফুস্ফুস্ প্রভৃতিতে প্রত্যেক অংশের কত

* বলা আবশ্যক যে এই মত অদ্যাপি পণ্ডিতগণের মধ্যে সর্ব্ববাদী সম্মত হয় নাই, তবে অধিকাংশ পণ্ডিত বিশ্বাস করেন বলিয়াই এখানে লিখিত হইল।

স্বতন্ত্র কার্য্য-বন্দোবস্ত আছে, তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, তাহাদেরই মধ্যে যেখানে স্বতন্ত্র অংশের উপর স্বতন্ত্র ভার আছে, সেখানে মস্তিষ্কের ন্যায় এত বড় যন্ত্রে অবশ্যই উহা থাকিবে।

তৃতীয়তঃ। নিদ্রার সময় সকল মানসিক বৃত্তিগুলি নিদ্রিত থাকে না; যেগুলি সজাগ থাকে, তাহাদের দ্বারাই স্বপ্ন দেখা যায়। যদি সকল বৃত্তিগুলিই মস্তিকের সর্ব্বত্র থাকিত, তাহা হইলে হয় গভীর নিদ্রা হইত, নতুবা জাগিয়া থাকিতে হইত, কখন স্বপ্ন দেখিতে পাইতাম না।

চতুর্থতঃ। উন্মাদ হইলে সকল মনোবৃত্তি খারাপ হয় না। পাগল ব্যক্তি অনেক কথা সহজ মানুষের ন্যায় কহে। যদি মনোবৃত্তিগুলি মস্তিষ্কের উপর সমান ভাবে বিস্তৃত থাকিত, তাহা হইলে পাগল ব্যক্তি কোন কথাই বুঝিত না।

এই সকল মনোবৃত্তির মধ্যে কোন্‌টী কোন্ স্থানে থাকে, তাহা এখনও ঠিক হয় নাই। দুই এক জন পণ্ডিত "মস্তিষ্কবিদ্যা" নামে শাস্ত্র লিখিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, কোথায় কোন্ মনোবৃত্তির আবাস, তাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে *; কিন্তু তাঁহাদের মত অদ্যাপি পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট আদৃত হয় নাই। এক্ষণে এই পর্য্যন্ত স্থির জানা গিয়াছে যে, মনোবৃত্তিগুলি

* তাঁহাদের মতে ললাটের পশ্চাদ্‌ভাগে মস্তিষ্কের যে অংশ আছে, তাহাতে স্মরণশক্তি, সময়জ্ঞান, হর্ষ প্রভৃতি বৃত্তি সকল অবস্থিত। চক্ষুর পশ্চাদ্‌ভাগে যে অংশ আছে, তাহাতে ভাষা ও গণিতজ্ঞান, বস্তুর আকার পরিমাণ ও বর্ণ জ্ঞান, প্রভৃতি আছে। ব্রহ্মতালুর নিম্নে যে অংশ, তাহাতে দয়া, ভক্তি, গাম্ভীর্য্য, অহঙ্কার, হিতাহিত বিবেক, আশা, অনুচিকীর্ষা ও সতর্কতা প্রভৃতি গুণ আছে। কর্ণের পশ্চাদ্‌ভাগে মস্তিষ্কের যে অংশ আছে, তাহাতেই সংসারানুরাগ, বন্ধুতা, স্নেহ, দম্পতীপ্রেম ও কামপ্রবৃত্তি আছে। এইরূপে প্রত্যেক মানসিক বৃত্তির আধার-স্থান আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহাই তাঁহাদিগের মত।

মস্তিষ্কের ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে উৎপন্ন হয়। কোন স্থান হইতে কোন্‌টী উৎপন্ন হয়, তাহা আবিষ্কৃত হয় নাই।

নিদ্রা।

হৃদয় যেমন একবার ঢুপ্ ঢুপ্ করিয়া একটু বিশ্রাম করিতেছে, ফুস্‌ফুস্ ও পাকযন্ত্র যেমন নিজ নিজ কার্য্য করিতে করিতে বিশ্রাম লইতেছে, মস্তিষ্কও সেইরূপ কার্য্য করিয়া ক্লান্ত হইলে বিশ্রাম করিয়া থাকে। এই বিশ্রামের নাম নিদ্রা। দুশ্চিন্তা, কার্য্য-ব্যস্ততা বা অন্য কোন কারণ বশতঃ কিয়ৎক্ষণ নিদ্রার বাধা হইতে পারে, কিন্তু ইহার প্রয়োজন এতই অনিবার্য্য যে, ঘোর সংগ্রাম-স্থলে, ভয়ানক শারীরিক যন্ত্রণার সময় বা সর্ব্বনাশ-উৎপাদিকা বিপদ্ হইলেও ক্লান্ত ব্যক্তি নিদ্রিত হইয়া পড়ে।

নিদ্রার সময় শারীরিক কার্য্যের অনেকগুলি বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। বসিয়া বা দাঁড়াইয়া থাকিলে চতুর্দ্দিকের মাংসগুলিতে টান পড়ে, সুতরাং তাহাতেই মস্তিষ্কের কার্য্য চলিতে থাকে, আর শীঘ্র নিদ্রা আসে না। সেই জন্য নিদ্রার পূর্ব্বে শয়ন করা আবশ্যক। শয়ান অবস্থায় মাংসগুলি শিথিল হইয়া পড়ে, তাহাদের কার্য্য বন্ধ হইয়া যায়, সুতরাং মস্তিষ্কও শয়নজন্য আরাম অনুভব করিতে থাকে। কিন্তু যদি সম্পূর্ণরূপ হাত পা ছড়াইয়া শয়ন করা যায়, তাহা হইলেও কিঞ্চিৎ পরিশ্রম আবশ্যক, সেই জন্যই মনুষ্য মাত্রেই শয়ন করার অল্পক্ষণ পরেই হস্তপদাদি ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া লয়, সোজা শয়ন না করিয়া একটু বক্রভাবে, হাত পা অল্প গুটাইয়া শয়ন করে। তাহাতে শরীরের প্রায় অধিকাংশ মাংসই সম্পূর্ণরূপ শিথিল হইয়া যায়, এবং তাহাদের প্রায় কিছুই পরিশ্রম থাকে না। এ দিকে দর্শন, শ্রবণ, প্রভৃতি

ক্রিয়া দ্বারা মস্তিষ্ক উত্ত্যক্ত হইতে না পায়, এই উদ্দেশ্যে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অন্ধকারময় নিঃশব্দ স্থানে শয়ন করিতে হয়।

কিন্তু কেবল যে অন্ধকারময় নিঃশব্দ স্থানেই মস্তিষ্কের বিরাম হয়, এরূপ নহে। নিদ্রার সময় মস্তিষ্কের সকল অংশ বিশ্রাম করে না, তাহা উপরে বলা হইয়াছে; কেবল মাত্র মস্তিষ্কের যে অংশে স্পর্শ জ্ঞান হয়, সেই স্থান হইতে ধীরে ধীরে রক্ত সরিয়া গেলেই আমরা নিদ্রিত হই। অন্ধকারময় নিঃশব্দ স্থান ও ক্লান্ত শরীর হইলে যত শীঘ্র ইহা ঘটে, একই প্রকার শব্দ বা একই প্রকার অন্য কোন স্পর্শজ্ঞান (যদি যন্ত্রণাদায়ক না হয়, তাহা হইলে তাহা) দ্বারাও সেইরূপ কার্য্য হয়। এই জন্যই রেল বা অন্য কোন গাড়ির গড় গড় শব্দ, গানের সুমধুর সুর, বা অসার পুস্তক পাঠের বা অপ্রীতিকর বিষয়ের বক্তার ঘ্যান্ ঘ্যান্ শব্দ শুনিতে শুনিতে অনেকে নিদ্রিত হইয়া পড়েন। এ স্থলে একই প্রকার শব্দ পুনঃ পুনঃ স্পর্শকেন্দ্রের উপর (মস্তিষ্কের যে স্থলে স্পর্শজ্ঞান লাভ হয়, তাহার উপর) পতিত হওয়াতে ক্রমে ঐ স্থান, সকল প্রকার স্পর্শজ্ঞান লাভ করিতে বিরত হইয়া বিশ্রাম করিতে অর্থাৎ নিদ্রা যাইতে থাকে। আস্তে আস্তে পুনঃ পুনঃ কাণ চাপড়াইয়া কাণের কাছে গুন্ গুন্ শব্দ করিলে শিশু নিদ্রিত হইয়া পড়ে। পা টিপিয়া দিলে, গাত্রে সুড়সুড়ি দিলে বা আস্তে আস্তে চুল টানিলে, কাহারো কাহারো নিদ্রাকর্ষণ হয়; তাহার কারণ এই যে, পৌনঃপুনিক স্পর্শজ্ঞান বশতঃ মস্তিষ্কের স্পর্শকেন্দ্র ক্রমে বিরাম লাভ করে। সুতরাং হয় শব্দ, আলোক প্রভৃতি সকল প্রকার উত্তেজনার অভাব, নতুবা একই প্রকারের উত্তেজনা পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ দ্বারা স্পর্শকেন্দ্রের বিরাম হয়।

উপরে বলা হইয়াছে যে, মস্তিষ্কের স্পর্শকেন্দ্র হইতে রক্ত সরিয়া গেলেই আমরা নিদ্রিত হই। স্পর্শকেন্দ্র রক্তহীন হইলে কিয়ৎ কালের নিমিত্ত বহির্জগতের স্পর্শ, শব্দ প্রভৃতি গ্রহণ করিতে ক্ষান্ত থাকে, এই অবস্থাকেই নিদ্রা বলা যায়। অত্যন্ত পরিশ্রম করার পর অতিশয় ক্লান্তি হইলে শরীরের অন্যান্য অংশের ন্যায় স্পর্শকেন্দ্রেরও অতিশয় ক্ষয় হইয়া যায়, সুতরাং ইহার পোষণের জন্য অতিশয় বিশ্রাম আবশ্যক হয়। সেই জন্যই ক্লান্ত শরীরে গভীর নিদ্রা হয়। কখন কখন অর্দ্ধনিদ্রিত ব্যক্তিকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাহার উত্তর দিয়া আবার নিদ্রিত হয়েন। এ স্থলে স্পর্শকেন্দ্র সামান্য কার্য্য করিতে থাকে। আবার যদি নিদ্রিত ব্যক্তির গায়ে সুড়সুড়ি বা কর্ণে ফুৎকার দেওয়া যায়, তখন হয় ত সে কেবল একবার "আঃ" বলিয়া পার্শ্ব ফিরিয়া শয়ন করে। এ স্থলে স্পর্শকেন্দ্র কিয়ৎ-ক্ষণের নিমিত্ত কার্য্য করিয়া পুনরায় বিশ্রাম করিতে থাকে। কিন্তু যদি নিদ্রিতকে জোরে ধাক্কা দেওয়া যায়, তাহা হইলে স্পর্শকেন্দ্র বিশ্রাম ত্যাগ করিয়া কার্য্য করিতে আরম্ভ করে,—নিদ্রিত ব্যক্তি জাগিয়া উঠে।

নিদ্রার সময় মস্তিষ্কের অন্যান্য সকল অংশ কার্য্য করিতে থাকে। যাহাকে স্বপ্ন বলা যায়, সে অবস্থাতেও স্মরণশক্তি, বিচারশক্তি প্রভৃতি থাকে, কিন্তু স্পর্শকেন্দ্রের সাহায্য পায় না বলিয়াই ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত করে। কেহ কেহ বলেন, প্রত্যেক বার নিদ্রার সময়ে, এমন কি গভীর নিদ্রার সময়েও আমরা স্বপ্ন দেখি, তবে কতকগুলি মনে থাকে, কতকগুলি মনে থাকে না।

২। পশ্চাৎ মস্তিষ্ক বা ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের কার্য্য।

মস্তিষ্কের পশ্চাদ্‌ভাগে যে অংশ আছে, তাহাকেই পশ্চাৎ মস্তিষ্ক কহে। সম্মুখ মস্তিষ্ক অপেক্ষা ইহা আকারে অনেক ছোট বলিয়া ইহাকে ক্ষুদ্র মস্তিষ্কও বলা যায়। ইহা একটী সাধারণ কমলা লেবুর ন্যায় বড়, দেখিতে মস্তিষ্কের অন্যান্য অংশের ন্যায় শ্বেতবর্ণ ও কোমল।

ইহার কার্য্য সম্বন্ধে অনেকে বিশ্বাস করেন যে, ১। মস্তিষ্কের এই অংশ দ্বারা কেন্দ্রবিমুখ বা বেগোৎপাদক স্নায়ু সকলের কার্য্য আরম্ভ হয়। এখান হইতে কেন্দ্র বিমুখ উত্তেজনা বা হুকুম বাহির হইয়া বেগোৎপাদক স্নায়ুর ভিতর দিয়া গিয়া হাত পা নাড়াইতে থাকে।

২। এতদ্ব্যতীত কোন্ পদার্থ নাড়িতে কত বল লাগিবে, তাহাও এই অংশ দ্বারা স্থিরীকৃত হয়।

৩। দুই এক জন "মস্তিষ্কবিদ্যা"বিৎ পণ্ডিত লিখিয়াছেন যে, পশ্চাৎ মস্তিষ্ক দ্বারা কামপ্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, যে সকল জন্তুর এবং মানুষের মধ্যে যে সকল ব্যক্তির পশ্চাৎ মস্তিষ্ক বড়, তাহারা অতিশয় কামুক। এ কথা সত্য কি মিথ্যা এখনও ঠিক বলা যায় না।

৩। চতুষ্কোণ মজ্জার কার্য্য।

মস্তিষ্কের অব্যবহিত নিম্নে একটী চতুষ্কোণ অংশ আছে, ইহা মেরুদণ্ডীয় মজ্জার ঠিক উপরে অবস্থিত, ইহার নাম চতুষ্কোণ মজ্জা।

১ম। মেরুদণ্ডীয় মজ্জার ন্যায় ইহার ভিতর দিয়া স্পর্শবোধক ভাব বাহির হইতে ভিতরে ও ভিতর হইতে বাহিরে যায়। এ

সম্বন্ধে মেরুদণ্ডীয় মজ্জা সিঁড়িস্বরূপ, মস্তিষ্ক উপরকার ঘরের ন্যায় এবং চতুষ্কোণ মজ্জা সিঁড়ি দিয়া সেই ঘরে উঠিবার সর্ব্বোচ্চ ধাপ।

২। প্রতিফলিত ক্রিয়া। মেরুদণ্ডীয় মজ্জার প্রতিফলিত কার্য্যে চতুষ্কোণ মজ্জা বিশেষ সাহায্য করে। যে প্রতিফলিত ক্রিয়া দ্বারা আমরা সর্ব্বদা নিশ্বাস লইতেছি, তাহার প্রধান আকর চতুষ্কোণ মজ্জা। চতুষ্কোণ মজ্জা হইতে একটী স্নায়ু বাহির হইয়া ফুস্‌ফুসে গিয়াছে। যখন প্রশ্বাস ত্যাগ করিয়া পুনরায় নিশ্বাস লইতে আরম্ভ করা যায়, তখন নিম্নলিখিত কার্য্যগুলি হয়ঃ—

বায়ুর অভাব বশতঃ যে উত্তেজনা হয়, তাহা চতুষ্কোণ মজ্জায় প্রতিফলিত হইয়া উক্ত স্নায়ুর ভিতর দিয়া ফুস্‌ফুসে গমন করে ও তখন নিশ্বাস টানিতে ইচ্ছা হয়।

সুতরাং চতুষ্কোণ মজ্জার যে অংশ হইতে এই স্নায়ু উঠিয়াছে, সেখানে একটী সূচিকা বিদ্ধ হইলেও তৎক্ষণাৎ প্রাণ সংহার হয়।

মস্তিষ্ক হইতে উৎপন্ন স্নায়ু।

মস্তিষ্ক হইতে নয় জোড়া স্নায়ু উৎপন্ন হইয়া চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ে ও অন্যান্য স্থানে গমন করিয়াছে। তন্মধ্যে স্বাদগ্রাহী, শব্দ-গ্রাহী প্রভৃতি কয়েকটীর বর্ণনা ইতিপূর্ব্বে অল্প অল্প দেওয়া হইয়াছে। অবশিষ্টগুলির কার্য্য বর্ণনা এই ক্ষুদ্র পুস্তকে হইতে পারে না।

অনৈচ্ছিক স্নায়ু।

কতকগুলি স্নায়ু মস্তিষ্ক বা মেরুদণ্ডীয় মজ্জা হইতে উৎপন্ন হয় নাই। সুতরাং আমাদিগের মনের সঙ্গে তাহাদের কোন সম্পর্ক নাই। এই জন্য তাহাদিগকে অনৈচ্ছিক স্নায়ু কহে। এই সকল স্নায়ু দ্বারা হৃদয়ের ও অন্ত্রনলীর অনেকগুলি কার্য্য সম্পন্ন হয়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

চর্ম্ম, স্পর্শেন্দ্রিয় ও স্পর্শ।

মনুষ্যশরীরের উপরিভাগ এক অতি কোমল ও উজ্জ্বল আবরণে আবৃত; ইহার নাম চর্ম্ম। খালি চক্ষে দেখিলে, বোধ হয়, চর্ম্মে কোন প্রকার গর্ত্ত নাই; কিন্তু অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, চর্ম্ম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত্তে পরিপূর্ণ। এই সকল গর্ত্ত এত ছোট যে, একটী টাকার মত স্থানে তিন হাজার গর্ত্ত থাকিতে পারে।

যদি এক টুকরা চর্ম্ম কাটিয়া লইয়া পরীক্ষা করা যায় যে, এই সকল গর্ত্ত কোথায় গিয়া শেষ হইয়াছে, তাহা হইলে দেখা যায় যে, প্রত্যেক গর্ত্ত চর্ম্মের ভিতর ঢুকিয়া এক একটী নল হইয়া নামিয়া গিয়াছে এবং কিয়দ্দূর নীচে গিয়া গ্রন্থি বা গাঁইট বাঁধিয়া গিয়াছে। সুতরাং চর্ম্মের বাহিরে যে গর্ত্তগুলি রহিয়াছে, সেগুলি এই সকল নলের বাহির দিকের মুখ ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই সকল নলের দ্বারা ঘর্ম্ম নিঃসরণ হয় বলিয়া ইহাদিগকে 'ঘর্ম্মকূপ' কহা যায়। নলের মুখে (অর্থাৎ গর্ত্তগুলি বাহিরে আসিয়া যেখানে শেষ হয়, সেই স্থানে) সচরাচর লোম থাকে বলিয়া নলগুলিকে 'লোমকূপ'ও কহা যায়।

এই সকল নলের সংখ্যা এত অধিক যে, এক জন পণ্ডিত গণনা দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সমস্ত শরীরে তেইশ লক্ষ একাশী হাজার দুই শত আটচল্লিশটী এইরূপ গর্ত্ত বা নল আছে। এই নলগুলির মুখ অর্থাৎ গর্ত্তগুলি যদি পার্শ্বাপার্শ্বি করিয়া

রাখিতে পারা যাইত, তাহা হইলে দেখা যাইত যে, তাহাদের মোট আয়তন প্রায় আধ হাত লম্বা ও আধ হাত চৌড়া, অর্থাৎ আমাদের শরীরের বর্গ আধ হাত স্থান হইতে সর্ব্বদা ঘর্ম্ম নিঃসরণ হইতেছে। আর যদি নলগুলি মুখামুখি করিয়া জোড়া দেওয়া যাইত, তাহা হইলে প্রায় চৌদ্দ ক্রোশ লম্বা হইত। কলিকাতার ভবানীপুর হইতে হুগলী পর্য্যন্ত যত পথ প্রায় তত দূর দীর্ঘ হইত।

এত বৃহৎ কাণ্ড—এত শিল্পনৈপুণ্য কেন? শরীরের জল ও বিষাক্ত পদার্থ বাহির করিবার জন্য। রাত্রিদিন এই সকল ঘর্ম্মকূপ দিয়া জলীয় বাষ্প বাহির হইতেছে, বাহির হইয়া বাষ্পাকারে উড়িয়া যাইতেছে, তাই রাত্রিদিন আমাদের যে ঘর্ম্ম হয়, তাহা দেখিতে পাই না। কিন্তু কখন কখন এত প্রচুর পরিমাণে বাষ্প বাহির হয় যে, তাহার অধিকাংশ জমিয়া বড় বড় জলের ফোটা হইয়া সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া পড়িতে থাকে; তখনই কেবল ঘর্ম্মকে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাই দৃশ্য ঘর্ম্ম। সমস্ত দিন রাত্রিতে এই রূপে প্রায় এক সের জল দৃশ্য ও অদৃশ্য ঘর্ম্ম হইয়া উড়িয়া যায়।

ঘর্ম্মের জল পরিষ্কার নহে। ঘর্ম্মে যে জল বাহির হয়, তাহার সঙ্গে নানা প্রকার দূষিত বা বিষাক্ত পদার্থ থাকে। এই সকল বিষাক্ত পদার্থ বাহিরে আসিয়া চর্ম্মের উপর লাগিয়া থাকে, তখন যদি জল দিয়া ধৌত করিয়া, বস্ত্র বা গামছা দ্বারা পুঁছিয়া ফেলা যায় ভালই, নতুবা তাহারা ঘর্ম্মকূপের মুখ বন্ধ করিয়া দেয়। এই-রূপে সমস্ত দিবসে প্রায় অর্দ্ধ তোলা ওজনের বিষাক্ত পদার্থ বাহির হইয়া যায়। যদি বার্ণিস্ বা অন্য কোন পদার্থ দ্বারা সমস্ত শরীর এরূপ আবৃত করা যায় যে, লোমকূপ বন্ধ হইয়া যায় ও ঘর্ম্ম বাহির হইতে না পায়, তাহা হইলে, নিশ্বাস বন্ধ হইলে

যেমন প্রাণিগণ মরিয়া যায়, ইহাতেও ঠিক সেইরূপ অতি শীঘ্র মরে।

চর্ম্মের ভিতর যেমন ঘর্ম্মকূপ আছে, সেইরূপ আর এক প্রকার নল আছে, তাহা দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে তৈলাক্ত পদার্থ বাহির হইয়া চর্ম্মকে স্নিগ্ধ রাখে। ইহাদিগকে তৈলকূপ কহা যায়। উষ্ণপ্রধান দেশবাসী কৃষ্ণবর্ণ মনুষ্যগণের শরীর এই তৈল-পদার্থ দ্বারা স্নিগ্ধ থাকা যত প্রয়োজনীয়, শীতপ্রধান দেশবাসি-গণের পক্ষে তত নহে; তজ্জন্য করুণাময় ও মিতব্যয়ী বিধাতা উষ্ণদেশীয় লোকের শরীরে এই সকল তৈলকূপ যত দিয়াছেন, শীতপ্রধান দেশবাসিগণের শরীরে তত দেন নাই।

এই দুই কার্য্য ভিন্ন, চর্ম্ম দ্বারা তাপের পরিমাণ ঠিক থাকে, তাহা অষ্টম অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। চতুর্থতঃ, চর্ম্ম দ্বারা শোষণ কার্য্য হয়। ঘষিয়া ঘষিয়া তৈল মাখিলে শরীরের ভিতর প্রবেশ করে এ কথা কেহই অবিশ্বাস করেন না। একাদশীর দিবস তৃষ্ণাতুরা বিধবারা স্নান করিয়া কিয়ৎ পরিমাণে তৃষ্ণা নিবারণ করেন এবং সমুদ্রমধ্যে নাবিকগণের পরিষ্কার জলের অভাব হইলে তাহারা সমুদ্রের লবণাক্ত জলে বস্ত্র ভিজাইয়া ঐ বস্ত্র পরি-ধান করিয়া কথঞ্চিৎ পিপাসা নিবারণ করিতে সমর্থ হয়। এই সকল দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, চর্ম্ম দ্বারা শোষণ কার্য্য সম্পন্ন হয়।

উপরে চর্ম্মের যে চারিপ্রকার কার্য্য বর্ণনা করা হইল, তদ্ব্য-তীত চর্ম্ম দ্বারা আর এক অতি প্রধান কার্য্য হইয়া থাকে; ইহাকে স্পর্শ কহে এবং এই কার্য্য করিবার ক্ষমতা থাকাতে চর্ম্মকে স্পর্শেন্দ্রিয় কহা যায়। এক্ষণে স্পর্শেন্দ্রিয়ের বিশেষ বিবরণ প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

স্পর্শেন্দ্রিয়।

কোন পদার্থ শরীরকে স্পর্শ করিলে যে ইন্দ্রিয় দ্বারা তাহা বুঝিতে পারা যায়, তাহাকেই স্পর্শেন্দ্রিয় কহে। চর্ম্মই ইহার প্রধান স্থান। জিহ্বা নাসিকাদি ইন্দ্রিয় দ্বারাও স্পর্শজ্ঞান অল্প পরিমাণে লাভ হয়।

আমাদিগের বাহ্যত্বকের অব্যবহিত নিম্নে নিম্নত্বকে অসংখ্য স্পর্শগ্রন্থি আছে। যদি কোন কারণে উপরের চর্ম্ম উঠিয়া যায় তাহা হইলে নীচে যে লালবর্ণের চর্ম্ম দেখা যায় উহাই নিম্নত্বক্। এই ত্বক্ ঈষৎ স্ফীত হইয়া অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুলের কুঁড়ির ন্যায় আকার ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ইহাদিগকেই স্পর্শগ্রন্থি কহে। যেখানে এই সকল গ্রন্থি অধিক, সেই খানেই স্পর্শশক্তি বলবতী। করতল ও পদতলে ইহাদের সংখ্যা অধিক বলিয়া এই দুই স্থলে স্পর্শশক্তি অপেক্ষাকৃত অধিক। মনোযোগ করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, আমাদের করতল বা হাতের তেলোতে শত শত সরু সরু রেখা পার্শ্বাপার্শ্বিভাবে চতুর্দ্দিকে গিয়াছে। এই সকল রেখা আর কিছুই নহে, কেবল বহুসংখ্যক স্পর্শগ্রন্থি শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান থাকাতে রেখার মত দেখাইতেছে। ভাল করিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, প্রত্যেক রেখা কেবল বিন্দু বিন্দু উচ্চস্থানের সমষ্টি মাত্র। শরীরের সর্ব্ব-স্থানে বিস্তৃত এই সকল স্পর্শগ্রন্থির মধ্যে অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বহু-সংখ্যক স্নায়ুসূত্র প্রবিষ্ট হইয়া থাকাতেই স্পর্শগ্রন্থি সকলের স্পর্শবোধশক্তি আছে।

স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা আমরা জগতের প্রায় সকল পদার্থেরই আকার, পরিমাণ প্রভৃতি গুণ সকল জ্ঞাত হইয়া থাকি। ইহার

জন্য হস্ত আমাদিগের প্রধান সহকারী। বাস্তবিক অন্যান্য জন্তুর সহিত তুলনায় মনুষ্যের হস্ত যেরূপ চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে সক্ষম, করতল যেরূপ স্পর্শগ্রন্থিবিশিষ্ট এবং সেইজন্য জড় বস্তুর সমগ্র গুণ জানিতে সমর্থ, তাহাতে স্পষ্টই বোধ হয় যে, হস্ত না থাকিলে আমরা পদার্থ সকলের দৈর্ঘ্য, বিস্তার, কোমলতা, কাঠিন্য প্রভৃতি গুণ জানিতে কখনই এত সমর্থ হইতাম না। কারণ, চক্ষুদ্বারা পদার্থ সকলের সমগ্র গুণ জানাও যায় না এবং এই সকল গুণ সম্বন্ধে যত ভ্রম উৎপন্ন হয়, হস্ত না থাকিলে তাহার সংশোধনও হয় না।

যখন কোন পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন অংশ শরীরের চর্ম্মস্থ স্পর্শ-গ্রন্থির সহিত একত্রিত হয়, তখন ঐ ক্রিয়াকে "সামান্য স্পর্শ" কহে। বিস্তৃত স্থানে জোরে স্পর্শ করাকে 'চাপ দেওয়া' বলে এবং অল্প স্থানে জোরে স্পর্শ করাকে 'বিঁধিয়া দেওয়া' কহে।

ভিন্ন ভিন্ন স্থানের স্পর্শ অনুভব করিবার শক্তি কত তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য পণ্ডিতগণ শরীরস্থ দুইটী বিন্দু কত নিকটে থাকিলেও তাহাদিগকে দুইটী বিভিন্ন বিন্দু বলিয়া অনুভব করিতে পারা যায়, তাহাই দেখিয়া থাকেন। শিক্ষার্থিগণ একটী খড় লইয়া দ্বিখণ্ডিত করিয়া তাহার উভয় প্রান্ত মুখামুখি করিয়া শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে লাগাইলে জানিতে পারিবেন যে, মধ্যমা অঙ্গুলির প্রান্তভাগ ও জিহ্বার অগ্রভাগ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্পর্শ-গ্রাহক। এই দুই স্থানে খড়ের উভয় প্রান্ত যদি $\frac{1}{12}$ ইঞ্চ দূরে থাকে, তাহা হইলেও তাহাদিগকে দুই বিভিন্ন বিন্দু বলিয়া বোধ হয়। ইহার পর যথাক্রমে ওষ্ঠাধরের মধ্যভাগ, জিহ্বার উপরি-

ভাগ প্রভৃতি স্থান স্পর্শগ্রাহক। গ্রীবা, বাহু ও উরুর মধ্যভাগ সর্ব্বাপেক্ষা অল্প স্পর্শগ্রাহক *।

একই প্রকৃতির পদার্থ অল্প স্থান স্পর্শ করিলে যেরূপ স্পর্শানুভব হয়, অপেক্ষাকৃত অধিক স্থান স্পর্শ করিলে ঐ পদার্থকে তদপেক্ষা আরও তীব্র বলিয়া বোধ হয়। যদি উষ্ণজলপূর্ণ পাত্রমধ্যে একটী অঙ্গুলী ডুবান যায়, তাহা হইলে ঐ জলকে যে পরিমাণে উষ্ণ বলিয়া বোধ হয়, হাতখানি সমুদায় ডুবাইলে তদপেক্ষা অধিক উষ্ণ বলিয়া বোধ হইবে। এই জন্যই উষ্ণজলে স্নান করিবার সময় আমরা কখন কখন নির্ব্বোধ হইয়া পড়ি। যে জলে হাত দিয়া গাত্রে সহিবে বলিয়া বোধ হয়, গাত্রে ঢালিয়া দেখি যে, তাহার উষ্ণতা অসহনীয়।

জড়পদার্থের প্রাকৃতিক গুণ সকলের অধিকাংশই আমরা স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞাত হই বটে, কিন্তু শরীরস্থ মাংসগুলিও এতদ্বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করে। যে ছাগমাংস অনেকেই ভক্ষণ করিয়া থাকেন, তাহা যেমন পুষ্ট এবং জীবিত ছাগের শরীরে কার্য্যক্ষম, আমাদের মাংস তদপেক্ষা অধিক মোটা ও কার্য্যক্ষম; অধিকন্তু আমাদের মাংসগুলির স্পর্শানুভব-শক্তির সাহায্যে আমরা ভারী পদার্থ তুলিতে, ঠেলিতে বা বহন করিতে কিরূপ শক্তির আবশ্যক হইবে, তাহা ঐ পদার্থ স্পর্শ করিয়া হিসাব করিয়া লই। কিন্তু এই হিসাব করার কার্য্য যে কেবল স্পর্শেন্দ্রিয়ের স্পর্শ অনুভব করিবার শক্তি বা মাংসের ভার অনুভব

* পরীক্ষাকালে খড়ের প্রান্তদ্বয় যেন অধিক চাপ দিয়া (শরীরের উপর) বসান না হয়; কারণ, তাহা হইলে দূরস্থিত স্নায়ুসূত্র সকল উদ্দীপিত হইবে এবং কম স্পর্শগ্রাহক স্থানেও অপেক্ষাকৃত অধিক স্পর্শ অনুভূত হইবে।

করিবার শক্তি দ্বারা সম্পন্ন হয় এমনও নহে। এই কার্য্যে স্পর্শেন্দ্রিয় ও মাংসকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত মনও সর্ব্বদা ব্যস্ত। কোন্ বস্তু নাড়িতে কত বল আবশ্যক হইবে, তাহা পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা বশতঃ মন জানিতে পারিয়া মাংসমধ্যে তদুপযুক্ত বল প্রেরণ করে। দৃষ্টান্ত। যদি একটী এক মণ বা দেড় মণ ওজনের লৌহ-মুদ্গরকে ভ্রমবশতঃ কাষ্ঠনির্ম্মিত মুদ্গর ভাবিয়া তুলিতে যাই, তাহা হইলে ঐ মুদ্গর নিশ্চয়ই পড়িয়া যাইবে; কারণ, মাংসের যেরূপ বলে ইহা উত্তোলন করা উচিত ছিল, তদপেক্ষা অল্প পরিমাণ বল প্রযুক্ত হইয়াছে। সকলেই দেখিয়াছেন যে, অন্ধকারে সিঁড়িতে নামিতে গিয়া, আমরা সময়ে সময়ে সকল ধাপগুলি নামিয়া আরও ধাপ আছে ভাবিয়া, যেই আরও নামিবার চেষ্টা করি, সেই সম্মুখের ভূমিতে পা ঘষিয়া যায়। এই সকল স্থলে স্পর্শেন্দ্রিয় ও মাংসের স্পর্শ অনুভব করিবার শক্তি ঠিক আছে, অথচ মনের ভ্রান্ত বিচার বশতঃ তাহা দ্বারা উপযুক্ত সাহায্য পাইলাম না বলিয়াই ক্লেশ পাই।

কেবল ইহাই নহে। মনের সাহায্য ব্যতীত আদৌ স্পর্শজ্ঞানই লাভ করা অসম্ভব। তুমুল যুদ্ধের সময় যোদ্ধৃগণ সংগ্রাম-কার্য্যে এত ব্যস্ত থাকেন যে, কেহ কেহ শত্রুকর্ত্তৃক গুরুতররূপে আহত হইয়াও বহুক্ষণ পর্য্যন্ত জানিতে পারেন না। ঘরের ভিতর বসিয়া অন্যমনস্ক থাকিলে ঘরে ঘড়ি বাজিলে শুনিতে পাওয়া যায় না, বা লোক আসিলে দেখিতে পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে অতিশয় মনঃসংযোগ করিলে সামান্য স্পর্শজ্ঞানও অধিক বলিয়া বোধ হয়। যে সকল পীড়ায় বেদনাই প্রধান

লক্ষণ, তাহা যে রাত্রিতে বাড়ে, অত্যন্ত মনঃসংযোগ ভিন্ন তাহার অন্য কোন কারণই নাই।

একই সময়ে বহু স্পর্শজ্ঞান লাভ অপেক্ষা যথাক্রমে এক একটী পদার্থ স্পর্শ করিলে, স্মরণ-শক্তির সাহায্যে তাহাদের আপেক্ষিক তীব্রতা অনুভব করিতে পারা যায়। যথা, দুইটী গুরু পদার্থ দুই হাতে অনুভব না করিয়া প্রথমে একটী ও তৎপরে অন্যটী গ্রহণ করিলে কোন্‌টী অপেক্ষাকৃত ভারী, তাহা ভালরূপ জানিতে পারা যায়।

তুলনা করিয়া স্পর্শ অনুভব করিলে পদার্থের তীব্রতা যথার্থ অপেক্ষাও অধিক বোধ হয়। ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে বায়ু সেবন করিতে বসিলে অপেক্ষাকৃত উষ্ণ বায়ুকেও শীতল বলিয়া বোধ হয় এবং উৎকট যন্ত্রণার কিঞ্চিন্মাত্রও হ্রাস হইলে সুখ বলিয়া বোধ হয়।

বাহ্য পদার্থ দ্বারা যেরূপ স্পর্শজ্ঞান লাভ হয়, কোন পদার্থ উপস্থিত না থাকিলে শারীরিক বা মানসিক অবস্থাবিশেষে ঠিক তদ্রূপ জ্ঞান হইয়া থাকে। জ্বরের সময় শীত ও গাত্রদাহ, এবং নিদ্রিতাবস্থায় রেতঃপাত ইহার প্রমাণস্থল। অপিচ, ধর্ম্ম কথা ও ভয়ের কথায় যে লোমহর্ষণ হয়, ঘৃণিত পদার্থের কথায় যে বমনেচ্ছা হয়, ভীরু লোকে রাত্রিতে একাকী থাকিলে যে ভূত প্রেত দেখিতে পায়, ও অন্যান্য বহুস্থলে যে পদার্থ ব্যতিরেকে স্পর্শবোধ হয়, তাহাতে স্পষ্টই দেখা যায় যে, বাহ্য পদার্থের ন্যায় মন দ্বারাও স্পর্শজ্ঞানোৎপন্ন হয়।

স্বাভাবিক স্পর্শক্রিয়ায় স্নায়ুসূত্র সকলের পরস্পরের ক্রিয়ার মিলন বা সাম্য আবশ্যক। যখন ইহার বিপর্য্যয় হয়, তখন

ফলের অতিশয় কৌতুকাবহ তারতম্য উপস্থিত হয়। যদি একটী মটর এক হস্তের করতলে রাখিয়া অন্য হস্তের তর্জ্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলীদ্বয়ের মধ্যে ঘূরাণ যায়, তাহা হইলে একটী মটর বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু যদি মধ্যমা অঙ্গুলীর উপর দিয়া তর্জ্জনীকে বাঁকাইয়া ধরা যায় এবং এই অবস্থায় তর্জ্জনীর সম্মুখ ও মধ্যমার পশ্চাৎ এই উভয় স্থানের মধ্যে মটরটীকে ঘূরাণ যায়, তাহা হইলে তুইটী মটর বলিয়া ভ্রম হইবে।

শরীরের স্থানে স্থানে স্পর্শবোধের বিশেষ ব্যবস্থা দেখা যায়। বাহুমূল বা বগল, উরুদেশ, পদতল ও চুচুক এই সকল স্থানের স্পর্শানুভব করিবার শক্তি অঙ্গুলী প্রভৃতি স্থান অপেক্ষা অনেক অল্প; তথাপি কোন প্রকার উত্তেজনা বশতঃ এই সকল স্থান সড়্ সড়্ করে এবং কাহারও বা প্রতিফলিত ক্রিয়া বশতঃ হাসিতে প্রবৃত্তি হয়।

অভ্যাস দ্বারা স্পর্শেন্দ্রিয়ের যে উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে, তাহা অতি বিস্ময়কর। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে অন্ধগণ লেখা পড়া শিখিতে আরম্ভ করিলে, প্রথমতঃ বড় বড় উচ্চ উচ্চ অক্ষরের আবশ্যক হয়। এই সময়ে প্রত্যেক অক্ষরের উপর অন্ধ ছাত্রের কিয়ৎক্ষণ অঙ্গুলী রাখা আবশ্যক করে। ক্রমে উত্তমরূপ বর্ণ-পরিচয় হইলে শিক্ষার্থী এক একটী কথা পড়িতে চেষ্টা করে। তখন আর প্রত্যেক অক্ষরের উপর অধিকক্ষণ অঙ্গুলী রাখিতে হয় না এবং চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি দর্শন করিয়া যত শীঘ্র পড়িতে পারে, তাহারাও, অঙ্গুলী দ্বারা প্রায় তত শীঘ্র পারে। তখন তাহারা এত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষর পড়িতে সমর্থ হয় যে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয়ের ক, খ, অক্ষর অপেক্ষা ক্ষুদ্র অক্ষরেও চলিতে পারে।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

নাসিকা, ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও আঘ্রাণ।

নাসিকার নিকট গোলাপ পুষ্প ধরিলে অথবা গলিত নর্দ্দমার নিকট দাঁড়াইলে এক একটী বিশেষ বিশেষ গন্ধ পাওয়া যায়। এই গন্ধ আঘ্রাণ করা একটী স্নায়ুর কার্য্য। কিন্তু চক্ষু কর্ণ জিহ্বাতেও স্নায়ু আছে, তবে কেন গোলাপ ফুল চর্ব্বণ করিলে জিহ্বা সে ঘ্রাণ না পায়? কর্ণের নিকট ধরিলে কর্ণ কেন সে গন্ধ না পায়? ইহারউত্তর এই যে, গন্ধ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত একটী বিশেষ স্নায়ু আবশ্যক; সেই স্নায়ু কেবল নাসিকাতেই আছে—অন্যত্র নাই; সুতরাং নাসিকা ভিন্ন অন্য কোন স্থানে গন্ধ পাওয়া যায় না। যদি নাসিকাতে এই স্নায়ু না থাকিত, তাহা হইলে আমরা সকল পদার্থ দর্শন করিতাম, আস্বাদ জানিতাম ও পদার্থের অন্যান্য গুণ জানিতে পারিতাম; কিন্তু কোন দ্রব্যেরই গন্ধ পাইতাম না। যে বিশেষ স্নায়ু দ্বারা আমরা গন্ধ আঘ্রাণ করি, তাহার নাম "গন্ধগ্রাহী" স্নায়ু। নাসিকার ভিতর অঙ্গুলী প্রবেশ করাইলে যে কোমল শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী স্পর্শ করা যায়, সেই স্থানের সর্ব্বত্র গন্ধগ্রাহী স্নায়ুর শাখা প্রশাখা বিস্তৃত হইয়া আছে; তাহাতেই গন্ধ আঘ্রাণ করিতে পারি। এই শ্লেষ্মাময় স্থানের নাম শৈষ্মানত্বক্।

গন্ধ কাহাকে কহে? পুষ্পের যে গন্ধ, তাহা কি পুষ্পের মধ্যস্থিত কোন পদার্থ, অথবা পুষ্পের বর্ণ যেমন একটী গুণ, সেইরূপ ইহাও একটী গুণ? ইহার উত্তর এই যে, গন্ধ নিজে

কোন পদার্থ নহে; পুষ্পে গন্ধ নাই, গন্ধ আমাদিগের মনে জন্মায়। কিন্তু মন এই গন্ধ জানিতে চাহিলে, নাসিকার ভিতর গন্ধগ্রাহী স্নায়ুর উপর পুষ্পের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেণু আসিয়া পড়া আবশ্যক। গন্ধগ্রাহী স্নায়ুর উপর এইরূপে রেণু পড়িলে যে, স্পর্শ বোধক ভাব উৎপন্ন হয়, তাহা মস্তিষ্কের ভিতর প্রবেশ করিয়া মনকে জানাইয়া দেয় যে, দূরে বা নিকটে গন্ধবিশিষ্ট পদার্থ রহিয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের রেণু দ্বারা গন্ধগ্রাহী স্নায়ুর ভিন্ন ভিন্ন গন্ধজ্ঞান হয় এবং মন সেই গন্ধজ্ঞান স্মরণ করিয়া রাখিতে পারে, সেই জন্যই আমরা পদার্থ না দেখিয়াও বলিতে পারি, 'ঘৃত পোড়ার গন্ধ কোথা হইতে আসিতেছে?' 'চাঁপাফুলের গন্ধ পাইতেছি', 'এখানে কোথাও মৃতজন্তু পচিয়াছে, তাহার বড় দুর্গন্ধ আসিতেছে' ইত্যাদি।

আঘ্রাণের নিয়ম।

আঘ্রাণ কার্য্য সম্পন্ন হইবার জন্য নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয় অতিশয় আবশ্যক :—

প্রথমতঃ। আমাদিগের চতুর্দ্দিকের বাতাসের ভিতর দিয়া পদার্থের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেণু আসিয়া নাসিকার ভিতর পড়া আবশ্যক। যদি পচা দুর্গন্ধময় দ্রব্য অথবা অতিশয় সুগন্ধিদ্রব্য কৌটার ভিতর পূরিয়া এত সাবধানে বন্ধ করা যায় যে, বাহিরের বায়ুর সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক না থাকে, তাহা হইলে ঐ দ্রব্যের গন্ধ পাওয়া যাইবে না, কিন্তু কৌটা খুলিয়া ঘরে রাখিলেই গন্ধ বাহির হইবে।

দ্বিতীয়তঃ। নাসিকার ভিতর কিয়ৎ পরিমাণে শ্লেষ্মা থাকা আবশ্যক। পদার্থের রেণু সকল এই শ্লেষ্মাতে গলিয়া গন্ধগ্রাহী

স্নায়ুর উপর উত্তমরূপে লাগিয়া যায়। এই শ্লেষ্মা না থাকিলে ঐ সকল রেণু গলিতে না পাইয়া স্নায়ুর উপর ভালরূপ লাগে না, সুতরাং গন্ধবোধও হয় না। সর্দ্দির প্রথম অবস্থায় যখন নাসিকার ভিতর শুষ্ক ও শ্লেষ্মাহীন হয়, তখন এই জন্যই কোন দ্রব্যের গন্ধ ভালরূপ পাওয়া যায় না।

তৃতীয়তঃ। এই শ্লেষ্মার পরিমাণ সমান সমান থাকা আবশ্যক। অধিক শ্লেষ্মা থাকিলে রেণু সকল তাহাতেই বাধিয়া যায়, স্নায়ুর উপর লাগিতে পায় না, তাহাতেও আঘ্রাণের ব্যাঘাত হয়। এই জন্য সর্দ্দি থাকিলেও সময়ে সময়ে গন্ধ পাওয়া যায় না।

পদার্থের রেণুগুলি যদি বেগে নাসিকার ভিতর প্রবেশ করে, তাহা হইলেই উত্তমরূপ গন্ধ পাওয়া যায়। এই জন্যই কোন পদার্থের ঘ্রাণ বিশেষরূপে লইতে হইলে আমরা সেই পদার্থের উপর জোরে নিশ্বাস টানি; ইহাতে অনেকগুলি রেণু সজোরে নাসিকার ভিতর প্রবেশ করিয়া গন্ধগ্রাহী স্নায়ুর উপর আঘাত করে, এবং সেই জন্যই আমরাও এইরূপ করাতে তীব্র গন্ধ আঘ্রাণ করি।

আঘ্রাণ করিবার ক্ষমতা সকল জন্তুর সমান নহে। শ্বাপদ জন্তুগণ অন্য জন্তুর গন্ধ এত ঘ্রাণ করিতে পারে যে, অনেক সময়ে কেবল গন্ধ ঘ্রাণ করিয়া বহু দূর গিয়া পশুহনন করে। তাহাদের ঘ্রাণশক্তি এত প্রবল না হইলে দূরে পলায়িত বধ্যজন্তুকে ধরিতে পারিত না। এই সকল জন্তু উদ্ভিদের গন্ধ ঘ্রাণ করিতে তত পটু নহে। পক্ষান্তরে, উদ্ভিদ্‌ভোজী জন্তুগণ জন্তুগণের গন্ধ অধিক পায় না, কিন্তু উদ্ভিদের গন্ধ অতিশয় আঘ্রাণ করিতে পারে। মনুষ্য এই দুইয়ের মধ্যবর্ত্তী। কারণ, আমরা যদিও কোন একটী

গন্ধ বিশেষ তীব্ররূপে পাই না বটে, তথাপি প্রায় সকল দ্রব্যেরই গন্ধ কিছু কিছু আঘ্রাণ করিতে পারি।

সুগন্ধ দুর্গন্ধ ও গন্ধহীনতা।

এক প্রকার গন্ধ আঘ্রাণ করিলে কেন সুখ হয়, আর অন্য এক প্রকার গন্ধ আঘ্রাণ করিলে কেন ক্লেশ হয়, তাহা বলা যায় না। কিন্তু সুগন্ধ ও দুর্গন্ধের মধ্যে প্রকৃতিগত বিভেদ বড় অধিক নাই। এরূপ দেখা যায় যে, একজন যে গন্ধকে দুর্গন্ধ বলে, অন্যের নিকট তাহা সুগন্ধ বলিয়া বোধ হয়। পিঁয়াজ রসুন ও হিং ইহার দৃষ্টান্ত। এই তিন পদার্থের গন্ধ অনেকের নিকট উত্তম ও অনেকের মতে অতি জঘন্য। এই প্রকার গন্ধ বহুকাল আঘ্রাণ করিলে গন্ধগ্রাহী স্নায়ু আর উহা দ্বারা উত্তেজিত হয় না। সুতরাং উহা সগন্ধ হইলেও নির্গন্ধ বলিয়া বোধ হয়। যথা ধনীগণ অনেক সময়ে সুগন্ধ আঘ্রাণ করেন বলিয়া সুরভি পদার্থ আঘ্রাণ করিয়াও হৃষ্ট হন না, দরিদ্রগণ কদাচিৎ ঐরূপ আঘ্রাণ করিতে পান বলিয়া পরম আহ্লাদিত হয়েন। আবার যে সকল দরিদ্র দুর্গন্ধময় স্থানে বাস করেন, বহুকাল আঘ্রাণ করাতে ঐ সকল দুর্গন্ধ বশতঃ তাঁহাদের আর ক্লেশ বোধ হয় না।

কখন কখন এরূপ দেখা যায় যে, একজন যে গন্ধ পাইল, অন্যে তাহা পাইল না। গন্ধদ্রব্যের সঙ্গে গন্ধগ্রাহী স্নায়ুর মিল না হইলে এইরূপ হওয়া সম্ভব। যে ব্যক্তি সঙ্গীত কিছুই বুঝে না, সে যেমন তানলয় বিশুদ্ধ সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া আহ্লাদিত হয় না, ইহাও সেইরূপ। ইষ্টক বা কয়লার সূক্ষ্ম চূর্ণ এবং কিংশুক বা কর্ণিকা পুষ্পের রেণু শৈষ্মানত্বকে পতিত হইলেও গন্ধ পাওয়া যায় না, জল ও বায়ুর কোন গন্ধই নাই, এই জন্য

এই সকল পদার্থকে নির্গন্ধ পদার্থ কহে। এই সকল পদার্থ গন্ধ-গ্রাহী স্নায়ুকে কেন উদ্দীপিত করিতে পারে না, অথচ এক বিন্দু আতর কয়েক সপ্তাহ পর্য্যন্ত এবং অর্দ্ধ রতি পরিমাণ মৃগনাভি বহু বৎসর পর্য্যন্ত কেনই বা গন্ধ প্রদান করিতে পারে, তাহার কারণ বলা যায় না।

জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির অনেক বয়স পর্য্যন্ত গন্ধগ্রহণের ক্ষমতা ছিল; কিন্তু একদা তিনি অশ্ব হইতে পতিত হইয়া অতিশয় আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; সেই অবধি তিনি আর কোন পদার্থেরই গন্ধ অনুভব করিতে পারেন না। এ স্থলে আঘাত বশতঃ গন্ধগ্রাহী স্নায়ু যে বিকারপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহাতে অবশিষ্ট জীবনের জন্য তাহার নিজ কার্য্য করিবার ক্ষমতা তিরোহিত হইয়াছে।

আঘ্রাণের উপকারিতা।

আঘ্রাণ কার্য্য দ্বারা এই তিনটী উপকার হয়। (১) সুগন্ধ আঘ্রাণ দ্বারা সুখানুভব হয়। (২) দুর্গন্ধ আঘ্রাণ করিলেই নাসা-রন্ধ্র বন্ধ করিতে স্বতঃই প্রবৃত্তি হয়, বন্ধ করাতে উপকার এই হয় যে, দূষিত বায়ু নাসাপথে প্রবেশ করিতে পায় না, সুতরাং ফুস্‌ফুসে গিয়া রক্তকে বিযাক্ত করিতেও পারে না। (৩) গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া নানা পদার্থের প্রকৃতি ও গুণাগুণ নির্ণয় করা যায়।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

জিহ্বা, রসনেন্দ্রিয় ও আস্বাদন।

আমরা যে সকল পদার্থ ভক্ষণ করি, দুইটী সুন্দর উপায় থাকাতেই তাহাদের আস্বাদ পাইয়া থাকি। প্রথমতঃ, নাসিকাতে যেমন গন্ধগ্রাহী নামে একটী বিশেষ স্নায়ু থাকাতে গন্ধ জানিতে পারা যায়, সেইরূপ জিহ্বাতে স্বাদগ্রাহী নামে দুইটী স্নায়ুর শাখা প্রশাখা থাকাতে খাদ্য দ্রব্যের আস্বাদ পাওয়া যায়। এই স্নায়ু দুইটী শরীরের বিভিন্ন স্থান হইতে আসিয়া জিহ্বার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিস্তৃত হইয়াছে, কিন্তু ইহাদের উভয়েই স্বাদ গ্রহণ করে বলিয়া উভয়কেই "স্বাদগ্রাহী" কহা যায়। ইহারা না থাকিলে কোন পদার্থেরই আস্বাদ পাওয়া যাইত না। দ্বিতীয়তঃ, যে সকল পদার্থের আস্বাদ আমরা পাই, তাহারা লালার দ্বারা গলিয়া স্বাদগ্রাহী স্নায়ুর উপর লাগে বলিয়াই আস্বাদ পাইয়া থাকি।

মিশ্র ও অমিশ্র স্বাদ।

মনুষ্যের অন্যান্য সকল ইন্দ্রিয় অপেক্ষা স্পর্শেন্দ্রিয়ের সহিত আস্বাদের অধিক সম্বন্ধ। সর্ষপ, লঙ্কা মরিচ ও কয়েক প্রকার তৈলের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিলে আমরা ইহা বুঝিতে পারি। লঙ্কা মরিচ বা সর্ষপের গুঁড়া গাত্রে ঘর্ষণ করিলে যেরূপ জ্বালা বোধ হয়, চর্ব্বণ করিলে মুখের অভ্যন্তরেও সেইরূপ তীব্রতা অনুভব করা যায়। কেবলমাত্র বিভেদ এই যে, চর্ব্বণ করিলে ইহাদের গন্ধ পাওয়া যায়, গাত্রে ঘর্ষণ করিলে তেমন গন্ধ পাওয়া যায়

না। এইজন্য পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, মিষ্ট যেমন একটী বিশেষ আস্বাদ, ঝাল প্রভৃতি কয়েকটী আস্বাদ সেরূপ নহে। জিহ্বার উপর ঝাল স্পর্শ বশতঃ যে জ্বালা উৎপন্ন হয় এবং সেই সময়ে ঝাল পদার্থের যে গন্ধ পাওয়া যায় এই দুইটী একত্রিত করিয়া আমরা "ঝালের আস্বাদ" বলিয়া থাকি। বস্তুতঃ ইহা কেবল জ্বালা ও গন্ধ অর্থাৎ স্পর্শেন্দ্রিয় ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের কার্য্যের সমষ্টি মাত্র—অমিশ্র স্বাদ নহে। এইজন্য এই সকল দ্রব্যকে "মিশ্র স্বাদু" পদার্থ কহা যায়। সকল পদার্থ এরূপ নহে। কতকগুলি পদার্থের আস্বাদের সহিত স্পর্শ বা গন্ধ এতদুভয়ের কোনটীরই সম্পর্ক নাই। কুইনাইন বা চিরেতার তিক্ত আস্বাদ, চিনির মিষ্টতা, ও লবণের আস্বাদ এই শ্রেণীভুক্ত। এইজন্য ইহাদিগকে "অমিশ্র" বা 'বিশুদ্ধ স্বাদু' পদার্থ কহে। অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের বিনা সাহায্যে ইহাদের আস্বাদ পাওয়া যায়।

খাদ্য দ্রব্যের আস্বাদের সঙ্গে গন্ধের অতি নিকট সম্পর্ক। যে পদার্থ সুগন্ধ মসলাযুক্ত করিলে খাইতে অতি উত্তম হয়, তাহাই বিনা গন্ধে বিস্বাদ বোধ হয় ইহা সকলেই জানেন। যে সকল পদার্থ আমরা রন্ধন করিয়া ভক্ষণ করি তাহার প্রায় কোনটীই বিশুদ্ধ স্বাদু পদার্থ নহে। তাহাদের গন্ধ ও জিহ্বার উপর ঘর্ষণজনিত প্রীতিকেই সুস্বাদ বলিয়া থাকি।

স্বাদের স্থায়িত্ব।

কোন কোন পদার্থ ভক্ষণ করার পর কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত জিহ্বার উপর আস্বাদ থাকে। ইহাতে এই জানা যায় যে, হয় সেই পদার্থের কিয়দংশ তখনও জিহ্বায় লাগিয়া আছে তাহাতেই স্নায়ুর উদ্দীপনা হইয়া আস্বাদ বোধ হইতেছে, অথবা যাহা

খাইয়াছিলাম তাহার কিছুই লাগিয়া নাই কিন্তু তাহার উদ্দীপনা বা উত্তেজনা স্বাদগ্রাহী স্নায়ুর উপর এখনও কার্য্য করিতেছে। যে সকল পদার্থের এই গুণ আছে তাহাদের ভক্ষণ করার পর অন্য পদার্থ আস্বাদ করিলে এই দ্বিতীয় পদার্থের আস্বাদের তারতম্য হয়। এইজন্য গুড় খাইয়া পায়স ভক্ষণ করিলে পায়সের মিষ্টতা পাওয়া যায় না; কারণ গুড়ের তীব্র মিষ্টতা স্বাদগ্রাহী স্নায়ুদ্বয়কে এত উদ্দীপিত করিয়াছে যে পায়সের ক্ষীণ মিষ্টতায় ততদূর পারে না। পক্ষান্তরে অন্য কতকগুলি পদার্থ আছে তাহাদের একটীর আস্বাদ অন্যটীকে তীব্র করিয়া তুলে। এইরূপে নারিকেল ও মুড়ি, ক্ষীর ও কাঁটাল প্রভৃতি বিবিধ খাদ্য আমরা বিজ্ঞান পাঠ না করিয়াই একত্রে খাইতে শিক্ষা করি। দর্শনেন্দ্রিয় সম্বন্ধে যেমন একটী বর্ণ আর একটীকে উজ্জ্বল করিয়া তুলে, তেমনি রসনেন্দ্রিয় বিষয়েও দুই বিভিন্ন আস্বাদের পরস্পরের উদ্দীপক ক্ষমতা আছে।

বহুক্ষণ একটী বর্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে যেমন ঐ বর্ণকে ক্রমে ক্ষীণ বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ বহুদিন এক পদার্থ আস্বাদ করিলে তাহার তীব্রতা ক্রমেই কম বোধ হয়। একই প্রকার খাদ্য পদার্থ বহুদিন ক্রমান্বয়ে ভক্ষণ করিলে যে তাহাকে পূর্ব্ববৎ সুস্বাদু বোধ হয় না তাহার কারণ এই যে, একই পদার্থ প্রথম প্রথম স্বাদগ্রাহী স্নায়ুদ্বয়কে যেরূপ উদ্দীপিত করিতে পারিত, পরে আর সেরূপ পারে না। কিন্তু যে সকল মিশ্র ও অমিশ্র স্বাদু পদার্থ স্বাদগ্রাহী স্নায়ুর যথেষ্ট উদ্দীপক কেবল তাহাদের পক্ষেই এই নিয়ম খাটে, যে সকল পদার্থের উদ্দীপনা শক্তি অধিক নাই অর্থাৎ যাহাদের অধিক স্বাদ নাই, তাহারা এ নিয়-

মের বশ নহে, এই জন্যই ভাত, রুটী, জল, প্রভৃতি পদার্থের প্রতি কোন সুস্থ ব্যক্তিরই কখন অরুচি হয় না।

সুস্বাদ ও বিস্বাদ।

সুস্বাদ ও বিস্বাদ বোধ বহু পরিমাণে শিক্ষা ও অভ্যাসের ফল। ব্রহ্মদেশের বিস্তর লোক গলিত মৎস্য উপাদেয় বোধে ভক্ষণ করেন কিন্তু ঘৃতাদি পদার্থ দুর্গন্ধ বলিয়া খাইতে চাহেন না। ইউরোপীয়গণের অনেক খাদ্য ভারতের লোক পছন্দ করেন না, আবার আমাদের বিস্তর সুখাদ্য ইউরোপীয়গণ খাইতে চাহেন না। এই ভারতের ভিতরে ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে খাদ্য সম্বন্ধে রুচির এতই বৈষম্য যে তাহা কথনই স্বাভাবিক নহে। বংশ-পরম্পরাগত শিক্ষা ও অভ্যাসের ফলমাত্র।

ঘ্রাণশক্তির তারতম্য বশতঃ আস্বাদ বোধের বিভেদ হয়। যাঁহাদের ঘ্রাণশক্তি অধিক তাঁহারা খাদ্য দ্রব্যের আস্বাদ যত উত্তমরূপ বুঝিতে পারেন, অল্প ঘ্রাণশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিরা সেরূপ পারেন না। আবার শারীরিক অবস্থা বিশেষে স্বাদ বোধের তারতম্য হয়। যে পদার্থ বহুদিন খাওয়া হয় নাই তাহা অপেক্ষাকৃত স্বাদহীন হইলেও স্বাদগ্রাহী স্নায়ুর প্রীতিজনক উদ্দীপনা করিতে পারে, এই জন্যই দীর্ঘকালের পর খাইলে তিক্ত কষায় প্রভৃতি আস্বাদযুক্ত খাদ্যও ভাল লাগে, এবং অনশনের পর সামান্য দ্রব্যও উপাদেয় বোধ হয়। পক্ষান্তরে পীড়া, দুশ্চিন্তা প্রভৃতি বশতঃ স্বাদগ্রাহী স্নায়ুর ক্ষমতা এত হ্রাস প্রাপ্ত হয় যে, অত্যুত্তম খাদ্যকেও বিস্বাদ বোধ হয়।

মিষ্ট, তিক্ত, কষায় প্রভৃতি আস্বাদ কিরূপে উৎপন্ন হয় ও বোধ হয়, তাহা অদ্যাপি স্থির হয় নাই। বর্ণের মধ্যে লোহিত,

হরিৎ প্রভৃতি বর্ণ সকল আলোকের গতি বা আন্দোলন বিশেষ দ্বারা উৎপন্ন হয় ইহা জানা গিয়াছে, কিন্তু গন্ধ ও স্বাদের বিষয়ে কোনটী দুর্গন্ধ, কোনটী মিষ্ট, কোনটী তিক্ত কেন বোধ হয় তাহা অদ্যাপি জানা যায় নাই।

খাদ্য দ্রব্য ব্যতীত অন্য উপায়েও আস্বাদ উৎপন্ন হয়। যদি জিহ্বার অগ্রভাগে জোরে টোকা মারা যায় তাহা হইলে কখন ঝাল কখন লবণের ন্যায় আস্বাদ পাওয়া যায়। আবার, যদি জিহ্বার মূলভাগে ঐরূপ করা যায়, তাহা হইলে তিক্ত আস্বাদ পাওয়া যায়।

আস্বাদের উদ্দেশ্য।

আস্বাদ ক্রিয়ার দুইটী উদ্দেশ্য, ১। স্বাদজনিত সুখ-দুঃখাদি জ্ঞান ২। খাদ্য ও অখাদ্য নির্ণয় করা। ইতর জন্তু-গণের মধ্যে এই দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সাধন করিবার শক্তি অতিশয় বলবতী। পর্য্যটকদিগের নিকট অবগত হওয়া যায় যে, বানর প্রভৃতি জন্তুগণ বন মধ্যে অসংখ্য প্রকার ফলভক্ষণ করে, কিন্তু কোন কোন ফল দেখিতে সুন্দর তাহাও খায় না, অথবা মুখে দিয়াই ফেলিয়া দেয়। সময়ে সময়ে এই সকল ফলের গুণ না জানিয়া ভক্ষণ করাতে মনুষ্য পর্য্যন্ত মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়েন। সাধারণতঃ যাহা কিছু সুস্বাদু তাহার অধিকাংশই আমাদের খাদ্য ও শরীরের উপকারী।

অভ্যাস দ্বারা স্বাদ গ্রহণের ক্ষমতা বাড়ান যায়।

ষোড়শ অধ্যায়।

কর্ণ, শ্রবণেন্দ্রিয় ও শ্রবণ।

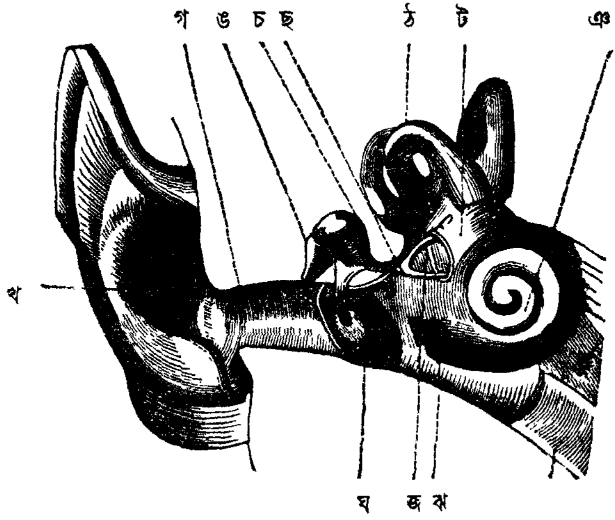
শব্দ শ্রবণ করিবার যন্ত্রদ্বয়ের নাম কর্ণ। দুইদিকের কর্ণেরই গঠন একরূপ। বর্ণনার জন্য প্রত্যেক কর্ণকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়, ইহাদের নাম বাহ্য, মধ্য ও অন্তঃকর্ণ। এক্ষণে এই তিন অংশের গঠন ও কার্য্য যথাক্রমে বর্ণনা করিব।

১। বাহ্যকর্ণের গঠন ও কার্য্য বিবরণ।

দুই দিকের চক্ষের পশ্চাদ্ভাগে যে ঝিনুকের ন্যায় আকার বিশিষ্ট কোমল ও বঙ্কুর যন্ত্রদ্বয় আছে সাধারণতঃ তাহাদিগকেই কর্ণ কহে। এই দুইটীই বাহ্য কর্ণের প্রধান অংশ। ইহাদের মধ্যস্থল দিয়া একটী সরু কলমের অগ্রভাগ প্রবেশ করাইলে ঐ কলম একটি নলের ভিতর দিয়া গমন করে এবং পরিশেষে একখানি পাতলা চর্ম্মের উপর আঘাত করে। এই নলের নাম কর্ণবিবর ও পাতলা চর্ম্মের নাম কর্ণের প্রথম পটহ। বাহিরের ঝিনুকের ন্যায় অংশ হইতে কর্ণপটহ পর্য্যন্ত সমুদায় যন্ত্রটীকে বাহ্য কর্ণ কহা যায়। অতএব বাহ্যকর্ণের দুই অংশ; এক অংশ দেখিতে ঝিনুকের ন্যায় এবং কোমল, বঙ্কুর ও প্রকাশ্য, পরস্পরের মস্তকের দিকে দৃষ্টি করিলে ইহা দেখিতে পাওয়া যায়, অপর অংশ নলবৎ উহাও ঐ দৃশ্য অংশের গর্ত্তের ভিতর দৃষ্টি করিলেই দেখা যায়। আমরা কাণে হাত দিলেই দেখিতে পাই যে, বাহ্য কর্ণের দৃশ্য অংশের উপর হইতে দুইটী উচ্চ বক্র রেখা

নামিয়াছে, হঠাৎ বোধ হয় যেন দুইটী সমকেন্দ্রী বৃত্তার্দ্ধ অঙ্কিত রহিয়াছে। এই দুইটীর নীচে ছাগলের ক্ষুদ্র বাঁটের ন্যায়-ছোট ছোট দুইটী উচ্চ স্থান। এই সকল সীমার মধ্যে একটী প্রশস্ত গর্ত্ত রহিয়াছে, তাহাতেই সমস্ত কর্ণটী বক্র দেখাইতেছে।

নবম প্রতিকৃতি। বামদিকের বাহ্য মধ্য ও অন্তঃকর্ণের গঠন।*



শব্দকে বাতাস হইতে কর্ণপটহ পর্য্যন্ত লইয়া যাওয়াই বাহ্য-কর্ণের একমাত্র কার্য্য। দেখা যাউক এই কার্য্য কিরূপে সম্পন্ন হয়।

* ক, বাহ্য কর্ণের দৃশ্য বা ঝিনুকের ন্যায় অংশ। খ, তন্মধ্যস্থিত গহ্বর। গ কর্ণবিবর। ঘ প্রথম পটহ। ঙ হাতুড়ি হাড়ের মস্তক; বাঁটটী প্রথম পটহে লাগিয়া আছে। চ নেয়াল হাড়, ছ রেকাব হাড়। জ, রেকাব হাড় যে গোল অংশের উপর লাগিয়া আছে উহা দ্বিতীয় পটহ। ঝ প্রবেশ গহ্বরের শেষ। ঞ, শম্বুক নল। ট প্রবেশ গহ্বর আরম্ভ। ঠ অর্দ্ধচন্দ্রাকার নল।

শব্দ প্রবেশের উপায় সমূহ।

যে সকল উপায়ে বাহিরের বাতাস হইতে কর্ণের প্রথম পটহ পর্য্যন্ত শব্দ যাইতে পারে, তাহা তিন শ্রেণীতে বিভাগ করা যায় :—

প্রথমতঃ। কর্ণবিবরের ভিতর দিয়া গমন। এই কার্য্য আবার দুইটী উপায়ে সাধিত হইতে পারে যথা :—

ক। সরল রেথায় প্রবেশ।

খ। প্রতিফলিত ও দ্বিপ্রতিফলিত হইয়া প্রবেশ।

দ্বিতীয়তঃ। শব্দ পরিচালন।

তৃতীয়তঃ। বিবরস্থ বায়ুর প্রতিধ্বনি।

প্রথম শ্রেণীর দুইটী উপায়ের বিষয়ই প্রথমে দেখা যাউক :—

ক। সরল রেথায় প্রবেশ।

কর্ণবিবরেরর ভিতর সরল রেথায় শব্দ প্রবেশ করিলে উহা সর্ব্বাপেক্ষা স্পষ্ট ও উচ্চ বলিয়া বোধ হয়। ইহার দৃষ্টান্ত সকলেই দেখিয়াছেন। যখন দূরের কোন শব্দ শুনিয়া কোন্ দিক হইতে শব্দ আসিতেছে স্থির করিতে ইচ্ছা হয় তখন আমরা কর্ণ ফিরাইয়া যে দিক হইতে শব্দ আসিতেছে সেই দিকে কর্ণবিবর লইয়া যাই এবং পরিশেষে যখন শব্দের স্রোত ও কর্ণবিবর এক সরল রেথায় আগমন করে, তখন সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ শব্দ বোধ হওয়াতে বুঝিতে পারি যে অমুক দিক হইতে শব্দ আসিতেছে।

খ। প্রতিফলিত ও দ্বিপ্রতিফলিত হইয়া প্রবেশ।—শব্দ অনেক সময় সরল রেথায় প্রবেশ করিতে পারে না, কেবল বাহ্য-কর্ণের উপর আসিয়া লাগিতে থাকে। তখন কিরূপে বিবরে প্রবেশ করে? সূর্য্যের আলোক যেমন দর্পণের উপর পতিত

হইয়া বক্রভাবে আমাদের ঘরের ভিতর দেওয়ালে গিয়া পড়ে শব্দও সেইরূপ বাহ্যকর্ণের উপর প্রতিহত হইয়া যখন ফিরিতে থাকে, তখন যে রেখায় আসিয়াছিল ফিরিয়া সে পথে না গিয়া অন্য এক সরল রেখায় কর্ণবিবরে প্রবেশ করে। ইহাকেই প্রতি-ফলিত হইয়া প্রবেশ কহে।

কখন কখন বাহ্যকর্ণের উপরে শব্দ এরূপভাবে পতিত হয় যে, প্রতিফলিত হইয়াও কর্ণবিবরে প্রবেশ করিতে পারে না, কেবল বাহিরের এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গিয়া পড়ে। এই দ্বিতীয় স্থান হইতে পুনরায় প্রতিফলিত হইয়া কর্ণবিবরে প্রবিষ্ট হয়। ইহাকেই দ্বিপ্রতিফলিত হইয়া প্রবেশ করা কহা যায়।

মনুষ্যগণের বাহ্য কর্ণ যেরূপ বন্ধুর ও বক্রভাবে অবস্থিত তাহাতে প্রতিফলিত ও দ্বিপ্রতিফলিত হইয়া শব্দ প্রবেশ করিবার বিশেষ সুবিধা রহিয়াছে। দূরস্থ বা অস্পষ্ট শব্দ শ্রবণ করিবার জন্য সময়ে সময়ে আমরা নিজ নিজ হাত গণ্ডূষ করিয়া কর্ণের পিছনে ধরি; এত বড় গণ্ডূষের ভিতর শব্দ প্রতিফলিত ও দ্বিপ্রতিফলিত হইবার অনেক স্থান হয়, সুতরাং শব্দও অতি সুস্পষ্টরূপ শুনা যায়।

দ্বিতীয়তঃ। শব্দ পরিচালন। উপরি উক্ত দুইটী উপায়ে অতি অল্প শব্দই কর্ণের ভিতর প্রবেশ করিতে পারে, অধিকাংশ শব্দ বাহ্য কর্ণের মধ্য দিয়া পরিচালিত হয়। যেমন ধাতু নির্ম্মিত দণ্ডের এক দিক অগ্নিতে ডুবাইলে তাপ পরিচালিত হইয়া তাহার অপর প্রান্তে গমন করিয়া ঐ দিক উত্তপ্ত করে, সেইরূপ বাহ্য কর্ণের কোন স্থানে শব্দ পতিত হইলে ঐ শব্দ কর্ণের ভিতর দিয়া প্রথম পটহ পর্য্যন্ত গমন করে। যেমন ঢাকের কাষ্ঠময় অংশে জোরে আঘাত করিলে সেই আন্দোলন পরিচালিত হইয়া পার্শ্বের

চর্ম্মময় অংশ পর্য্যন্ত গমন করে ও অল্প অল্প শব্দ উৎপন্ন করে, সেইরূপ বাহ্য কর্ণের উপর শব্দ পতিত হইয়া প্রথম পটহ পর্য্যন্ত পরিচালিত হয়, এবং পটহকেও আন্দোলিত করিয়া তুলে। পাছে এরূপ করিয়াও দুই চারিটী শব্দ নষ্ট হয় এই জন্য বাহ্য কর্ণের ঝিনুকবৎ বন্ধুর অংশের উপর এত উচ্চ নীচ স্থান নির্ম্মাণ করা হইয়াছে যে, শব্দ যে কোন রেখাতেই আসুক না কেন একটী না একটী উচ্চ স্থানের উপর পড়িবেই পড়িবে, এবং পড়িলেই পরিচালিত হইয়া প্রথম পটহ পর্য্যন্ত গমন করিয়া পটহ চর্ম্মকে আঘাত করিবে। উচ্চ নীচ স্থান গুলির ইহা ভিন্ন অন্য কোন আবশ্যকতা দেখা যায় না।

তৃতীয়তঃ। সর্ব্বদাই কর্ণ বিবরে কিয়ৎ পরিমাণে বায়ু সঞ্চিত থাকে। কোন শব্দ বিবরের ভিতর প্রবেশ করিবামাত্র এই বায়ু দ্বারা তাহা প্রতিধ্বনিত হইয়া অতিশয় বেগ ও জোরের সহিত কর্ণ পটহের উপর আঘাত করে।

২। মধ্যকর্ণের গঠন ও কার্য্যবিবরণ।

প্রথম পটহের সম্মুখে যেমন কর্ণবিবর রহিয়াছে তেমনি ইহার পশ্চাদভাগে ক্ষুদ্র হাতুড়ির ন্যায় একখানি হাড় আছে। হাতুড়ির বাঁটের ন্যায় অংশটী পটহের পশ্চাদভাগে লাগিয়া আছে, হাতুড়ির মাথাটী স্বর্ণকারের নেয়াল নামক যন্ত্রের ন্যায় একখানি ছোট হাড়ে বাধিয়া আছে, এবং সেই নেয়াল হাড় খানির তলায় ঘাড়ায় চড়িবার রেকাবের ন্যায় একখানি হাড় লাগিয়া আছে, ঐ রেকাব হাড়ের অন্য প্রান্ত একটী ডিম্বাকৃতি ছিদ্রে এক টুক্রা পাত্‌লা চর্ম্মের সঙ্গে সংলগ্ন আছে, ইহাকে দ্বিতীয় পটহ কহা যায়। পরস্পর সংলগ্ন এই তিন খানি ক্ষুদ্র হাড় মস্তকের ভিতর কৌটার

ন্যায় একটী ক্ষুদ্র গর্ত্তের মধ্যে রহিয়াছে। এই গর্ত্ত কিয়ৎ পরিমাণ বাতাস ও এই তিন খানি হাড়ে পরিপূর্ণ আছে। এক্ষণে ইহাদের কার্য্য দেখা যাউক।

প্রথম পটহের কার্য্য।

কর্ণবিবর স্বয়ং একটী অস্থি নির্ম্মিত নল। এই নলের পশ্চাদ্ দিকের ছিদ্রে প্রথম পটহ সংলগ্ন রহিয়াছে। ঢাকের কাষ্ঠ নির্ম্মিত অংশেরসীমায় চর্ম্ম যেমন দৃঢ় বা টান ভাবে সংলগ্ন থাকে, সেইরূপ কর্ণবিবরের অস্থিময় নলের সীমাতে প্রথম পটহ অতি সুদৃঢ় ও টানা ভাবে লাগিয়া আছে। সুতরাং ঢাকের চামড়ার উপর থাবড়া মারিলে যেমন তাং তাং শব্দ হয় ও সেই শব্দ ঢাকের ভিতরের বাতাসেও গমন করে, তেমনি এই চর্ম্মপটহের উপর শব্দ পতিত হইয়া পটহকে আন্দোলিত করিয়া বাহ্য কর্ণ হইতে মধ্য কর্ণে গমন করে। যদি কর্ণবিবররূপ নলের প্রান্তভাগে চর্ম্ম সংলগ্ন না হইয়া হাড় বা অন্য কোন কঠিন পদার্থ থাকিত, তাহা হইলে তাহার মধ্য দিয়া শব্দ এত সুন্দর রূপে গমন করিতে পারিত না, কারণ চর্ম্ম যেমন শব্দ বহন করিতে পারে অন্য কোন পদার্থই সেরূপ পারে না। এই জন্য যদি ঢাক বা ঢোলের মুখে চর্ম্ম না দিয়া কাষ্ঠ আঁটিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে আর তেমন ভাল শব্দ বাহির হয় না, এবং এই কারণেই সিন্দুক বা বাক্স বাজাইলে যে শব্দ হয় ঢোলের শব্দ তাহা অপেক্ষা ভাল। আবার, যেমন ঢোলের উপরকার চর্ম্ম ঢিলা করিয়া দিলে বাজনার শব্দ বাহির হয় না সেইরূপ প্রথম পটহ যদি টানা না হইয়া শিথিল হইত তাহা হইলেও কোন শব্দ শুনিতে পাওয়া যাইত না।

উপরে বলা হইয়াছে যে, প্রথম পটহের পশ্চাদ্‌ভাগে হাতুড়ি হাড়ের বাঁটের ন্যায় অংশ লাগিয়া আছে, এবং তাহার পর আর দুইখানি হাড় আছে। পটহের অব্যবহিত পশ্চাতে হাড় লাগিয়া থাকাতে কার্য্য এই হয় যে, বাহির হইতে যে শব্দের তরঙ্গ আসিয়া আঘাত করে, তাহার একটুও নষ্ট না হইয়া নিকটস্থ হাড় কয়েক খানির ভিতর গমন করিতে থাকে।

মধ্য কর্ণস্থ অস্থি ও বায়ুর ক্রিয়া।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, এই হাড় তিনখানির কার্য্য কি? আমাদের মস্তকের বহির্ভাগ সমুদায়ই অস্থিময়। এই অস্থিময় মস্তকের ভিতর গর্ত্ত কাটিয়া একটী কৌটা নির্ম্মাণ করা এবং সেই কৌটার মধ্যে অল্প পরিমাণে বাতাস ও তিন টুকুরা হাড় রাখিবার উদ্দেশ্য কি? হাড় তিনখানি এই বাতাস পরিপূর্ণ গর্ত্তের ভিতর থাকিয়াও যদি কেবল মাত্র পটহের সহিত সংযুক্ত না থাকিত, অর্থাৎ যদি মাথার হাড়কে ছুঁইয়া থাকিত তাহা হইলে প্রথম পটহ হইতে শব্দ সকল হাতুড়ি হাড়ের ভিতর প্রবেশ করিয়া মাথার অন্য অন্য হাড়ের ভিতর ছড়াইয়া পড়িত, সুতরাং শব্দের কতকগুলি তরঙ্গ মাথার চুলে কতকগুলি বা চক্ষের নিকট উপস্থিত হইত, এবং এইরূপে প্রায় সকল শব্দই বৃথা নষ্ট হইত এবং শ্রবণকার্য্যও অতি সামান্য পরিমাণে হইত। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে কামানের শব্দ কর্ণে প্রবেশ করিলে চুল খাড়া হইয়া উঠিত চক্ষু ও দন্ত টন্ টন্ করিয়া বেদনাযুক্ত হইত; কিন্তু কামানের শব্দ যে অত অধিক তাহা বুঝিতে পারিতাম না। সুতরাং সাধারণ শব্দ সকল ভাল রূপ না শুনিতে পাইয়া সকল মানুষই ন্যূনাধিক বধির হইত। কিন্তু

মাথার হাড়ের সহিত সংযুক্ত না হইয়া কেবল অল্প পরিমাণ বাতাসের মধ্যে ঝুলিয়া থাকাতে এবং কেবল মাত্র দুই দিকের পটহে লাগিয়া থাকাতে এই হাড় তিন খানির দ্বারা এই কার্য্য হয় যে, শব্দ প্রথম পটহের উপর পতিত হইয়া যখন মধ্য কর্ণে প্রবেশ করে তখন সেই শব্দ হাড় হইতে বাতাসে শীঘ্র যাইতে পারে না, সুতরাং নষ্ট বা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত না হইয়া কেবল হাড় তিনখানির মধ্য দিয়াই গমন করিয়া দ্বিতীয় পটহে উপস্থিত হয়।

হাড় হইতে বাতাসে শব্দ চলিয়া যাইতে না পারার কারণ এই যে, কঠিন, তরল বা বাষ্পীয় এই তিন প্রকার পদার্থের মধ্যে একই প্রকার পদার্থের ভিতর শব্দ সকল যেমন স্বচ্ছন্দে পরিচালিত হয়, এক হইতে অন্য প্রকার পদার্থে (যথা কঠিন হইতে তরল পদার্থে বা তরল হইতে বাষ্পীয় পদার্থে) তত শীঘ্র পরিচালিত হয় না। এই জন্যই মাথার হাড় ও ক্ষুদ্র হাড় তিন খানির মধ্যে এত সাবধানে কিয়ৎ পরিমাণে বাতাস রাখা হইয়াছে।

এই বাতাসের পরিমাণ ঠিক না থাকিলে প্রথম পটহের কার্য্য চলা ভার হইত। যে বাতাসের কথা বলা হইতেছে তাহা আমরা ইচ্ছা করিয়া কমাইতে ও বাড়াইতে পারি। যদি দুই আঙ্গুলে নাক টিপিয়া ধরা যায় এবং মুখ বন্ধ করিয়া জোরে প্রশ্বাস ফেলিবার চেষ্টা করা যায়, তাহা হইলে প্রশ্বাস নাক মুখ দিয়া বাহির না হইতে পাইয়া গলা হইতে মধ্য কর্ণের ভিতর যে একটী চুঙ্গী গিয়াছে তাহার ভিতর দিয়া মধ্যকর্ণে যায়, এবং স্থিতিস্থাপক প্রথম পটহকে বাহিরের দিকে ঠেলিতে থাকে, তজ্জন্য কাণের ভিতর শোঁ শোঁ বা গড়্ গড়্ শব্দ শুনা যায়। এইপরীক্ষা অনেকেই করিয়াছেন ও ইচ্ছা করিলেই এখনই করিতে পারেন।

আবার, যদি নাক টিপিয়া ও মুখ বন্ধ করিয়া জোরে নিশ্বাস টানিবার চেষ্টা করা যায় তাহা হইলে ঐ চুঙ্গীর ভিতর দিয়া মধ্য-কর্ণের সঞ্চিত বাতাস টুকু বাহির হইয়া আইসে, তাহাতে ক্ষণ-কালের নিমিত্ত কাণে তালা লাগিয়া যায় ও কিছুই শুনা যায় না।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, মধ্যকর্ণের এই বাতাসটুকু না থাকিলে চলে না, বেশী বা কম হইলেও চলে না। না থাকিলে মধ্য কর্ণের কার্য্য হইবে না সুতরাং বধির হইয়া যাইব, বেশী হইলে কাণ গড়্ গড়্ করিবে ভাল শুনিতে পাইব না, কম হইলে কাণে তালা লাগিবে।

প্রথম পটহ নামক চর্ম্মের উপর যখন শব্দ আসিয়া পতিত হয়, তখনই ঐ শব্দ চামড়ার অপর পৃষ্ঠে পরিচালিত হইয়া মধ্য কর্ণে প্রবেশ করে। সেখানে প্রথমেই হাতুড়ি হাড়ের বাঁটের ভিতর প্রবেশ করে, তথা হইতে হাতুড়ির মাথায় পরিচালিত হয়, তৎপরে 'নেয়াল' হাড়ের ভিতর দিয়া 'রেকাব' হাড় ও তাহার নিকটস্থ দ্বিতীয় পটহে উপস্থিত হয়। এত গুলি হাড়ের ভিতর দিয়া শব্দ যায় বটে তথাপি শব্দের স্রোত এক সরল রেখায় গমন করে বলিয়া প্রথম পটহ হইতে দ্বিতীয় পটহে লম্ব ভাবে শব্দ উপস্থিত হয়।

অন্তঃকর্ণের গঠন ও কার্য্য বিবরণ।

দ্বিতীয় পটহের অব্যবহিত পশ্চাতে একটী গহ্বর আছে। ইহাই অন্তঃকর্ণ। অন্তঃকর্ণের ভিতর শব্দ প্রবেশ করিয়া প্রথমেই এখানে আইসে বলিয়া ইহাকে "প্রবেশ-গহ্বর" কহা যায়। "প্রবেশ-গহ্বরের পার্শ্ব হইতে একটী নল বাহির হইয়া শামুকের খোলার ন্যায় জড়াইয়া গিয়াছে, তজ্জন্য ঐ নলকে "শম্বুক নল" কহে।

প্রবেশ গহ্বরের উপরে তিনটী "অর্দ্ধচন্দ্রাকার" নল আছে, এই নল তিনটীর প্রত্যেকের উভয় মুখ আসিয়া প্রবেশ গহ্বরে খুলিয়াছে সুতরাং এই খোলা মুখগুলিকে গহ্বরের উপর ভাগে কয়েকটী ছিদ্রবৎ দেখা যায়।

অন্তঃকর্ণের ভিতর সর্ব্বত্রই এক প্রকার জলীয় পদার্থ আছে তাহাকে অন্তঃকর্ণস্থ রস কহা যায়। প্রবেশগহ্বরের মধ্যভাগে, শম্বুক নলের অভ্যন্তরে এবং অর্দ্ধচন্দ্রাকার নলের মুখে মস্তিষ্ক হইতে "শব্দগ্রাহী" স্নায়ুর শাখা সকল আসিয়া বিস্তৃত হইয়াছে। সুতরাং এই স্থানই প্রকৃত শ্রবণেন্দ্রিয়।

বাহ্য ও মধ্যকর্ণের গঠন ও কার্য্য বিবরণ পাঠ করিলে স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে শব্দগ্রাহী স্নায়ুর উপর উচ্চ শব্দ পাতিত করাই বাহ্য ও মধ্যকর্ণের উদ্দেশ্য, তাহাদের দ্বারা শ্রবণ কার্য্য হয় না। জিহ্বার 'স্বাদগ্রাহী' ও নাসিকাতে গন্ধগ্রাহী স্নায়ুর দ্বারা যেমন স্বাদ ও গন্ধের বোধ জন্মায়, অন্তঃকর্ণের মধ্যেও সেইরূপ শব্দগ্রাহী স্নায়ু থাকাতে শব্দের বোধ জন্মায়। বাহিরে যে সকল শব্দ হইতেছে সেই সকল শব্দ বাহ্য ও মধ্যকর্ণের ভিতর দিয়া অতি যত্নে উপরোক্তরূপ সুন্দর কলকৌশলে অন্তঃকর্ণের ভিতর প্রেরিত হয়। এখানে আসিয়া সেই সকল শব্দ শব্দ-গ্রাহী স্নায়ুর উপর আঘাত করিয়া যে উত্তেজনা উৎপাদন করে, তাহা মস্তিকে গিয়া শব্দের বোধ জন্মায়। ইহাকেই শ্রবণ কহা যায়। প্রবেশ-গহ্বরের মধ্যে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর খণ্ডবৎ পদার্থ আছে, তাহাদিগকে 'কর্ণাশ্মরী' কহে। অনেকে বিবেচনা করেন যে মনুষ্য ও উচ্চ শ্রেণীর কয়েক প্রকার জন্তুগণের কর্ণাশ্মরী দ্বারা শব্দ আরও উচ্চরবে ধ্বনিত হয়। যে অন্তঃকর্ণস্থ

রসের কথা উল্লিখিত হইল, শব্দগ্রাহী স্নায়ুর শাখা সকল তন্মধ্যে বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। এই রস দ্বারা যে কিয়ৎপরিমাণে শব্দের উচ্চতা সাধিত হয়, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। অন্তঃকর্ণের অন্যান্য স্থানের কার্য্য অদ্যাপি ভালরূপ স্থিরীকৃত হয় নাই।

শ্রবণ প্রক্রিয়া।

এক পদার্থ আর এক পদার্থের উপর অথবা বায়ুর উপর জোরে আঘাত করিলে নিকটস্থ বায়ুর যে তরঙ্গ বিশেষ আরম্ভ হয় উহাই শব্দ। শব্দ যতই বাহ্যকর্ণের ভিতর প্রবেশ করে ততই বিস্তৃত অংশ হইতে সরু অংশের ভিতর যাইতে থাকে, সুতরাং ততই ঘন ও উচ্চ হইয়া উঠে। এইরূপ অবস্থায় প্রথম পটহের উপর আঘাত করিবামাত্র তথা হইতে পরিচালিত হইয়া মধ্যকর্ণস্থ হাড় তিন খানির ভিতর দিয়া দ্বিতীয় পটহে গমন করে। মধ্য-কর্ণস্থ বায়ুও এ বিষয়ে বিলক্ষণ সাহায্য করে। দ্বিতীয় পটহ হইতে অন্তঃকর্ণের ভিতর প্রবেশ করিয়া যে যে স্থানে শব্দগ্রাহী স্নায়ুর শাখা প্রশাখা বিস্তৃত হইয়াছে, তত্তৎ স্থানে আঘাত করিয়া ঐ স্নায়ুকে উদ্দীপিত করে। সেই স্নায়ু মস্তিষ্ক হইতে আসিয়াছে সুতরাং উদ্দীপিত হইবামাত্র অন্তঃকর্ণ হইতে মস্তিষ্কে শব্দবোধক ভাব গমন করে, তখন মন জানিতে পারে যে শব্দ শুনিতেছি।

শব্দের দূরত্ব ও দিক্ নির্ণয়।

কোন্ দিক হইতে শব্দ আসিতেছে তাহা নির্ণয় করা কিয়ৎ পরিমাণে অভ্যাসের কার্য্য। দেখা যায় যে, মানবগণ অতি শৈশব কালে শব্দের দিক নির্ণয় করিতে পারে না। আমাদিগের দুইটি কর্ণের মধ্যে যে কর্ণ দ্বারা কোন একটি শব্দ অধিক শুনিতে পাই, সেই কর্ণের দিক্ হইতে শব্দ আসিতেছে মন ইহাই অনুমান

করিয়া লয়। দুই কর্ণের উপর সমান তেজে শব্দ পতিত হইলে দিক্ নির্ণয় করা কঠিন হয়। শব্দের দূরত্ব নির্ণয় শ্রবণেন্দ্রিয়ের কার্য্য নহে, এই কার্য্য প্রধানতঃ মন দ্বারা সম্পন্ন হয়। যেমন কোন সুপরিচিত বৃহৎ পদার্থকে দূরে দেখিয়া ঐ পদার্থ কত দূরে আছে তাহা বলিতে পারা যায়, সেইরূপ ঢাক ঢোল, বা অন্য কোন পরিজ্ঞাত পদার্থের শব্দ শুনিয়া ঐ পদার্থ কত দূর হইতে শব্দ করিতেছে তাহাও স্থির করা যায়। পক্ষান্তরে যদি পদার্থ কত দূরে আছে জানা থাকে, তাহা হইলে যেখানে শব্দ হইতেছে সেখানে শব্দ কিরূপ উচ্চ ভাবে হইতেছে তাহাও বলা যায়। শব্দের দূরত্ব নির্ণয় করিবার এইরূপ অভ্যাস বশতঃ আমরা সময়ে সময়ে ভ্রমে পতিত হই। শব্দানুকরণবিদ্যাবিৎ-গণ একস্থানে থাকিয়া এরূপ শব্দ করিতে পারেন যে তাঁহাদের ইচ্ছামত সেই শব্দ দূর বা নিকট হইতে আগত বলিয়া শ্রোতৃ-দিগের ভ্রম হয়। অনেকেই জানেন যে ভূতের ওঝারা এক স্থানে শব্দ করিয়া সেই শব্দ ভিন্ন ভিন্ন স্থানাগত বলিয়া আমা-দিগের ভ্রম জন্মাইতে পারে। ভূত নামান এই শব্দানুকরণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিয়দ্দিবস অভ্যাস করিলে সকলেই ইহা শিক্ষা করিয়া অজ্ঞ ব্যক্তিগণকে ভীত ও বিস্মিত করিতে পারেন।

শ্রুত শব্দের স্থায়িত্ব।

পিতলের পেটা ঘড়িতে মুদ্গর মারার পরও যেমন কিঞ্চিৎ-কাল পর্য্যন্ত শব্দ বাহির হইতে থাকে, সেইরূপ যে সকল শব্দ আমরা শ্রবণ করি তাহা থামিয়া গেলেও শ্রবণক্রিয়া কিয়ৎক্ষণ চলিতে থাকে। সুতরাং যদি কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন শব্দ শীঘ্র শীঘ্র উৎপন্ন করা যায় তাহা হইলে তাহার প্রত্যেকটী থামিয়া

গেলেও কিয়ৎক্ষণ শুনিতে পাই, এই জন্য একটী শব্দ থামা ও অপরটী আরম্ভ হওয়ার মধ্যস্থিত বিরাম বুঝিতে পারি না, সুতরাং সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন শব্দগুলির সমষ্টিকে একটী দীর্ঘ শব্দ বলিয়া বোধ হয়। যথা, যদি যাঁতা আস্তে আস্তে ঘুরাণ যায় তাহা হইলে গট্ গট্ শব্দ পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন বলিয়া বোধ হইবে, কিন্তু বেগে ঘুরাইলে, কেবল একটী দীর্ঘ শব্দ বলিয়া বোধ হইবে।

যেমন দর্শন ক্রিয়ায় সময়ে সময়ে একই পদার্থকে দুইটী বলিয়া বোধ হয় তদ্রূপ শ্রবণেন্দ্রিয় সম্বন্ধে কখন কখন একই শব্দকে দুইটী বলিয়া বোধ হয়।

মানসিক শ্রবণ।

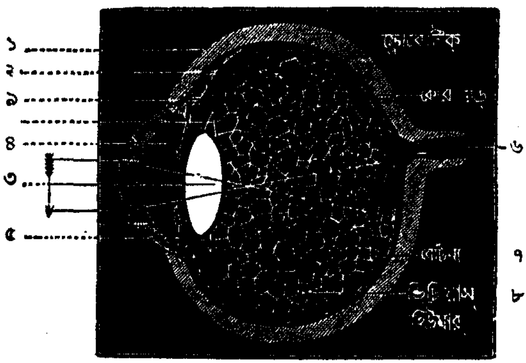
দীর্ঘস্থায়ী শব্দ শ্রবণ করার পর বহুক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ শব্দ অল্প অল্প হইতেছে বলিয়া বোধ হয়। যাঁহারা চারি পাঁচ দিন ক্রমাগত রেলগাড়িতে পর্য্যটন করিয়া নামিয়াছেন তাঁহারা সকলেই ইহা জানেন। দুর্ব্বল, ক্রুদ্ধ ও মস্তিষ্কের পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তিগণ আপনা আপনি কর্ণে নানা প্রকার শব্দ শ্রবণ করেন। এই সকল স্থলে শব্দগ্রাহী স্নায়ু উদ্দীপিত হওয়াতেই কখন কর্ণের ভিতর পট্ পট্ শব্দ কখন বা বংশীধ্বনি কখন অন্য প্রকার শব্দ শ্রুত হয়। দুই কর্ণের ভিতর অঙ্গুলী প্রবেশ করাইলে যে শোঁ শোঁ শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় উহা কৈশিকা নাড়ীতে রক্ত সঞ্চালনের শব্দ মাত্র। বধির ব্যক্তিগণের মধ্য-কর্ণে শ্লেষ্মা জমিয়া অনেক সময় নানা প্রকার শব্দ উৎপন্ন করে।

সপ্তদশ অধ্যায়।

চক্ষু, দর্শনেন্দ্রিয় ও দর্শন।

সকল ইন্দ্রিয় অপেক্ষা চক্ষু দ্বারাই অধিক জ্ঞান ও সুখ লাভ হয় এবং ইহার গঠনে সৃষ্টিকর্ত্তার শিল্প নৈপুণ্য ও অসীম জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। গঠন সম্বন্ধে যে নয়টী অংশের কথা না জানিলে কার্য্য প্রণালী বুঝা যাইবে না, তাহার বিষয় একটু মনোযোগ করিয়া বুঝা যাউক।

দশম প্রতিকৃতি। চক্ষু গোলক ও তদভ্যন্তরস্থ দর্শন যন্ত্র সমূহ।*



১। কঠিনাবরণ, ২। কৃষ্ণাবরণ, ৩। চক্ষু স্ফটিক,
৪। স্বচ্ছাবরণ, ৫। আলোকাবরণী, ৬। দর্শন স্নায়ু,
৭। দর্শনজাল ৮। কাচবৎ পদার্থ। ৯। জলবৎ পদার্থ,

* সকলের বাহিরে যে আবরণ উহাই কঠিনাবরণ। গোলকের সম্মুখ ভাগের

১। কঠিনাবরণ। কোটরের ভিতর হইতে ছুরিদিয়া যদি চক্ষু কাটিয়া বাহির করা যায় তাহা হইলে উহা একটী ছোট ভাঁটার মত গোল দেখায়। এই গোলকটী দেখিয়া বোধ হয় যেন শাদা কাগজ বা মোটা শাদা কাপড়ের নির্ম্মিত। ইহাই চক্ষের বাহিরের আবরণ। ইহারই ভিতর নানা প্রকার কোমল পদার্থ আছে, সেই কারণে এই অংশকে সর্ব্বাপেক্ষা শক্ত করিয়া নির্ম্মাণ করা হইয়াছে, সুতরাং ইহা টানিয়া সহজে ছেঁড়া যায় না। সেই নিমিত্ত ইহাকে কঠিনাবরণ কহে। আমরা পরস্পরের চক্ষের দিকে চাহিয়া দেখিলে যে ধপ্‌ধপে শাদা ক্ষেত্র দেখিতে পাই, উহাই কঠিনাবরণের সম্মুখ ভাগ।

২। স্বচ্ছাবরণ। কিন্তু ঐ দেখ বোধ হইতেছে যেন শাদা ক্ষেত্র চক্ষের মাঝখানে আসিয়া একটী সিকির মত বড় কালক্ষেত্র হইয়াছে। পরস্পরের চক্ষে আর একটু ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহা নহে, কাল ক্ষেত্রটীর উপর কাচের মত স্বচ্ছ ঢাকনি রহিয়াছে এবং কাল ক্ষেত্রটী তাহার নীচে রহিয়াছে। অতএব এই কঠিনাবরণ বা শাদা ক্ষেত্রটীই চক্ষের সম্মুখে আসিয়া স্বচ্ছ হইয়া গিয়াছে। একই জিনিস বার আনা অস্বচ্ছ আর চারি আনা স্বচ্ছ হইবার উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য এই যে, যে বার আনা অংশ আশে পাশে রহিয়াছে তাহা কেবল

উচ্চ অংশই স্বচ্ছাবরণ। ইহারই পশ্চাতে জলবৎ পদার্থে তারাও আলোকাবরণী নিমগ্ন আছে। ডিম্বাকার শ্বেত পদার্থটী চক্ষু স্ফটিক। তাহার পশ্চাতে জালের মত যাহা দেখাইতেছে উহা কাচবৎ পদার্থ। উহার পশ্চাতে যে গভীর কাল রেখা গোলভাবে ঘুরিয়া গিয়াছে উহা কৃষ্ণাবরণ। কাচবৎ পদার্থ ও কৃষ্ণাবরণের মধ্যে দর্শন জাল আছে। পিছন হইতে দর্শন স্নায়ু প্রবেশ করিতেছে।

পুটলি বা ব্যাগের কায করিতেছে ; তাহার ভিতর কোমল জিনিস আছে বলিয়া তাহাকে শক্ত ও অস্বচ্ছ করা হইয়াছে, কিন্তু যে চারি আনা অংশ সম্মুখে রহিয়াছে উহা যদি স্বচ্ছ না হইত, তাহা হইলে চক্ষুর ভিতর আলোক প্রবেশ করিতে পাইত না, সকল মানুষই অন্ধ হইয়া থাকিত ; সেই জন্য উহাকে স্বচ্ছ করা হইয়াছে। এই অংশের নাম স্বচ্ছাবরণ। সুতরাং বাহিরের ঢাকনির বার আনার নাম কঠিনাবরণ, চারি আনার নাম স্বচ্ছাবরণ।

৩। কৃষ্ণাবরণ। স্বচ্ছাবরণের পশ্চাতে যে সিকির মত বড় কাল ক্ষেত্র দেখা যায় উহাই কৃষ্ণাবরণের সম্মুখ ভাগ। রন্ধন শালার ভাতের হাঁড়ির তলায় ও বাহিরে কৃষ্ণবর্ণ সকলেই দেখিয়াছেন। মনে কর, ঐ কৃষ্ণবর্ণ যদি হাঁড়ির বাহিরে না হইয়া ভিতরে হয় তাহা হইলে হাঁড়িটীর যেমন চেহারা হয়, কঠিনাবরণের অভ্যন্তরে কৃষ্ণাবরণ থাকাতে কঠিনাবরণও সেইরূপ আকৃতি বিশিষ্ট। যদি ঐরূপ হাঁড়ির মুখে একখানি কালি মাখান সরা চিৎ করিয়া বসাইয়া দিই এবং তদুপরি একখানি স্বচ্ছ কাচের সরা উপুড় করিয়া বসাইয়া দিই, তাহা হইলে ঐ স্বচ্ছ সরার ভিতর দিয়া কেবল কাল সরা খানাই দেখা যায়, ভিতরে হাঁড়িতে যে কালি আছে তাহা দেখা যায় না, তদ্রূপ স্বচ্ছাবরণের ভিতর দিয়া আমরা জীবিত মনুষ্যের চক্ষে কৃষ্ণাবরণের একটুখানি মাত্র দেখিতে পাই। ইহা কৃষ্ণবর্ণের রঙ্গে পরিপূর্ণ বলিয়াই দেখিতে এত কাল। আলোকের রশ্মি যখন চক্ষুর ভিতর প্রবেশ করে, তখন দর্শন ক্রিয়া সম্পন্ন হইবার জন্য যতটুকু আলোক প্রয়োজন তাহা আর এক যন্ত্র দ্বারা ঠিক হয়, উহার কথা এখনই বলিব। কিন্তু যদি কোন প্রকারে অধিক আলোক প্রবেশ করে, তাহা হইলে দর্শনের জন্য

যেটুকু প্রয়োজন তাহাই ব্যবহার হয়, অবশিষ্ট সকল আলোক দর্শন জালের পিছনে গিয়া কৃষ্ণাবরণের উপর পতিত হইয়া নষ্ট হয়।

অতএব অতিরিক্ত আলোক নষ্ট করাই কৃষ্ণাবরণের কার্য্য। অতিরিক্ত আলোক এইরূপে নষ্ট না হইলে চক্ষু ঝলসাইয়া যাইত। পেচক প্রভৃতি পক্ষিগণ ও অন্যান্য যে সকল জন্তুর চক্ষে কৃষ্ণাবরণ নাই তাহারা সূর্য্যের আলোকে বাহির হইতে পারে না, এবং শ্বেত চক্ষু বলিয়া বিড়ালগণ দিনের বেলায় অর্দ্ধমুদ্রিত নেত্রে থাকে। মনুষ্য মধ্যেও ভারতবর্ষ প্রভৃতি উষ্ণদেশবাসিগণের চক্ষে সূর্য্যের প্রখর আলোক লাগিবে জানিয়া, আমাদের কৃষ্ণা-বরণ যত ঘোর কৃষ্ণবর্ণ করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন, মিতব্যয়ী বিধাতা ইংরাজ প্রভৃতি যে সকল জাতি মৃদু সূর্য্যালোক প্রাপ্ত হয় তাহাদের কৃষ্ণাবরণে তদপেক্ষা কম রং দিয়াছেন। সেই জন্যই উহাঁদের চক্ষু শাদা বা ঈষৎ নীল।

৪। তারা বা কনীনিকা ও আলোকাবরণী। ভাল করিয়া দেখিলে চক্ষের কাল ক্ষেত্রের ঠিক মধ্যস্থলে আধখানি মুসুর ডাইলের ন্যায় একটী ক্ষুদ্র ছিদ্র দেখা যায়। উহাকে তারা বা কনী-নিকা কহে। পরস্পরের চক্ষু পরীক্ষা করিলেই বুঝা যায় যে, যদি আলোক অধিক লাগে তবে তারা ছোট হয়, যদি কম লাগে ত বড় হয়। দিবা রাত্রি তারা এইরূপ ছোট ও বড় হইতেছে। ইহা কিরূপে হয় দেখা যাউক।

তারার চারিদিক ভাল করিয়া দেখিলেই দেখা যায় যে, এক-খানি গোলাকার জালের মত পদার্থ রহিয়াছে। তারা ঐ জালের কেন্দ্রস্থিত ছিদ্র ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই জালখানিকে আলোকাবরণী কহে। উহা অত্যন্ত স্থিতিস্থাপক। আলোক

লাগিলেই সঙ্কুচিত হয় এবং অন্ধকারে গেলেই বিস্তৃত হয়। সুতরাং তারা নামক ইহার মধ্যস্থিত ছিদ্র ও ছোট বা বড় হয়।

প্রত্যূষে শয্যা হইতে উঠিয়া সহসা আলোক দেখিলে আমরা কিয়ৎক্ষণ কষ্ট অনুভব করি ও ভাল দেখিতে পাই না কেন, তাহা এখন বুঝা যাইবে। যখন চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নিদ্রা যাই তখন চক্ষু মধ্যে অন্ধকার বশতঃ আলোকাবরণী ও তারা বড় হইয়া যায়, সুতরাং সহসা চক্ষু খুলিয়া অধিক আলোকের দিকে দৃষ্টি করিলে ঐ আলোক বিস্তৃত তারার ভিতর দিয়া চক্ষু মধ্যে প্রবেশ করিয়া চক্ষু ঝলসাইয়া দেয় সুতরাং দেখিতে কষ্ট হয়। কিন্তু অধিক আলোক লাগাতে দুই চারি সেকেণ্ডের ভিতর তারা খুব ছোট হইয়া পড়ে তখন আর অধিক আলোক প্রবেশ করিতে পায় না, কেবল যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই প্রবেশ করে, সেই জন্য কিয়ৎক্ষণ পরে আমরা বেশ দেখিতে পাই।

আবার যখন রৌদ্রে রৌদ্রে ঘুরিয়া আসিয়া অপেক্ষাকৃত অন্ধকারময় ঘরে প্রবেশ করা যায়, তখন ঠিক ইহার বিপরীত কারণে ভাল দেখা যায় না। রৌদ্রে ঘুরিবার সময় তারা খুব ছোট হইয়া থাকে সহসা অপেক্ষাকৃত অন্ধকারময় স্থানে প্রবেশ করিলে ঐ সঙ্কুচিত তারার ভিতর যে আলোক প্রবেশ করে তাহাতে কিছুই দেখা যায় না। কিন্তু এইরূপ স্থানে কিয়ৎক্ষণ থাকার পর তারা বড় হইয়া যায়, সুতরাং সেখানে যতটুকু আলোক আছে সমস্তই চক্ষে প্রবেশ করে, সুতরাং কিয়ৎক্ষণ পরে বেশ দেখা যায়।

অতএব দর্শন কার্য্য উত্তমরূপ সম্পন্ন করিবার জন্য কতটুকু আলোক লওয়া প্রয়োজন তাহা ঠিক করাই তারা ও আলোকাবরণীর কার্য্য। রৌদ্রের সময় দূরস্থ পদার্থ দেখিতে হইলে

আমরা কথন কথন হস্ত গণ্ডূষ করিয়া ভ্রূর উপর ধরিয়া ঐ পদার্থ দেখি। তাহাতে এই উভয়ের সাহায্য করা হয়।

৫। জলবৎ পদার্থ। তারা ও আলোকাবরণীর সম্মুখ ও পশ্চাতে একটু জলবৎ পদার্থ আছে। আলোকাবরণী যেন এই পদার্থের ভিতর ঝুলিতেছে। এই জলটুকু থাকাতে চক্ষু গোলক বেশ দৃঢ় থাকে।

৬। চক্ষু স্ফটিক। আলোকাবরণী এবং জলবৎ পদার্থের ঠিক পশ্চাতে এই অদ্ভুত দ্রব্য আছে। একটী ক্ষুদ্র বাদামের যেমন মধ্যভাগ স্থূল ও উভয় প্রান্ত সরু ইহাও প্রায় সেইরূপ ভাবের গোলাকার কিন্তু স্বচ্ছ। ইহার বেধ প্রায় ⅓ ইঞ্চ।

আলোক চক্ষের ভিতর প্রবেশ করিয়া যাহাতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত না হয়, যাহাতে আলোক রশ্মিগুলি গুছাইয়া এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে দাঁড়াইতে পারে,যাহাতে বাহিরের পদার্থের ছবি উত্তমরূপে দর্শন জালের উপর পড়িতে পারে; চক্ষু স্ফটিক সেই উদ্দেশ্যে গঠিত হইয়া তারা নামক আলোক প্রবেশের দ্বারে বা পশ্চাতে দাঁড়াইয়া আছে। আলোকাবরণী ও তারা যেমন কতগুলি আলোক রশ্মি প্রবেশ করিতে দিবে তাহা ঠিক করিতেছে, চক্ষু স্ফটিক তেমনি সেই রশ্মিগুলিকে কোথায় কি ভাবে বসাইবে তাহা ঠিক করিতেছে।

স্থির, পরিষ্কৃত ও উপযুক্তরূপ গভীর জলে যদি একটী কাটি বা লাঠির অর্দ্ধেক মাত্র খাড়া করিয়া ডুবান যায়, তাহা হইলে ঐ নিমগ্ন অংশ এত বক্র দেখায় যে,হঠাৎ দেখিলে বোধ হয় যে কাটি বা লাঠিটী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তাহার কারণ এই যে, আলোক যখন বাতাসের ভিতর দিয়া যাইতে থাকে, তখন উহার প্রত্যেক

রশ্মি এক একটী সরল রেখায় গমন করে, সেইজন্য লাঠিগাছটী যখন জলে ডুবান না হইয়াছিল তখন সোজা দেখাইতেছিল, কিন্তু বাতাস হইতে জলে কিম্বা জল হইতে বাতাসের ভিতর প্রবেশ করিবার সময় বক্র হইয়া অন্য সরল রেখায় যাইতে থাকে। ইহাকে গতিভঙ্গ কহা যায়। এস্থলে জলের ভিতর লাঠিগাছটীর যে অংশ দেখা যাইতেছে ঐ অংশ হইতে আলোক রশ্মি নির্গত হইয়া বাতাসে আসিতে বক্র বা গতি ভঙ্গ হওয়াতেই দেখিবার সময় ঐ লাঠিকে যথাস্থানে না দেখিয়া অপ্রকৃত স্থানে দেখা যায়।

সেইরূপ যখন বাতাস হইতে চক্ষু স্ফটিকের উপর আলোক পতিত হয় এবং ঐ স্ফটিকের বেধ বা স্থূল অংশের ভিতর দিয়া গমন করিয়া উহার পশ্চাদ দিকে বাহির হয় তখনও ঐ আলোকের গতিভঙ্গ হয়। ইহার ফল এই হয় যে আলোক রশ্মিগুলি উল্টাভাবে পড়ে সুতরাং দৃষ্ট বস্তুর ছবি দর্শনেন্দ্রিয়ের ঠিক যে স্থানে পড়া উচিত সেখানে না পড়িয়া উল্টাদিকে পড়ে, অর্থাৎ যদি একটী মানুষের দিকে চাহিয়া দেখি তাহা হইলে তাহার মাথার ছবি দর্শনেন্দ্রিয়ের নীচে ও পায়ের ছবি ঐ ইন্দ্রিয়ের উপরে পড়ে, অর্থাৎ সকল পদার্থের উল্টা ছবি দর্শনজালে পতিত হয়। (দশম ও একাদশ প্রতিকৃতি দেখ)।

৭। কাচবৎ পদার্থ। এই পদার্থ চক্ষু স্ফটিকের পশ্চাতে। চক্ষু গোলক যে একটী ভাঁটার মত বড়, তাহা নিজ নিজ চক্ষের উপর তিন চারিটী অঙ্গুলী দিয়া পরীক্ষা করিলে বুঝা যায়। অথচ যে ছয়টী অংশের কথা বলিলাম তাহাতে অতি অল্প স্থানই পূর্ণ হয়, অবশিষ্ট সমুদায় অংশ দেখিতে এক প্রকার

কাচবৎ অথচ কোমল পদার্থ দ্বারা পূর্ণ, উহাকে কাচবৎ পদার্থ কহে। চক্ষুগোলকের ⅘ অংশ ইহাতেই পূর্ণ। ইহা না থাকিলে চক্ষু এমন সুগোল না হইয়া কুঞ্চিত ও কোটরগত হইত। চক্ষু স্ফটিকের ন্যায় ইহারও ভিতর দিয়া আলোক বক্র হইয়া যায়।

৮। দর্শন জাল। ইহাই প্রকৃত দর্শনেন্দ্রিয়। ইহা কাচবৎ পদার্থের পশ্চাতে অবস্থিত এবং দেখিতে মাকড়সার জালের ন্যায়। দর্শন স্নায়ু মস্তিষ্কের ভিতর হইতে নামিয়া আসিয়া কঠিনও কৃষ্ণাবরণের পশ্চাৎভাগ ভেদ করিয়া চক্ষু গোলকের ভিতর বহু-শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া জালের মত ছড়াইয়া পড়িয়াছে বলিয়া এই শাখা প্রশাখাগুলিকে দর্শন-জাল বলে। মৎস্য ধরিবার জালের গোড়ায় যেমন একগাছি দড়ি ধীবরের হাতে থাকে এবং জাল ছড়াইয়া জলে ফেলিলে তাহাতে যখন মৎস্য পড়ে তখন ধীবর উহা টানিতে থাকে, সেইরূপ দর্শন জালের উপর কোন পদার্থের প্রতিবিম্ব পড়িলে উহার উত্তেজনা দর্শন স্নায়ুর ভিতর দিয়া মস্তিষ্কে যায় এবং মনকে জানায় যে অমুক পদার্থ দেখা যাইতেছে। এখানে মন যেন ধীবরের প্রভু, মস্তিষ্ক যেন ধীবর, প্রভুর আজ্ঞায় মাছ ধরিতেছে, দর্শন স্নায়ু যেন জালের দড়ি, দর্শন জাল যেন মাছ ধরিবার জাল, এবং দৃষ্ট পদার্থের ছবি যেন ধৃত মৎস্য।

৯। দর্শন স্নায়ু। ইহা এক গাছি দড়ির ন্যায়, মস্তিষ্ক হইতে নামিয়া আসিয়া চক্ষু কোটরে উপরোক্তরূপে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ইহা গন্ধগ্রাহী স্বাদগ্রাহী প্রভৃতির ন্যায় স্নায়ু। ইহা না থাকিলে দর্শন-কার্য্য সম্পন্ন হইত না।

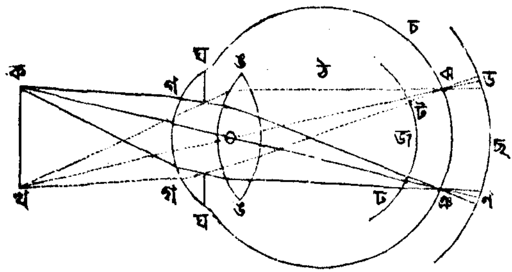
দর্শন প্রক্রিয়া।

পদার্থ সকল হয় রৌদ্র বা প্রদীপাদির আসল আলোকে, নতুবা প্রতিফলিত আলোকে উজ্জ্বল হয়। রৌদ্রই সূর্য্যের আসল আলোক; দিনমানে ঘরের দুয়ার জানালা খুলিয়া রাখিলে ঘরের ভিতর রৌদ্র না আসিলেও যে আলোক দ্বারা ঘরের সকল দ্রব্যই দেখা যাইতে থাকে তাহাই সূর্য্যের প্রতিফলিত আলোক। (১২৮ পৃষ্ঠা দেখ।) যে পদার্থ আমরা দেখিতে পাই তাহা এই দুই উপায়ের যে উপায়েই দীপ্ত হউক না কেন, এই পদার্থের প্রত্যেক বিন্দু হইতে অসংখ্য আলোক-রশ্মি নির্গত হয়। ঐ সকল রশ্মি আসিয়া প্রথমে স্বচ্ছাবরণের উপর পতিত হয়। তাহার মধ্য দিয়া তারার ভিতর গমন করিয়া চক্ষু-স্ফটিকের সম্মুখভাগে পতিত হয়। তৎপরে স্ফটিকের বেধের মধ্য দিয়া পশ্চাতে যাইবার সময় রশ্মি সকলের গতি ভঙ্গ হওয়াতে উহারা স্ফটিকের পশ্চাতে বক্রভাবে উপস্থিত হইয়া এক নির্দ্দিষ্ট বিন্দুতে পুনর্ম্মিলিত হয়, এই মিলনের নাম অধিশ্রয়ণ, এবং এই বিন্দুর নাম অধিশ্রয়ণ বিন্দু। দৃষ্ট পদার্থের প্রত্যেক বিন্দু হইতে এইরূপ অসংখ্য অসংখ্য রশ্মি আসিয়া স্ব স্ব অধিশ্রয়ণ বিন্দুতে দণ্ডায়মান হওয়াতেই ঐ পদার্থের একটী উল্টা প্রতিবিম্ব দর্শনজালে পতিত হয় ও আমরা বুঝি যে অমুক পদার্থ দেখিতেছি।

ক খ যেন একটী তীর। আলোকময় স্থানে উহার প্রতি দৃষ্টি করিলে উহার সকল স্থান হইতে রশ্মি বাহির হইয়া চক্ষে আসিয়া লাগে। ক বিন্দু হইতে যতগুলি রশ্মি আসিয়াছে তাহা গ গ স্বচ্ছাবরণ ভেদ করিয়া ঙ ঙ চক্ষু স্ফটিকের ভিতর দিয়া যাইবার

সময় সমুদায়গুলির গতি ভঙ্গ হয়। যখন স্ফটিকের পশ্চাতে বাহির হয় তখন ঞ বিন্দুতে সকল রশ্মির অধিশ্রয়ণ হয়।

একাদশ প্রতিকৃতি। দর্শন প্রক্রিয়া।



আবার তীরের খ বিন্দু হইতে যত রশ্মি বাহির হইয়াছে তাহাদেরও ঐ রূপে গতিভঙ্গ হওয়াতে ঝ বিন্দুতে তাহাদের অধিশ্রয়ণ হয়। তীরের অন্যান্য সকল স্থান হইতে যত রশ্মি বাহির হয় তাহাদের সমুদায় গুলি এইরূপে আসিয়া ক্রমে ক্রমে ঞ বিন্দু ও ঝ বিন্দুর মধ্যে সকল স্থান টুকুতে অধিশ্রয়ণ প্রাপ্ত হয়। ঐ স্থানে দর্শন জাল চ ঞ আছে বলিয়া তখন দর্শন জালের উপর তীরের একটী উল্টা প্রতিবিম্ব পড়ে। এই প্রতিবিম্বের উত্তেজনা দর্শন জাল ও দর্শন স্নায়ু দ্বারা মস্তিষ্কে নীত হওয়াতে মন জানিতে পারে যে "তীর দেখিতেছি"।

সুতরাং প্রতিবিম্ব যেখানে সেখানে পড়িবে না, কেবল যেখানে রশ্মিগণের অধিশ্রয়ণ হয় সেইখানেই পড়িবে। আবার প্রতিবিম্ব যদি দর্শন জালের উপর না পড়ে, তাহা হইলে মস্তিষ্ক ও মন কিছুই জানিতে পারিবে না। অতএব যেখানে দর্শন জাল আছে ঠিক সেই খানেই অধিশ্রয়ণ হইয়া প্রতিবিম্ব পড়া চাহি।

যদি দর্শন জাল, রশ্মির অধিশ্রয়ণ অর্থাৎ মিলন স্থানে না থাকিয়া ট ঢ বা ড ণ এইরূপ স্থানে থাকিত তাহা হইলে কিছুই দেখা যাইত না, কেননা ট ঢ স্থানে রশ্মি সকল মিশে নাই এবং ড ণ স্থানে তাহারা ছড়াইয়া ভিন্ন ভিন্ন পথে চলিয়া গিয়াছে।

চিত্র দেখিলেই বুঝা যায় যে প্রতিবিম্ব উল্টা হইয়া পড়ে, তবে আমরা পদার্থ সকল সোজা দেখি কি প্রকারে? ইহার উত্তর এই যে, সকল পদার্থই যখন উল্টা দেখা যাইতেছে তখন আর একটী পদার্থকে উল্টা দেখিতেছ তাহা বুঝিবে কি প্রকারে? তুলনা না করিলে উল্টা বা সোজা বুঝিতে পারা যায় না, যখনই সকলই উল্টা দেখিতেছ তখন উল্টাগুলিকেই সোজা বোধ হইতেছে।

এক্ষণে দর্শনেন্দ্রিয় সম্বন্ধে নিম্ন লিখিত জ্ঞাতব্য বিষয় কয়টীর আলোচনা করিব। ১ দৃষ্ট বস্তুর দূরত্ব নির্ণয়। ২ আকার ও পরিমাণ জ্ঞান। ৩ দৃষ্ট পদার্থের গতি। ৪ দর্শন ক্রিয়ার ব্যাপকতা। ৫ বর্ণের বিষয়ক কয়েকটী কথা। ৬ মানসিক দর্শন।

১ম। দৃষ্ট বস্তুর দূরত্ব নির্ণয়।

দৃষ্ট পদার্থের দূরত্ব নির্ণয় করিতে অভ্যাস, তুলনা ও আকার জ্ঞানের প্রয়োজন। অতি নিকটস্থ পদার্থের দূরত্ব নির্ণয় করিতেও আমরা শৈশব কাল হইতে অভ্যাস করিতেছি। পাঁচ ছয় মাস বয়স্ক শিশুগণ দুই এক হাত দূরের পদার্থ হাত বাড়াইয়া ধরিতে গিয়া কতবারই বিফল প্রযত্ন হয়, পরে যখন হাঁটীয়া গিয়া, বা আরও অগ্রসর হইয়া বা আরও অধিক হাত বাড়াইয়া ঐ পদার্থ ধরিতে পারে, তখন তাহার দূরত্ব বুঝিতে পারে। আজন্ম কাল এইরূপ অভ্যাস করিয়া আমরা নিকটস্থ যাবতীয় পদার্থের দূরত্ব এক প্রকার ঠিক করিয়া লই. কিন্তু দূরস্থ পদার্থের দূরত্ব

নির্ণয় করিতে হইলে কেবল অভ্যাস দ্বারা সম্পন্ন হয় না, এরূপ স্থলে দৃষ্ট পদার্থের আকার পরিমাণ না জানিলে দূরত্ব অনুভব করা যায় না। বহু দূরে একটী হস্তী আসিতে দেখিলেও উহাকে বিড়াল অপেক্ষা অধিক বড় দেখায় না, এরূপ স্থলে যিনি কখন হস্তী দেখেন নাই বা কত বড় জন্তু জানেন না, তিনি কখন ঠিক করিতে পারিবেন না, যে ঐ জন্তু কত দূরে আছে, কিন্তু যিনি তাহা জানেন তিনি ঠিক করিয়া বলিতে না পারুন অন্ততঃ কত দূরে হস্তী থাকিলে বিড়ালের মত দেখায় তাহার মোটামুটি আন্দাজ করিতে পারিবেন।

দূরত্ব নির্ণয়ে তুলনা আবশ্যক। তুমি যেখানে দাঁড়াইয়া আছ সেখান হইতে যদি একখানি পঁচিশ হাত লম্বা বাঁশ সোজা হইয়া পড়িয়া থাকে এবং ঐ বাঁশের অপর প্রান্তের নিকট একটী মানুষ দাঁড়াউয়া থাকে তাহা হইলে নিশ্চয় বলা যায় যে, ঐ ব্যক্তি পঁচিশ হাত দূরে আছে, কিন্তু বাঁশখানি না থাকিলে দূরত্ব পঁচিশ হাত কি না তাহা ঠিক করা এত সহজ হইত না। বাঁশ খানি কত লম্বা তাহা পূর্ব্বে জানা ছিল, এখন তাহার সঙ্গে তুলনা করিয়া মানুষটির দূরত্ব ঠিক করিলাম। এই জন্যই সহরে একটী ছোট গলি কত লম্বা তাহা সহজে বলা যায়; কারণ, বাড়ি গুলি গায়ে গায়ে লাগিয়া আছে গলির মধ্য দিয়া গিয়া কতগুলি বাড়ি আছে ও তাহাদের প্রত্যেকটী কত লম্বা তাহার মোটা মোটি হিসাব সহজেই করিয়া লওয়া যায়। কিন্তু পল্লীগ্রামের এক পাড়া হইতে অপর পাড়া কত পথ তাহা এত সহজে বলা যায় না, যেহেতু সেখানে যে সকল পদার্থের সঙ্গে তুলনা করিয়া দূরত্ব ঠিক করিব তাহাদের দৈর্ঘ্য এত সহজে বুঝা যায় না।

এই জন্যই চারি পাঁচ ক্রোশ বিস্তৃত মাঠের প্রান্তে যে পাহাড় আছে, তাহা দেখিয়া তদপেক্ষা নিকট বোধ হয়, কারণ এখানে তুলনা করিবার কোন পদার্থ নাই।

২য় আকার ও পরিমাণ জ্ঞান।

কোন পদার্থ কত বড় তাহা আমরা দুইটী উপায়ে জ্ঞাত হই। প্রথমতঃ দূরত্ব জ্ঞান। উপরে বলা হইল যে, আকার ও পরিমাণ জানা থাকিলে দূরত্ব নির্ণয় করা যায়। সেইরূপ আবার দূরত্ব জানা থাকিলে বস্তু কত বড় তাহা বলা যায়। যিনি কখন হস্তী দেখেন নাই তিনি যদি শুনেন যে দুই ক্রোশ দূর হইতে হস্তী বিড়ালের মত দেখাইতেছে, তাহা হইলে হস্তী কত বড় জন্তু তাহা আন্দাজ করিতে পারিবেন। দূরত্ব না জানা থাকিলে আকার ও পরিমাণ সম্বন্ধে সময়ে সময়ে ভ্রম হয়। এই ভ্রমের একটী দৃষ্টান্ত দেখ। শীতকালে কুজ্ঝটিকা ময় প্রাতঃকালে মাঠে বেড়াইতে গিয়া যদি কিয়দ্দূরে একটী ঝোপ দেখা যায় তাহা হইলে অনেক সময়েই উহাকে বৃক্ষ বলিয়া বোধ হয়, এবং বালককে দীর্ঘকায় পুরুষ বোধ হয়। ইহার কারণ এই যে, কুজ্ঝটিকাময় স্থানে পদার্থ দেখিলে তাহা কত দূরে আছে বুঝিতে না পারিয়া আমরা অনুমান করিয়া লই যে ঐ পদার্থ প্রকৃত দূর অপেক্ষা অধিক দূরে আছে, এবং সাধারণতঃ দূরে ছোট পদার্থ দেখিলে যেমন তাহাকে তদপেক্ষা বড় বলিয়া ভাবিয়া লই, এখানেও ভ্রম বশতঃ যথার্থ আকৃতিকে প্রকৃত অপেক্ষা ছোট ভাবিয়া মনে মনে তাহাকে আরও বাড়াইয়া লই। দ্বিতীয়তঃ স্পর্শেন্দ্রিয়ের সাহায্য।

৩য়। দৃষ্ট পদার্থের গতি।

কোন পদার্থ স্থির আছে কি নড়িতেছে তাহা দুই উপায়ে

জানা যায়। প্রথমতঃ যদি আমাদের শরীর ও চক্ষু স্থির থাকে, অথচ দর্শন জালের উপর দৃষ্ট পদার্থের প্রতিবিম্ব নড়িয়া বা চলিয়া যাইতে থাকে তাহা হইলে আমরা বুঝিতে পারি যে, ঐ পদার্থ নড়িতেছে বা চলিতেছে। এই উপায়েই অধিকাংশ দ্রব্যের গতি বুঝিতে পারি। যদি দৃষ্ট পদার্থের প্রতিবিম্ব দর্শন জালের উপর নড়িয়া না যায় তাহা হইলে ঐ পদার্থ দৌড়াইয়া গেলেও বুঝা যায় না। যথা, রেল গাড়ি বা অন্য কোন দ্রুতগামী যান যখন দৌড়িতে থাকে, তখন ও উহার অভ্যন্তরস্থ আরোহী নিজের দেহ যে দৌড়িতেছে তাহা দেখিতে পান না, অথবা ঐ যানস্থিত বসিবার স্থান বা উহার ছাদ প্রভৃতি যে দৌড়িতেছে তাহা বুঝিতে পারিলেও দেখিতে পান না, কিন্তু যেই চাকার প্রতি বা নিম্নস্থ মৃত্তিকার প্রতি দৃষ্টি করেন অমনি ঐ যানের দৌড় দেখিতে পান। পক্ষান্তরে যদি শরীর স্থির না থাকে, তাহা হইলে স্থির পদার্থের প্রতিবিম্বও দর্শন জালের উপর দিয়া এরূপ ভাবে চলিয়া যায় যেন বোধ হয় ঐ পদার্থ গতিশীল। যথা, নৌকা বা গাড়ি দৌড়িলে তন্মধ্যস্থিত আরোহী দেখিতে পান যেন পার্শ্বস্থ বাড়ি বৃক্ষ প্রভৃতি দৌড়িতেছে। জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রিতে দ্রুতগামী যানারোহণে যাইবার সময় চন্দ্রের প্রতি দৃষ্টি করিলে দেখা যায়, যে চন্দ্রও আমাদের সঙ্গে দৌড়িতে থাকেন।

দ্বিতীয়তঃ। যদি দৃষ্ট পদার্থের একটী ক্ষুদ্র অংশকে দেখিবার নিমিত্ত বারম্বার চক্ষু বা মস্তক নাড়িয়া দেখিতে হয় তাহা হইলেও উহাকে গতিশীল বলিয়া বোধ হয়। যে সর্পের অধিকাংশ অন্ধকারময় স্থানে প্রবেশ করিয়াছে, কেবল পুচ্ছের অত্যল্প মাত্র একবার দেখা গিয়াছে, তাহার সেই পুচ্ছটুকু দেখিতে যদি ক্রমা-

পশ্চাই মুণ্ড হেট করিতে হয়, তবে বোধ হয় যে সর্প এখনও ভিতর দিকেই প্রবেশ করিতেছে। কিন্তু যদি একই পদার্থের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলিকে চক্ষু বা মস্তক নাড়িয়া দেখিতে হয়, তাহা হইলে আর তাহাকে গীতশীল বলিয়া বোধ হয় না। যথাঃ—পুস্তক পড়িবার সময় ভিন্ন ভিন্ন অক্ষর ও কথা চক্ষু নাড়িয়া দেখিতে হয় বটে, তথাপি উহাদিগকে জঙ্গম বলিয়া বোধ হয় না।

৪র্থ। দর্শন ক্রিয়ার কাল ব্যাপকতা।

যদি একটী পদার্থের প্রতি বহুক্ষণ দৃষ্টিপাত করা যায়, তাহা হইলে দর্শন ক্রিয়া শেষ হইয়া গেলেও কিয়ৎক্ষণ বোধ হয় যেন ঐ পদার্থ দেখা যাইতেছে। ইহার কারণ এই যে দর্শনজালের উপর দৃষ্ট পদার্থের প্রতিবিম্ব অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল থাকিলে ঐ প্রতিবিম্ব জনিত দর্শন জ্ঞান এত তীক্ষ্ণ হয় যে দৃষ্ট পদার্থ সরিয়া গেলেও কিয়ৎকাল উহার অস্তিত্ব বোধ হয়। এই কারণে কোন পদার্থের প্রতি বহুক্ষণ দৃষ্টি করিয়া চক্ষু বন্ধ করিলে বোধ হয় যেন তখনও উহা দেখা যাইতেছে। যদি এক গাছি দুই তিন হস্ত দীর্ঘ দড়ির এক প্রান্তে একটী ঢিল্ বাঁধিয়া অপর প্রান্ত ধরিয়া বেগে ঘুরাণ যায় তাহা হইলে ঐ ঢিলটী যে বৃত্ত অঙ্কিত করিয়া ঘুরে তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। কারণ, যদিও মনে বুঝিতে পারা যায় যে ঢিলটী একই সময়ে সমুদায় পরিধিতে থাকিতেছে না, তথাপি দর্শন ক্রিয়ার কাল ব্যাপকতা বশতঃ কোন এক বিশেষ স্থান হইতে চলিয়া গেলেও সেখানে তখনও রহিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। এইরূপে বৃত্তের সর্ব্বত্র বোধ হয়, সুতরাং বৃত্তও দেখিতে পাওয়া যায়। যদি একখানি বড় ও শক্ত কাগজের এক পৃষ্ঠে একটী পক্ষী ও অপর পৃষ্ঠে খাঁচা আঁকিয়া

ঐ কাগজখানি একইদিকে এরূপভাবে ঘুরাণ যায় যে, একবার পাখীও একবার খাঁচা দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইলে কিয়ৎক্ষণ বেগে ঘুরিলেই বোধ হয় যেন পাখীটী খাঁচার ভিতর বসিয়া আছে অর্থাৎ শীঘ্র শীঘ্র দেখাতে পাখী ও খাঁচার দূরত্ব বুঝা যায় না।

৫ম। বর্ণের বিষয়ে কয়েকটী কথা।

শ্বেত বা কৃষ্ণ বর্ণের পদার্থের প্রতি বহুক্ষণ দৃষ্টি করিয়া চক্ষু বন্ধ করিলে মনে হয় যেন তখন ও ঐ বর্ণ দেখিতেছি। ইহা দর্শন ক্রিয়ার কাল ব্যাপকতা বশতঃ হয়। কিন্তু যদি সূর্য্যের প্রতি একবার মাত্র দৃষ্টি করিয়া তৎক্ষণাৎ শ্বেত পদার্থ দেখা যায়, তাহা হইলে উহা ধূসর বা কাল বর্ণ বোধ হয়। ইহার কারণ এই যে, দর্শন জালের যে অংশে সূর্য্যের প্রখররশ্মি ও প্রতিবিম্ব পতিত হইয়াছে, সেই অংশ কিয়ৎক্ষণ ক্লান্ত ও কার্য্য করিতে অক্ষম হয়, আর যে অংশে আলোক পড়ে নাই, তাহাই ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ দেখে।

পূরক বর্ণ।

সূর্য্যের আলোকে যাহা হয়, অন্যান্য আলোক দর্শনেও তদ্রূপ ঘটে। যদি লাল বর্ণের প্রতি বহুক্ষণ দৃষ্টি করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করা যায়, তাহা হইলে সবুজ বর্ণ বোধ হয়, নীল পদার্থ দেখিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলে পাটল ও ধূমল দেখিয়া মুদ্রিত করিলে পীত বোধ হয়। ইহার কারণ এই যে পার্শ্বস্থ চিত্রের প্রত্যেক সরল রেখার উভয় প্রান্তস্থ বায়লেট্ দুই দুইটী বর্ণ একত্রিত

দ্বাদশ প্রতিকৃতি। পূরক বর্ণ।



করিলে শ্বেত বর্ণ হয়, যথা হরিত ও লোহিত মিলিয়া শ্বেত হয়, নীল ও পাটল মিলিয়া শ্বেত হয় এবং পীত ও ধূমল মিলিয়া শ্বেত হয়। সুতরাং একটী অপরের পূরক বা পরিপূর্ণ কারক বর্ণ। যথা লোহিত বর্ণকে শ্বেতবর্ণে পরিবর্ত্তন করিতে হরিত বর্ণই পূরক বা পূর্ণ করিতে সমর্থ। এখন যদি দুই পূরক বর্ণের মধ্যে একটীর প্রতি, যথা লোহিত বর্ণের প্রতি, বহুক্ষণ দৃষ্টিপাত করা যায় ও তৎপরে শ্বেত কাগজ বা দেওয়াল দেখা যায়, তাহা হইলে লোহিত বর্ণ দ্বারা দর্শন জাল এত অবসন্ন হইয়া থাকে যে, কাগজ বা দেওয়ালে শ্বেতবর্ণের মধ্যে যে লোহিত আছে তাহা দর্শন-জালের উপর কোন কার্য্যই করিতে পারে না। সুতরাং অবশিষ্ট পূরক বর্ণ হরিতকেই কেবল দেখা যায়।

অন্ধবিন্দু।

দর্শন জালের সর্ব্বত্রই দর্শন শক্তি বিশিষ্ট, কেবল এক স্থানে এই শক্তি নাই। যদি বাম চক্ষু বন্ধ করিয়া এই পুস্তকখানি মুখ হইতে আট নয় অঙ্গুলী দূরে রাখিয়া নিম্ন লিখিত

ক **খ**

এই দুইটী অক্ষরের মধ্যে ক অক্ষরের উপর ডাইন চক্ষু দ্বারা দৃষ্টি করা যায় তাহা হইলে ক খ দুইটী অক্ষরই দেখা যাইবে, কিন্তু যদি ধীরে ধীরে হাত সরাইয়া পুস্তকখানি দূরে লইয়া যাওয়া যায়, অথচ ক অক্ষরের উপর ডাইন চক্ষু স্থির করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে হঠাৎ খ অক্ষর অদৃশ্য হইয়া যাইবে, কিন্তু পুস্তক আরও দূরে লইয়া গেলে আবার খ অক্ষরটী দেখা যাইবে। ইহার কারণ এই যে, দর্শনজালের যে অংশে দর্শন স্নায়ু প্রবেশ

করিয়াছে সেখানে দর্শন শক্তি নাই, সুতরাং খ অক্ষরের প্রতিবিম্ব যখন এই অংশের উপর পড়ে তখন উহা দেখা যায় না।

৬ষ্ঠ। মানসিক দর্শন।

বাহিরের পদার্থ দেখিয়া যেমন দর্শন জ্ঞান হয়, কোন পদার্থ উপস্থিত না থাকিলেও কখন কখন তদ্রূপ জ্ঞান হয়। অঙ্গুলী দ্বারা চক্ষুর বহির্ভাগে বা ভিতরের দিকে টীপিলে পীতবর্ণের অঙ্গুরীয়বৎ দেখা যায়; দর্শন জালের উপর চাপ দেওয়াতেই এইরূপ বোধ হয়। অনুপস্থিত পদার্থ দেখা বা সম্মুখে ভূত প্রেতিনী দেখার কারণ এই যে দর্শক হয় ভ্রমবশতঃ এক পদার্থ দেখিয়া অন্য পদার্থ অনুমান করেন, নতুবা কল্পনায় ঐরূপ আকৃতি গড়াইয়া লয়েন। দর্শনজাল অত্যন্ত দুর্ব্বল হইলে বা চিন্তাদি মস্তিষ্কের উত্তেজনা বশতঃ উত্যক্ত হইলে চক্ষে সর্ষপের ফুল দেখা ও মাছি উড়িতেছে দেখা যায়।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

স্বরযন্ত্র, কণ্ঠস্বর ও ভাষা।

কণ্ঠস্থ যে যন্ত্র দ্বারা নরাদি জীবগণ শব্দ উৎপন্ন করিয়া পরস্পরকে মনোভাব জানাইতে পারেন উহা স্বর-যন্ত্র। ঐ যন্ত্র হইতে যে স্বর বা সুর উৎপন্ন হয় তাহাই কণ্ঠস্বর। দন্ত জিহ্বাদির সাহায্যে যখন কণ্ঠস্বর অর্থযুক্ত শব্দে পরিণত হয় তখন উহাকে ভাষা কহা যায়। বাদ্যযন্ত্র যেরূপে গঠিত ও বাদিত হইলে সুমিষ্ট শব্দে বাজিতে থাকে, স্বরযন্ত্র ও সেইরূপ প্রক্রিয়ায় গঠিতও সেইরূপ কৌশলে পরিচালিত হইয়া থাকে। সেতার, তানপুরা প্রভৃতি তারবিশিষ্ট যন্ত্র যে কৌশলে রচিত ইহাও সেইরূপে গঠিত। আবার কোন কোন বিলাতি বাদ্যযন্ত্রে যেমন বাতাস পুরিয়া একটু একটু করিয়া সেই বাতাস ছাড়িয়া তাহারই সাহায্যে বাদ্য বাজান হয়, ইহারও কার্য্য-প্রণালী কতকটা সেইরূপ। যে অত্যাশ্চর্য্য কৌশলে এই যন্ত্র চালিত হয় তাহা জানিবার জন্য প্রথমে ইহার গঠন সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক।

স্বর বা সুর যন্ত্র।

কণ্ঠনালী নামে একটী নল গলার ভিতর আছে। ইহা বায়ু নলীর উপর আঁটা, সুতরাং ইহারই ভিতর দিয়া বায়ু ফুস্‌ফুসে যাওয়া আসা করে। এই নলের মুখে উৎকণ্ঠাবরণ নামক এক খানি ঢাকনি আছে,তাহার কথা পূর্ব্বে একবার উল্লেখ করিয়াছি।

কণ্ঠনালী চারি টুক্‌রা উপাস্থি দ্বারা নির্ম্মিত। সম্মুখের টুকরার নাম 'ঢালবৎ' উপাস্থি। পশ্চাতে তিন টুক্‌রা,—একটী বড়, তাহার নাম অঙ্গুরীয় উপাস্থি। গোলাকার বলিয়া এই নাম হইয়াছে। ইহারই মাথার উপর দুইটী ছোট ছোট টুকরা শিথিলভাবে জোড়া আছে। উহারা গাড়ু নামক জলপাত্রবৎ আকৃতি বিশিষ্ট। এই চারি খানি উপাস্থি পরস্পর শিথিলভাবে জোড়া আছে, তাহাতেই কণ্ঠনালী নামক নল হইয়াছে।

আপন আপন গলার মধ্যস্থলে অঙ্গুলী দ্বারা স্পর্শ করিলে একটী কঠিন ও উচ্চস্থান সকলেই অনুভব করিতে পারেন, ইহাই ঢালবৎ অংশের সম্মুখভাগ; ইহার অব্যবহিত পশ্চাত্ হইতে দুই গাছি রজ্জুবৎ পদার্থ উঠিয়া ত্রিভুজের বাহুদ্বয়ের ন্যায় বিস্তৃত হইয়া গাড়ুবৎ টুকরা দুইটীর নীচে গিয়া সংলগ্ন হইয়া আছে। ইহাদের নাম স্বররজ্জু এবং এই দুইটাই প্রকৃত স্বরযন্ত্র। এই উভয়ের প্রকম্পনে সকল জন্তুর ডাক, সকল পক্ষীর গান এবং সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সকল জাতীয় মনুষ্যের ভাষা উৎপন্ন হয়।

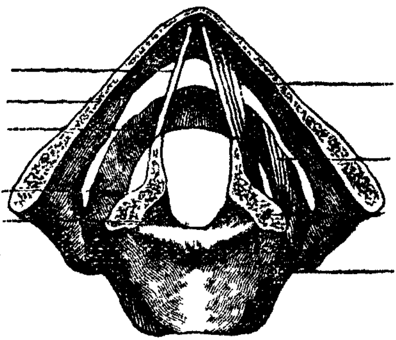
কণ্ঠনালীর চারিখানি উপাস্থির মধ্যে একখানি একটু নড়িলেই অমনি রজ্জু দুইটী হয় একটু ঢিলা নয় একটু সটান বাঁধা হয়। যখন সটান বা কঠিন হয় তখনই ইহা হইতে স্বর উৎপন্ন করা যায়। গলার মধ্যস্থলে ঢালবৎ উপাস্থির উপর যে কঠিন স্থান আছে তাহার অব্যবহিত উপরে একটী গর্ত্ত আছে, ঐ গর্ত্তে একটী অঙ্গুলী দিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্বরে কথা কহিলে দেখা যায় যে, গাড়ুবৎ অংশের উপাস্থি দ্বয় একবার অগ্রে একবার পশ্চাতে যাইতেছে।

কণ্ঠনালী শ্বাসযন্ত্রের পথের উপর বসিয়া আছে, এবং নিশ্বাস প্রশ্বাস ইহারই ভিতর দিয়া যাইতেছে, সুতরাং বিলাতি বাদ্য যন্ত্রে যেমন বাতাস সঞ্চয় করিবার আধার থাকে স্বরযন্ত্রেও ফুস্ ফুস্ দ্বয়ের ভিতর সেইরূপ বাতাস সঞ্চিত হয়। বাদ্য যন্ত্রের অভ্যন্তরস্থ বাতাস চাপিয়া তুলিয়া দিলে. ঐ বাতাস বাহির হইয়া যাইবার সময় যেমন ধাতু নির্ম্মিত পাতের উপর লাগিয়া ভোঁ ভোঁ স্বরে বাজনা উৎপন্ন করে, এখানেও প্রশ্বাসের বাতাস নীচে হইতে উঠিয়া রজ্জু দুই গাছির উপর লাগিয়া সেইরূপ অ, আ, ই, ঈ প্রভৃতি স্বর উৎপন্ন করে। বাদ্য যন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন রন্ধ্র চাপিয়া যেমন নানা প্রকার গত বাজান যায়, স্বর যন্ত্রের উপরে মানুষের জিহ্বা দন্ত প্রভৃতি নড়াতেও সেইরূপ নানা প্রকার কথা ও গান উৎপন্ন হয়। যাহাতে রজ্জু দুই গাছি শীঘ্র শীঘ্র আকুঞ্চিত ও প্রসারিত হইতে পারে তাহা করিবার জন্য নয়খানি সরু সরু মাংস টুকরা কণ্ঠ নালীর ভিতর আছে। যে ছয়খানি মাংস রজ্জুদ্বয়কে শিথিল, সঙ্কুচিত ও বিস্তারিত করে ত্রয়োদশ প্রতিকৃতিতে কেবল তাহাদেরই চিত্র অঙ্কিত হইল।

স্বরযন্ত্রের কার্য্য।

স্বররজ্জু দুইটী উপরোক্তরূপে কখন সটান কখন শিথিল থাকে। কখন রজ্জু দুইটী কাছাকাছি আসাতে তাহাদের মধ্যে আর স্থান থাকে না, সুতরাং কণ্ঠনালীর মুখবন্ধ হইয়া যায়, কখন পার্শাপার্শি সরিয়া যাওয়াতে তাহাদের মধ্যে অনেক স্থান হয়। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাতে কার্য্য কিরূপ ভিন্ন ভিন্ন হয়, তাহা দেখা যাউক।

ত্রয়োদশ প্রতিকৃতি। গলার ভিতর দিয়া যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিলে স্বরযন্ত্র যেরূপ দেখায় তাহার আকৃতি। *



১। শ্বাস প্রশ্বাস ও অস্ফুট শব্দ।

মনুষ্য যখন চুপ করিয়া থাকে, তখন স্বর রজ্জু দুইটী শিথিল ও তাহাদের মধ্যস্থল প্রশস্ত থাকে। ঐ প্রশস্ত পথের ভিতর দিয়া নিশ্বাস প্রশ্বাস চলিতে থাকে। দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ, কাশি, হাঁচি, হাস্ত, জৃম্ভণ, প্রভৃতি কার্য্যে কিরূপে শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যাঘাত ঘটে তাহা ষষ্ঠ অধ্যায়ে বর্ণনা করা হইয়াছে। যদি এইরূপ ব্যাঘাত না ঘটে, এবং কথা কহিবার চেষ্টা না করা যায় তাহা হইলে এই শিথিল রজ্জু দুইটীকে দেখিয়া কে বলিবে যে উহাদের এত ক্ষমতা? রজ্জু দুইটী যেন নিতান্ত অকর্ম্মণ্য বলিয়া বোধ হয়।

যদি এইরূপ শিথিল অবস্থায় বেগে শীঘ্র শীঘ্র প্রশ্বাস ত্যাগ

* কেবল ডাইন দিকের তিনখানি মাংস দেখান হইল; প্রতিকৃতি বড় জটিল হইবে এই ভয়ে বাম দিকের তিনখানি অঙ্কিত হয় নাই। বাম দিকেও এইরূপ তিনখানি আছে।

করা যায়, তাহা হইলে শিথিল রজ্জুদ্বয়ের উপর সেই বাতাস লাগিয়া এক প্রকার অব্যক্ত বা অস্ফুট হাঃ হাঃ শব্দ উৎপন্ন করে। কুকুরগণ ক্লান্ত হইলে জিহ্বা বাহির করিয়া এইরূপ শব্দ করে। হাপরের যাঁতার শব্দ এবং রেলগাড়ী ছাড়িলে তাহার ধূম বাহির হওয়ার শব্দ ও এইরূপ অস্ফুট। ইহা স্বর নহে, কেবল শব্দ মাত্র। যখন একজন মানুষ আর একজনের কাণে কাণে কথা কহে তখন ও এইরূপ অস্ফট শব্দ হয়।

২। স্বর উচ্চারণের প্রক্রিয়া।

স্বর উৎপন্ন করিতে হইলে যন্ত্রগুলির অন্যরূপ অবস্থা হয়। তখন অঙ্গুরীয়বৎ উপাস্থিখানি পিছে হটিয়া যায়, এদিকে ঢালবৎ অংশ সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়ে ও একটু নীচের দিকে নামিয়া যায়, সুতরাং তাহার পশ্চাতে আবদ্ধ রজ্জুদ্বয় ও সটান এবং শক্ত হইয়া দাঁড়ায়।

এখন ধীরে ধীরে প্রশ্বাস ত্যাগ করিলে সেই প্রশ্বাসের বায়ু দৃঢ়বদ্ধ রজ্জুর উপর আসিয়া লাগিতে থাকে এবং তাহার অতি আশ্চর্য্য ফল হয়। সেতার বা তানপূরার তারগুলি শিথিল থাকিলে যেমন কোন বাদ্যই উৎপন্ন হয় না, অঙ্গুলি দিয়া নাড়িলে কেবল ছর্ ছর্ শব্দ হয়, স্বর রজ্জু দুইটী ও শিথিল ছিল বলিয়া এতক্ষণ কেবল প্রশ্বাসের অস্ফুট শব্দ হইতেছিল। কিন্তু সেতারাদির তার ঠিক করিয়া কসিয়া বাঁধিয়া বাজাইলে উহা যেমন খন্ খন্ শব্দে বাজিতে থাকে স্বর-রজ্জুদ্বয়ের উপর টান পড়াতে সেইরূপ অ, আ, ই, ঈ প্রভৃতি স্বর উৎপন্ন হয়।

রজ্জু দ্বয়ের অবস্থা বিশেষে বিভিন্ন স্বর।

কিন্তু সুস্বর উৎপন্ন করিতে হইলে রজ্জুদ্বয় স্বয়ং সুস্থ থাকা

প্রয়োজন। চিৎকার করিলে বা হিম লাগিলে সময়ে সময়ে গলা ভাঙ্গিয়া বা বসিয়া যায়, তখন স্বর উচ্চারণ হয় না, তাহার কারণ এই যে, এরূপ অবস্থায় রজ্জুদ্বয় ফুলিয়া উঠে, এবং তাহাদের উপর শ্লেষ্মা লাগিয়া থাকে, সুতরাং যেমন বেহালা বা সেতারের তারে বহু পরিমাণে ঘৃত কিম্বা চর্ব্বি মাখাইয়া দিলে, উহার সুস্বর বাহির হয় না, এরূপ অবস্থায় স্বররজ্জুদ্বয় ও সেইরূপ অবস্থা বশতঃ সুস্বর উৎপন্ন করিতে পারে না। অপিচ, রজ্জুদ্বয় ভিন্ন ভিন্ন বয়সে ভিন্ন ভিন্ন আয়তন বিশিষ্ট হয় বলিয়া স্বরেরও তারতম্য হয়। বালকগণের স্বর রজ্জু অর্দ্ধ ইঞ্চ অপেক্ষা ও ছোট, স্ত্রীলোকের অর্দ্ধ ইঞ্চ, এবং পূর্ণ বয়স্ক পুরুষের ¾ ইঞ্চ পরিমাণ দীর্ঘ। এই জন্যই বামা-কণ্ঠ, বাল-কণ্ঠ ও পূর্ণ বয়স্ক পুরুষের গম্ভীর স্বরের তারতম্য সর্ব্বসাধারণেই বুঝিতে পারেন। কিন্তু কি কারণে এক ব্যক্তির স্বর অপরের স্বর হইতে বিভিন্ন, তাহা বলা যায় না।

ছুঁচার কিচমিচ, কাকের কাকা, অশ্বের হেষা, গজের বৃংহতি গোরুর হম্বা, অন্যান্য জীবের বিশেষ বিশেষ রব এবং মনুষ্যের সাধারণ স্বর এবং রোদন গান ও দূরাহ্বানের প্লুতস্বর সকলই এই রজ্জুদ্বয়ের প্রকম্পনের ফল। পঞ্চম সপ্তমাদি স্বরের মাত্রা এই দুইটীর মধ্যস্থল সঙ্কীর্ণ বা বিস্তৃত হওয়াতেই হয়। এই কার্য্যে প্রশ্বাসের বায়ুই প্রধান সহায়। একবার প্রশ্বাস ফেলিবার সময় শিথিল স্বর রজ্জুদ্বয়ের ভিতর দিয়া বহুপরিমাণে বাতাস বাহির হইয়া যায়। কিন্তু স্বর উৎপন্ন বা কথা কহিবার জন্য যখন মানুষ চেষ্টা করে তখন সঙ্কীর্ণ রজ্জুদ্বয়ের সরু ছিদ্রের ভিতর দিয়া অতি অল্প অল্প বাতাস বাহির হইতে থাকে; সুতরাং

একবার প্রশ্বাসে যত বাতাস বাহির হইয়া যাইতে পারিত, তাহা আস্তে আস্তে বাহির করিয়া ও অল্পে অল্পে খরচ করিয়া আমরা দশ পনরটী কথা কহিয়া লই। এই এজন্যই তাড়াতাড়ি বা চিৎকার করিয়া কথা কহিলে যত শীঘ্র শীঘ্র নিশ্বাস লইতে হয় নিম্নস্বরে বা ধীরে কথা কহিলে তত শীঘ্র লইতে হয় না। খরচ শীঘ্র হয় না বলিয়া জমা শীঘ্র করিবার প্রয়োজনও হয় না। যদি নিশ্বাস না থাকিত, তবে কোন মনুষ্যই কথা কহিতে পারিত না।

বাক্‌শক্তি ও বাক্য কথন।

ব্যঞ্জনবর্ণ উচ্চারণ করিতে পারাই বাক্‌শক্তির মূল। স্বরবর্ণ রজ্জুদ্বারা উৎপন্ন হয়, কিন্তু ব্যঞ্জন বর্ণ উচ্চারণ করিতে মুখ গহ্বর, তালু, দন্ত, জিহ্বা, ওষ্ঠ ও নাসিকা প্রভৃতি আবশ্যক। সর্দ্দি লাগিয়া নাসিকা বন্ধ হইলে, শৈশব বা বার্দ্ধক্য বশতঃ দন্ত না থাকিলে, পীড়াদি বশতঃ ওষ্ঠ না থাকিলে ব্যঞ্জন বর্ণ উচ্চারণ করিতে যেরূপ কষ্ট তাহা অনেকেই দেখিয়াছেন। আজন্মকাল যাহাদের জিহ্বা অতি ক্ষুদ্র বা নীচের সহিত আবদ্ধ তাহারা ব্যঞ্জন বর্ণ উচ্চারণ করিতে না পারাতেই বাক্‌শক্তি হীন হইয়া জীবন কাটায়। বাস্তবিক হৃদগত ভাব সকল ব্যঞ্জিত করিবার ইহারা প্রধান উপায় বলিয়া ইহাদের নাম ব্যঞ্জন বর্ণ।

ব্যঞ্জন স্বরের অধীন।

স্বরবর্ণকে অগ্র বা পশ্চাতে না রাখিয়া কোন ব্যঞ্জনই উচ্চারিত হইতে পারে না তাহার কারণ এই যে স্বর বা স্বরকে বাধা দিয়া নূতন শব্দ উৎপন্ন করা ভিন্ন ব্যঞ্জন আর কিছুই নহে। অতএব স্বর না হইলে কি শুনা যাইবে, কাহাকে বাধা দিবে?

ভিন্ন ভিন্ন স্বরবর্ণের উৎপত্তি স্থান ও মূল্য নিরূপণ।

অ, আ, হ স্বর রজ্জু দ্বয়ের প্রকম্পনে উৎপন্ন হয়। হ কেবল 'অ' এই বর্ণের মোটা সুর মাত্র, সুতরাং ইহাকে ব্যঞ্জন বর্ণ মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া অন্যায়, কেন না মুখ গহ্বর, তালু, জিহ্বা অথবা ওষ্ঠ কোন স্থানেই ইহা উৎপন্ন হয় না। ঋ, ৠ-মূর্দ্ধণ্য বর্ণ। সাধারণতঃ এই দুই বর্ণ ব্যঞ্জনের র এবং স্বরেই ই, এই উভয়ের সংযোগে যে উচ্চারণ হয় সেই উচ্চারণই প্রাপ্ত হয়। তাহা যদি হয় তবে ইহাদিগকে ব্যঞ্জন বর্ণের শ্রেণীতে ফেলা উচিত। আর যদি কেবল মাত্র স্বর রজ্জু কাঁপাইয়া ঋ এইরূপ স্বর উচ্চারণ করা সম্ভব হয় তবে তাহাও এত কঠিন যে তত পরিশ্রম করিয়া এই দুইটী অপেক্ষাকৃত অনাবশ্যক বর্ণকে রাখা উচিত নহে। ৯—ইহা নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় এবং স্বরবর্ণ ও নহে, অথচ বহু দিন বাঙ্গলা বর্ণ মালাকে বিরক্ত করিতেছে। শীঘ্র ইহাকে দূর করা উচিত। উ ঊ-ঔষ্ঠ্য স্বর এবং বিশুদ্ধ স্বর বটে, এই দুই বর্ণ উচ্চারণ করিতে ওষ্ঠের সাহায্য যত প্রয়োজনীয় এত আর কোন স্বর উচ্চারণ করিতেই প্রয়োজন হয় না। একণ্ঠ-তালব্য, ও কণ্ঠৌষ্ঠ্য। ঐ, অর্থাৎ ও এবং ই, এবং ঔ অর্থাৎ ও এবং উ এই দুইটী মিশ্র স্বর।

ব্যঞ্জন বর্ণ উৎপত্তির নিয়ম।

যেই স্বরবর্ণ শেষ হয় অমনি জিহ্বার মূল অলি জিহ্বার উপর আসিয়া বাতাসকে প্রথম দ্বারে বাধা দিয়া ক খ গ ঘ উচ্চারণ করে। তৎপরে জিহ্বা নিজের মূল ছাড়িয়া দিয়া মধ্যস্থল দ্বারা তালু চাপিয়া চ, ছ, জ, ঝ, এবং প্রায় অগ্রভাগ দিয়া ট-বর্গ ও

পরিশেষে সম্পূর্ণ অগ্রভাগ দন্তে লাগাইয়া ত বর্গ উচ্চারণ করে। জিহ্বার সকল অংশ যখন কার্য্য করিয়া ফেলে, এই যন্ত্রের আর কোন ক্ষমতা না থাকে তখন ওষ্ঠ অগ্রসর হইয়া পবর্গ উচ্চারণ করে। য, তালব্য র মূর্দ্ধন্য, ল দন্ত্য ও ব দন্তোষ্ঠ্য বলিয়া খ্যাত। শ, ষ, স, উচ্চারণের স্থান বিশেষ বশতঃই বিশেষ বিশেষ নামে খ্যাত। আর কতকগুলি ব্যঞ্জনবর্ণ আছে তাহাদিগকে অনুনাসিক কহে। স্বর সম্মুখে আসিতে চেষ্টা করিলে জিহ্বা উহাদিগকে ঠেলিয়া নাসিকার ভিতর পুরিয়া দেয় তাহাতেই উহাদের উচ্চারণ হয়।

ভাষা ও কথোপকথন।

স্বর ও ব্যঞ্জনকে নানা প্রকারে একত্রিত করতঃ উচ্চারণ করিয়া মনোভাব জ্ঞাপন করাকেই ভাষা কহে।

যাঁহারা শিশুগণের বাক্য স্ফূর্ত্তির নিয়ম ও ক্রম পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন বাক্য কথন ও ভাষা শিক্ষা কত কঠিন। প্রথম কয়েক মাস কাল কেবল স্বরবর্ণ উচ্চারণ করিয়া শিশুক্রমে সরল ব্যঞ্জন বর্ণ অভ্যাস করে। ক্রমে তিন চারি বৎসর কাল পরিশ্রম করিয়া ভ্রান্ত উচ্চারণ ও অসম্পূর্ণ বাক্য যুক্ত ভাষায় কথা কহিতে শিখে। কিন্তু কথোপকথন অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার। যখন দুই ব্যক্তি পরস্পরের সহিত কথা কহিতে থাকেন, তখন কি আশ্চর্য্য ঘটনাই হয়! বক্তার স্বর রজ্জুদ্বয় কম্পিত হইয়া অ আ প্রভৃতি স্বর উচ্চারণ করিতে থাকে। তালু, জিহ্বা, দন্ত, ওষ্ঠ প্রভৃতি ঐ স্বরকে নানা প্রকারে বাধা দিয়া প্রতি সেকেণ্ডেই বহুবিধ নূতন নূতন শব্দ উৎপন্ন করিতে থাকে। ঐ সকল শব্দে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার পদার্থ ও ভাব

বুঝাইতে থাকে। ওষ্ঠাদির চাপের এত সূক্ষ্ম তারতম্য বশতঃ ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বোধক কথা উৎপন্ন হয় যে ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। যথা—পাড়া, পীড়া, পোড়া, এই তিনটী শব্দের অর্থ ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু ইহাদের উচ্চারণ করিতে ওষ্ঠের চাপের এতই সামান্য তারতম্য হয় যে, তাহাতে কিরূপে এই ভিন্ন ভিন্ন শব্দ উৎপন্ন হয়, তাহা ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। আবার এই সকল শব্দ শ্রোতার বাহ্য মধ্য ও অন্তঃকর্ণের ভিতর দিয়া মস্তিষ্কে গমন করিয়া মনকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার পদার্থ ও ভাবের ছবি প্রদান করে। মুহূর্ত্ত মধ্যে শ্রোতার মন তাহার উত্তর প্রস্তুত করিয়া কেন্দ্রবিমুখ স্নায়ু দ্বারা স্বীয় স্বর-যন্ত্র ও জিহ্বাদি দ্বারা ঐরূপ নানা প্রকার শব্দ উৎপন্ন করিয়া বক্তার কথার উত্তর দেয়। মনুষ্যগণকে এই অমূল্য অধিকার প্রদান করিয়া বিধাতা নিশ্চয়ই পরম করুণার পরিচয় দিয়াছেন।

জন্তুগণ কথা কহিতে পারে না কেন। ইহার উত্তর—১। জন্তুগণের দন্ত জিহ্বাদি যেরূপে গঠিত তাহাতে সকল ব্যঞ্জন-বর্ণ উচ্চারণ করা অসম্ভব। বিভিন্ন প্রকার জন্তু যে দুই চারিটী ব্যঞ্জন উচ্চারণ করিতে পারে তাহাতে বিভিন্ন জাতীয় জন্তুর শব্দের বিভেদ হয়। ২। কথা কহিতে মেধা প্রভৃতি যে সকল মনোবৃত্তির প্রয়োজন তাহা তাহাদিগের নাই।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

মাংসসূত্র ও মাংসপেশী।

ঐচ্ছিক মাংস।

মনুষ্যাদি জীবগণের হাড়ের উপর, চর্ম্মাবৃত যে লালবর্ণ স্থিতি স্থাপক দড়া বা দড়ির মত পদার্থ সমস্ত শরীরে বিস্তৃত আছে, সাধারণতঃ তাহাকেই মাংস কহে। ছাগ বা মেষ শাবকের মাংস রন্ধন করিলে উহা যখন অতিশয় কোমল হইয়া যায় তখন কেমন সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সুতার ন্যায় বিভক্ত করা যায় তাহা অনেকেই দেখিয়াছেন। মাংসের এই সূক্ষ্ম অংশগুলিকে মাংস সূত্র কহে; আর সেই সকল সূত্র একত্রিত হইয়া যে বড় বড় মোটা মোটা মাংস হইয়াছে তাহাদিগকে মাংস পেশী কহে। বয়স্ক মানুষের বাহু, উরু প্রভৃতির মাংস পেশীগুলি প্রত্যেকটী এক এক গাছি কূপের দড়ার ন্যায় মোটা এবং এক হাত বা সওয়া হাত দীর্ঘ। মস্তকের চতুর্দ্দিকের, বুকের ও নিতম্বের মাংস-গুলি চেপ্‌টা ও চওড়া। নিতম্বের মাংসগুলি স্তরে স্তরে সাজান আছে তাহাতে গদির ন্যায় বসিবার আসন স্বরূপ হয়। হস্ত পদাদি অধিকাংশ স্থলের মাংস আমরা ইচ্ছা করিলে নড়াইতে বা স্থির রাখিতে পারি বলিয়া উহাদিগকে ঐচ্ছিক মাংস কহে। সকল প্রকার নড়া চড়ার মূলই মাংস। মাংস দ্বারা কিরূপে এই কার্য্য সকল হয় তাহার দৃষ্টান্ত দেখ। উরুদেশের পিছন হইতে

কতকগুলি দড়ার মত মাংস পায়ের পিছনে গিয়া লাগিয়া আছে। যদি কেহ পা গুটাইয়া লইয়া আহার করিতে বসিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে তাঁহার উরুদেশের এই মাংসগুলির উপর টান পড়ে, সুতরাং যেমন কূপ হইতে ঘটী তুলিবার সময় দড়া টানিয়া লইলেই দড়ার প্রান্তে যে ঘটী বাঁধা আছে সেটীও উঠিয়া আইসে, সেইরূপ এই সকল মাংস সঙ্কুচিত হইলে, সেই মাংসের প্রান্তভাগে যে পা আবদ্ধ আছে, তাহাও কোলের দিকে আইসে। আবার যখন পা ছড়াইতে ইচ্ছা করেন, তখন ঠিক ইহার উল্টা কার্য্য হয়। তখন উরুর সম্মুখ হইতে পায়ের সম্মুখে যে মাংসগুলি গিয়া বাঁধা আছে তাহারা কুঞ্চিত হয়, সুতরাং সমস্ত পাখানির উপর বাহির হইতে টান পড়ে এবং সমস্ত পা বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এইরূপ হাতে, মুখে, বুকে, পিঠে ও শরীরের সর্ব্বত্রই কেবল মাংসের সাহায্যে নড়া চড়ার কার্য্য হয়। মাংসগুলি যেন দড়া দড়ির মত সকল অঙ্গের সকল গাঁইট বা জোড়ের আগে পিছে বাঁধা আছে; সুতরাং যেখানেই মাংসরূপ দড়িতে টান পড়ে, সেই খানেই সেই অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গ নড়িয়া যায়। একটী আঙ্গুল নড়া বা চক্ষের পাতা পড়া প্রভৃতি যে কিছু সামান্য নড়ন চড়ন দেখা যায়, তাহাও দুই চারি গাছি দড়ি না গুটাইলে হয় না। হাত পা নাড়া, উঠা, বসা, চলা প্রভৃতি বড় বড় নড়া চড়ার কার্য্যে অনেকগুলি মাংস ব্যবহার হয়; এবং কুস্তি করা, দৌড়িয়া যাওয়া প্রভৃতি কার্য্যে শরীরের প্রায় অধিকাংশ মাংসরূপ দড়া দড়িগুলিতে টান পড়ে।

চলিবার সময় সমস্ত শরীরের ভারকেন্দ্র একবার ডাইন দিকের ও একবার বাম দিকের উরুর উপর গিয়া পড়িতে থাকে।

এই কার্য্য করিবার নিমিত্ত সমস্ত নিতম্বদেশ সমগ্র শরীরের ভার বহিয়া লইয়া গিয়া পর্য্যায়ক্রমে ডাইন ও বাম দিকের ঊরুর উপর ফেলিয়া দেয়। পাছে ইহাতেও যথেষ্ট না হয়, পাছে চলিতে গিয়া সমস্ত শরীর পড়িয়া যায়, যেন এই ভবে ভীত হইয়া আমাদিগের দুই বাহু সাহায্য করিতে অগ্রসর হয়। সকলেই জানেন যে, অনেকে চলিবার সময় হাত নাড়া দিয়া চলে। ভারকেন্দ্রকে উপযুক্ত স্থলে রাখা এবং শরীরকে পড়িতে না দেওয়াই হাত নাড়ার উদ্দেশ্য। কিন্তু এই গুরুতর কার্য্য নিতম্ব ও পায়ের দ্বারা যেমন হয়, হাত নাড়া দ্বারা তদ্রূপ কিছুতেই হয় না।

লম্ফ প্রদান বা লাফান।

এই কার্য্যে সমস্ত শরীর সহসা ভূমি হইতে উঠিয়া পড়ে, ইহা এইরূপে সিদ্ধ হয় ;—প্রথমে দুই দিকের ঊরু বুকের উপর এবং দুইটী পায়ের গোছ ঊরুর উপর আনিয়া সমস্ত শরীর গুটাইয়া পরিশেষে হঠাৎ এই সকল গুটান স্থান খুলিয়া দিবার চেষ্টা করাতে সমস্ত শরীর উঠিয়া পড়ে। পা ও ঊরু সাহায্য না করিলে কেহ কখন সোজা দাঁড়াইয়া লাফাইতে পারেন না।

দৌড়ান।

ইহা কেবল শীঘ্র শীঘ্র চলিয়া যাওয়া মাত্র। কেহ কেহ বিবেচনা করেন যে দৌড়ান কেবল শীঘ্র শীঘ্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাফ দেওয়া মাত্র।

শয়ন, উপবেশন, দাঁড়ান প্রভৃতি সকল কার্য্যই মাংস দ্বারা সম্পন্ন হয়। এই সকল কার্য্যের বিশেষত্ব কিছুই নাই। শরীরের প্রত্যেক নড়া চড়ার কার্য্যেই এই কয়েকটী ঘটনা হয় ;—প্রথমতঃ শরীরের কোন স্থান কোন প্রকারে নড়াইতে মনে ইচ্ছা হইলে

তৎক্ষণাৎ সেই আজ্ঞা কেন্দ্রবিমুখ বা বেগোৎপাদক স্নায়ু দ্বারা যে স্থান নড়িবে সেই স্থানে গমন করে। দ্বিতীয়তঃ এই স্নায়ু দ্বারা চালিত হইয়া সেই স্থানের মাংস কুঞ্চিত হওয়াতে মাংসে বাঁধা হাড়গুলি এবং তৎসঙ্গে সমস্ত অঙ্গটী সঞ্চালিত হয়।

মাংসের ভাষা।

ঐচ্ছিক মাংস সমূহের মধ্যে কতকগুলির সঞ্চালনে মনের নানা প্রকার ভাব প্রকাশিত হয়। যথা নাসিকার দুই দিকে যে মাংস আছে তাহা কুঞ্চিত করিলে সমস্ত নাসিকা কুঞ্চিত হয়; উহা ঘৃণার চিহ্ন। ললাটের মাংস ঊর্দ্ধাধঃ ভাবে কুঞ্চিত হইলে দুর্ভাবনা বুঝায়; ভ্রূমধ্য ভাগে ভ্রূর উপরিস্থিত মাংস কুঞ্চিত হইলে ক্রোধ বুঝায় এবং মুখ গহ্বরের চতুর্দ্দিকের মাংস কুঞ্চিত হইয়া দন্ত বাহির হইয়া পড়ুক বা নাই পড়ুক, আহ্লাদের চিহ্ন বুঝা যায়। গলদেশের চতুর্দ্দিকের মাংস ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কুঞ্চিত হইলেই মুণ্ড অগ্র পশ্চাৎ ও পার্শ্বাপার্শ্বি যায়। হাঁ, না, আইস, যাও প্রভৃতি কথার পরিবর্ত্তে সর্ব্বদাই আমরা ঐরূপ মুণ্ডসঞ্চালন করি। এইরূপে হস্ত পদাদি নাড়িয়া এত ভিন্ন ভিন্ন মনোভাব প্রকাশ করা যায় যে বোবাগণ কথা কহিতে না পারিয়াও কেবল ভিন্ন ভিন্ন রূপে অঙ্গ ও অঙ্গুলী সঞ্চালন দ্বারা পরস্পরের মনোভাব বুঝিতে ও বুঝাইতে পারে।

অনৈচ্ছিক মাংস।

আর কতকগুলি মাংস আছে তাহারা আমাদের ইচ্ছাধীন নহে। হৃদয় একটী মাংসময় যন্ত্র তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি, কিন্তু আমরা ইচ্ছা করিয়া উহার কার্য্যের কিছুই পরিবর্ত্তন করিতে পারি না। গলনলী, অন্ননলী, পাকস্থলী ও অন্ত্রনলীর প্রকাণ্ড নল

বহু পরিমাণে মাংসে গঠিত। পিত্তাধার ও জরায়ু মধ্যেও এইরূপ মাংস আছে। কিন্তু আমরা ইচ্ছা করিয়া এই সকল মাংস নড়াইতে বা স্থির রাখিতে পারি না, তাহারা আপনাপন ধর্ম্মানুসারে নড়ে বা স্থির থাকে বলিয়া তাহাদিগকে অনৈচ্ছিক মাংস কহে। শীত, আতপ প্রভৃতি বশতঃ অনৈচ্ছিক মাংসের কার্য্য শরীরের কোন কোন স্থলে হইয়া থাকে। যথা অণ্ড কোষ যে চর্ম্মের ভিতর আছে ঐ চর্ম্মের ভিতর যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অনৈচ্ছিক মাংস আছে উহা গ্রীষ্মকালে বিস্তৃত থাকে ও শীত লাগিলেই কুঞ্চিত হয়, সুতরাং তৎসঙ্গে চর্ম্মও বিস্তৃত বা কুঞ্চিত হয় তাহা সকলেই দেখিয়াছেন।

লোমহর্ষণ ব্যাপার।

লোমহর্ষণ এইরূপে হয়। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে যে স্পর্শগ্রন্থির বর্ণনা করা গিয়াছে, ঐ সকল গ্রন্থির উভয় পার্শ্বে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সূত্র বৎ মাংস আছে। ঐ সকল মাংস সূত্র সহজ অবস্থায় শিথিল থাকে, সুতরাং স্পর্শ গ্রন্থিগুলি তাহার ভিতর নিমগ্ন থাকে ও আমরা ঐ গ্রন্থি দেখিতে পাই না। কিন্তু ভয়, বিস্ময়, শীত প্রভৃতি কারণে যখন ঐ সকল মাংস সূত্র কুঞ্চিত হয় তখনই তাহাদের মধ্যস্থিত গ্রন্থিগুলিকে ঠেলিয়া বাহ্যত্বকের উপর খাড়া করিয়া দেয়। তখন কয়েক মুহূর্ত্ত কালের জন্য স্পর্শগ্রন্থিগুলিকে বাহ্যচর্ম্মের উপরে দেখা যায়। ইহাকেই লোমহর্ষণ কহে। মাংস সূত্রগুলি শিথিল হইয়া পড়িলেই গ্রন্থিগুলি বসিয়া যায়, সুতরাং লোমহর্ষণও থামিয়া যায়।

বিংশ অধ্যায়।

জীবনীশক্তির পতন ও মৃত্যু।

শরীররূপ যন্ত্রের কার্য্যসকল কি প্রকারে চলিতেছে তাহা আমরা দেখিলাম। যে শক্তি দ্বারা এই কল চলিতেছে তাহার নাম প্রাণ বা জীবনীশক্তি। উপক্রমণিকাতে বলিয়াছি যে, ইহার প্রকৃতি কিরূপ তাহা অদ্যাপি জানা যায় নাই কিন্তু ইহার কার্য্য সবিশেষ জানা গিয়াছে।

প্রথমতঃ জীবনের প্রারম্ভে এই শক্তি অতিশয় বলবতী থাকে, জরায়ু মধ্যে কয়েক মাসের ভিতর পিপীলিকাবৎ শরীর হইতে তিন চারি সের ওজনের ভারি শিশু হওয়া কম আশ্চর্য্যের কথা নহে। অগ্নি যেমন প্রজ্জ্বলিত হইলে তেজে জ্বলিতে থাকে, মাতা গর্ব্ভিণী হইলে জরায়ু মধ্যে ডিম্বও সেইরূপ অতি শীঘ্র বাড়িতে থাকে। যেই শিশু ভূমিষ্ঠ হয় অমনি জীবনীশক্তি একটু কমিয়া যায়। গত সাড়ে নয় মাসে যে অত্যাশ্চর্য্য বৃদ্ধি হইয়াছিল এখন আর তত হয় না, সেই সময়ে শরীরের যে গঠন হইয়াছে এখন তাহারই বৃদ্ধি হইবে, নূতন কিছুই প্রস্তুত হইবে না। এই উদ্দেশ্যে বলবতী জীবনীশক্তি কিরূপে বহির্জ্জগৎ হইতে খাদ্য পেয় সংগ্রহ করিয়া শরীরকে বড় করে, কয়েক বৎসরের মধ্যে যৌবনকাল উপস্থিত হইলে জীবনীশক্তি কিরূপে আরও কমিয়া যায় এবং শরীরকে আর বাড়াইতে পারে না, তখন কিরূপে শরীরের কেবলমাত্র ক্ষতি ও পূরণ হইতে থাকে তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব

অধ্যায়ে বলিয়াছি। কয়েক বৎসর পরে যখন বৃদ্ধ বয়স উপস্থিত হয় তখন জীবনীশক্তি এত কমিয়া যায় যে, রাত্রি দিন যে ক্ষতি হইতেছে তাহাও পূরণ করিতে পারে না। তখন শরীর ক্ষীণ ও হীনবল হইয়া পড়ে। চর্ম্মের নীচে যে মেদ আছে তাহা খরচ হইয়া যাওয়াতে চর্ম্ম লোল হয়। মস্তিষ্ক ও মেরু-মজ্জার কার্য্য কমিয়া যাওয়াতে দর্শন, শ্রবণ প্রভৃতি পঞ্চেন্দ্রিয় কার্য্য করিতে ক্রমে অসমর্থ হইতে থাকে, এবং পরিপাক যন্ত্র, ফুসফুস্ ও হৃৎ-পিণ্ড সকলেই অত্যন্ত ক্ষীণ হয়।

তখন মৃত্যু অনিবার্য্য—অলঙ্ঘনীয় হইয়া উঠে। বৃদ্ধ বয়সে সামান্য উপসর্গেই মৃত্যু হয়। যদি উপসর্গ নাই উপস্থিত হয় তথাপি ক্রমে ক্রমে এই শিথিল যন্ত্রের কার্য্য থামিয়া যায়। দীপের তৈল নিঃশেষিত হইলে দীপ যেমন নির্ব্বাণ হয়, জীবনী-শক্তি লোপ পাইলে মৃত্যুও সেইরূপ উপস্থিত হয়।

এইরূপ মৃত্যু কেবল বৃদ্ধ বয়সেই হইয়া থাকে, যৌবন প্রভৃতি সময়ে যে মৃত্যু হয় তাহা পীড়া বা অন্য কোন আগন্তুক কারণ বশতঃই হইয়া থাকে। বৃদ্ধ বয়সের মৃত্যু যেমন শরীরের বর্দ্ধন, পোষণ প্রভৃতি ক্রিয়ার ন্যায় স্বাভাবিক ও অনিবার্য্য, যৌবনাদি বয়সের মৃত্যু সেরূপ নহে, উহা অনেক সময়েই নিবার্য্য সুতরাং কিয়ৎপরিমাণে অস্বাভাবিক। এরূপ বয়সে পীড়া বা অন্য কোন কারণে মৃত্যু উপস্থিত হইলে অল্প বা অধিক পরিমাণে যন্ত্রণা হয়।

বৃদ্ধ বয়সের মৃত্যুতে কিছুই যন্ত্রণা নাই বলিলেও হয়। শিশু যেমন মাতৃক্রোড়ে নিদ্রিত হয় বৃদ্ধও সেইরূপ ধীরে ধীরে এই জগৎকে বিস্মৃত হইয়া সেই বিশ্বজননীর ক্রোড়ে নিদ্রিত হইয়া পড়েন। কিন্তু পীড়া জনিত মৃত্যুতে ন্যূনাধিক কষ্ট হয়।

ইহার মধ্যে অচেতনাবস্থায় মৃত্যু হইলে কোন যন্ত্রণাই ভোগ করিতে হয় না। সৌভাগ্যক্রমে অনেকগুলি রোগেই মানুষ মৃত্যুর পূর্ব্বে সংজ্ঞাহীন হইয়া যায়, সুতরাং যন্ত্রণাও কিছু বুঝিতে পারে না। আবার যে সকল মৃত্যু হৃৎপিণ্ডের অক্ষমতা বশতঃ হয়, (যথা—বজ্রাঘাতে বা গোলাগুলি আঘাতে বা অন্য কোন কারণে যাহাতে সহসা হৃদয়ের কার্য্য বন্ধ হইয়া যায়) তাহাতেও মৃত্যু এত শীঘ্র উপস্থিত হয় যে, যন্ত্রণা কিছুই বুঝা যায় না। বজ্রাঘাতের মৃত্যু এত শীঘ্র হয় যে, তাহাতে যন্ত্রণা বুঝিবার সময় হয় না।

মৃত্যু যন্ত্রণা বিশেষ উৎকট কিছুই নহে। মৃত্যুর সময় যেরূপ যন্ত্রণা হয় সেরূপ ও তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক ক্লেশ আমরা জীবিত অবস্থায় কখন কখন পাইয়া থাকি। কিন্তু রোগীর মনে "মৃত্যু আসিতেছে" ভাবিয়া যে ভয় হয়, বোধ করি তাহা অতি ভয়ঙ্কর। কিন্তু তাহারও ইতর বিশেষ আছে। দুষ্কর্ম্মান্বিত লোকে এই সময়ে যত ভয় পায় ধার্ম্মিকেরা সেরূপ কিছুই পান না। সাধারণতঃ মুমূর্ষু ব্যক্তির বন্ধু বান্ধব তাঁহার আসন্ন মৃত্যু ভাবিয়া ও মলিন মুখ দেখিয়া যেরূপ ক্লেশানুভব করেন রোগীর সেরূপ কিছুই হয় না। অবশ্য এমন অনেক রোগ আছে যাহাতে বহুকাল যন্ত্রণা পাইয়া মরিতে হয়, এমন কতকগুলি রোগ আছে যাহাতে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বেও ক্লেশ সহ্য করিতে হয়। কিন্তু করুণাময় বিধাতা এমনি নিয়ম করিয়াছেন যে, অধিকাংশ মৃত্যুতেই যন্ত্রণা অতি কম হয়, নতুবা অতি অল্পক্ষণ মাত্র থাকে।

মৃত্যু যখন হয়, তখন শরীর ক্রমে ক্রমে কঠিন হইয়া পড়ে এবং গ্রীষ্মপ্রধান দেশে তাহার অল্পক্ষণ পরেই পচিতে আরম্ভ

করে। এই দুইটী চিহ্ন দেখিলে আর কিছুমাত্র সন্দেহ থাকে না যে মৃত্যু হইয়াছে। এদেশে গ্রীষ্মকালে মৃত্যুর দুই ঘণ্টা পরেই শরীর পচিতেছে ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

প্রত্যর্পণ।

পচিয়া যাওয়া এই বিশ্ব-ভাণ্ডারের পদার্থ সকল ফিরাইয়া দেওয়া ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমাদিগের চতুর্দ্দিকস্থ বাতাস অম্লজান নামক বাষ্পে পরিপূর্ণ। অম্লজান ব্যতীত আরও কয়েক প্রকার বাষ্প এবং এক প্রকার অতি ক্ষুদ্র কীটাণু এই বায়ুর ভিতর আছে। ইহাদের কথা উপক্রমণিকায় বলা হইয়াছে। যে মুহূর্ত্তে মৃত্যু হয়, সেই মুহূর্ত্তেই এই সকল কীটাণু আমাদিগের শরীর আক্রমণ করে। এই সময়ে বাহ্য বায়ুস্থিত অম্লজান বাষ্প কীটাণুগণের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া ধ্বংস কার্য্য করিতে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম হয়। তখন অম্লজান শরীরস্থ অঙ্গার নামক রূঢ় পদার্থের সহিত সংযুক্ত হইয়া আঙ্গারিকাম্ল বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়। অম্লজানই জলজান নামক বাষ্পের সহিত সংযোগে জল ও জলীয় বাষ্প হইয়া কতক উড়িয়া যায় এবং কতক পড়িয়া যায়। অন্য-দিকে মাংস স্নায়ু প্রভৃতি যবক্ষারজান প্রধান অংশগুলি এমো-নিয়া বাষ্প হইয়া বায়ুর সহিত মিশিতে থাকে এবং আমাদিগের শরীরস্থ গন্ধক নিজে 'জলজনিত গন্ধক' নামক ভয়ানক দুর্গন্ধময় বাষ্প হইয়া উত্থিত হইতে থাকে এবং এমোনিয়ার দুর্গন্ধকে আরও তীব্র করিয়া তুলে। এইজন্যই জীবশরীর পচিতে থাকিলে এত দুর্গন্ধ অনুভব করা যায়। এদিকে শরীরস্থ চুণ, লৌহ, সোডা, পোটাশ প্রভৃতি ধাতু পদার্থ সকল নিকটস্থ ভূমিতে পড়িয়া চারিদিকের বৃক্ষ লতাদির শরীর পোষণ করিতে থাকে।

আর অস্থি, মেদ, কেশ প্রভৃতি যাহারা অপেক্ষাকৃত কঠিন ও সসার তাহারা এত শীঘ্র নষ্ট হয় না, কিন্তু কাল-সহকারে তাহারাও বিশ্লিষ্ট হইয়া স্ব স্ব প্রাকৃতিক রূঢ়ধাতব ও অধাতব অবস্থা-প্রপন্ন হয় এবং নিকটস্থ উদ্ভিদগণের আহার্য্য হইয়া থাকে। যদি শরীর পচিতে না দিয়া দাহ করা যায়, তাহা হইলে উপরোক্ত পদার্থগুলির রাসায়নিক বিশ্লেষণ ঘণ্টা দুই তিনের ভিতরেই হইয়া যায়।

এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া কয়েকটী জ্ঞানগর্ভ উপদেশ সংগ্রহ করা যায়।

প্রথম।—শরীরের কার্য্যাদি অবগত হইলে স্বাস্থ্য-রক্ষা করিতে পারা যায়।

দ্বিতীয়।—মানব-শরীর গঠন ও কার্য্য সম্পাদনে যে *অত্যাশ্চর্য্য জ্ঞান, শিল্পনৈপুণ্য ও অসীম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত* হইয়াছে তাহাতে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, জ্ঞান, দয়া ও শক্তির অসীম প্রভব একজন সৃষ্টিকর্ত্তা মনুষ্যকে গড়াইয়াছেন। যাঁহার এত শক্তি ও দয়া তাঁহার প্রতি ভক্তি প্রকাশ না করিয়া এই শাস্ত্রের পাঠকগণ থাকিতে পারেন না। পণ্ডিতবর গ্যালেন প্রথমে নাস্তিক ছিলেন, পরে যখন শবচ্ছেদ করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন জীব-শরীরে প্রকাশিত অসীম বুদ্ধি-কৌশল দেখিয়া ঈশ্বরভক্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার পর যত বুদ্ধিমান লোকে এই শাস্ত্র অনুশীলন করিয়াছেন, সকলেই মনুষ্য-শরীরকে ঈশ্বরের অসীম জ্ঞানের লীলা-ক্ষেত্র বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

তৃতীয়।—জীবন সময়ে যে প্রাণী ও উদ্ভিদ্‌গণকে মনুষ্যেরা

ভক্ষণ করেন, জীবিত থাকিতেই তাহার অধিকাংশ প্রত্যহ ফিরাইয়া দিতে হয়, অবশিষ্ট যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়া আমরা শরীর গাঁথিয়া তুলি, মৃত্যুর পরক্ষণেই তাহা কড়ায় গণ্ডায় হিসাব করিয়া ফিরাইয়া দিতে হইবে। আমরা যেমন তাহাদের ভক্ষণ করিলাম তাহারা তেমনি আমাদিগকে ভক্ষণ করিবে, আবার আমাদের বংশধরগণ যেন ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্যই আমাদের ভক্ষককে ভক্ষণ করিবে। এইরূপে এক নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক পরমাণু রাশি পরস্পর সংযুক্ত ও বিশ্লিষ্ট হইয়া চক্রনেমীর ন্যায় ঘূর্ণিত হইয়া এই পৃথিবীতে জীবন-স্রোত প্রবাহিত রাখিতেছে। সুতরাং এখানে 'আমার' বলিয়া স্থায়ীস্বত্ব স্থাপন করা অসম্ভব।

চতুর্থ।—পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে জীবনের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী জানিয়া এই শাস্ত্রবিৎ কখন মৃত্যুর নামে ভীত হয়েন না। ইহকালের কয়েক দিনের জন্য জীবন চালাইতে যিনি এত দয়া করিয়াছেন, তিনি যে পরকালের জন্য অবশ্যই ভালরূপ আয়োজন করিবেন নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে ইহা বিশ্বাস করিয়া এই শাস্ত্রবিৎ মৃত্যু-শয্যায় শয়ন করিয়া সেই জ্ঞান ও দয়াময়ের উপর নির্ভর করেন।

সম্পূর্ণ।

পরিশিষ্ট।

[নিম্নলিখিত শব্দসমূহের পার্শ্বে যেখানে যে অঙ্ক আছে উহাতে ঐ সংখ্যক পৃষ্ঠা বুঝিতে হইবে।]

অঙ্গার, কয়লা।—দীপশিখা হইতে যে কালি পাওয়া যায় উহা বিশুদ্ধ অঙ্গার। ইহা স্বর্ণ রৌপ্যাদির ন্যায় রূঢ় পদার্থ অর্থাৎ দুইটী পদার্থযোগে উৎপন্ন হয় না।

অণ্ডাধার বা অণ্ডকোষ।—এই কথাটী শুদ্ধ নহে, পুরুষের অণ্ড হয় না, উহাকে শুক্রকোষ বা বীর্য্যকোষ বলা উচিত।

অম্ললাল ১০০।

অণুবীক্ষণ।—(অণু সূক্ষ্ম, বীক্ষণ দর্শন করা) যাহা দ্বারা সূক্ষ্ম বস্তু দেখা যায়। এই যন্ত্র নলাকার, ইহার এক পার্শ্ব সূক্ষ্ম অপর পার্শ্ব স্থূল। ইহাতে এক বা একাধিক খণ্ড স্বচ্ছ কাচ থাকে। সূক্ষ্ম পার্শ্ব হইতে নলমধ্য দিয়া দৃষ্টি করিলে চক্ষের অগোচর ক্ষুদ্রতম বস্তু বৃহৎ দেখায়।

অধিশ্রয়ণ।—(অধি—শ্রী [পাক করা] অন্নাদি চড়ান, ভাবে অনট্ প্রত্যয়) আলোকের কিরণ সকল দূরবীক্ষণের মুকুর বা অন্য কোন কাচ নির্ম্মিত কুব্জ বা ন্যুব্জ পদার্থের মধ্য দিয়া গিয়া যেখানে মিলিত হয়।

অধাতব।—যাহা ধাতু হইতে উৎপন্ন নহে।

অন্তর্ব্বাহ।—এই ক্রিয়ায় তরল পদার্থদ্বয়ের সংসক্তি অর্থাৎ পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ শক্তি প্রয়োজন। যদি গেলাসে জল রাখিয়া চর্ম্মদ্বারা ঢাকিয়া তৈলপূর্ণ পাত্রের ভিতর উপুড় করিয়া রাখা যায় তাহা হইলে অন্তর্ব্বাহ ও বহির্ব্বাহ হয় না।

অন্ত্রনলী।—সরু বলিয়া দীর্ঘ নলটীর নাম ক্ষুদ্র অন্ত্রনলী, মোটা বলিয়া যথার্থ ক্ষুদ্রটীর নাম বৃহৎ অন্ত্রনলী। পঞ্চম প্রতিকৃতিতে সমস্ত গুটান অংশটীই ক্ষুদ্র অন্ত্রনলী।

অন্ননালী বা অন্ননলী।—৮৯ টীকা।

অনৈচ্ছিক মাংস।—যে সকল মাংস ইচ্ছা করিয়া নাড়া চাড়া যায় না। হৃদয় ইহার উত্তম দৃষ্টান্ত।

অপবীজ।—যাহা বীজ নহে, অথচ যাহা বীজের কার্য্য করে অর্থাৎ যাহা দ্বারা উদ্ভিদ্ উৎপন্ন হয়। অপুষ্পক উদ্ভিদের উৎপত্তি সাধারণ আলু দেখিলেই উত্তমরূপ বুঝা যায়।

অপান বায়ু।—প্রাণ দেখ।

অবরোধক মাংস।—ইহা বৃত্তাকারে অবস্থিত। কেন্দ্র হইতে পরিধি পর্য্যন্ত বহুসংখ্যক মাংসময় সূত্র বিস্তৃত আছে। মলদ্বারের অবরোধক মাংসের উপর মনের ও মনদ্বারা স্নায়ুসূত্রের এত ক্ষমতা আছে যে, মলত্যাগ করিবার ইচ্ছা হইলেও উহা বহুক্ষণ পর্য্যন্ত বদ্ধ রাখা যায়। মলের ভার অত্যন্ত অধিক হইলে মাংসের ক্ষমতাকে ঐ ভার পরাস্ত করে সুতরাং আর চাপিয়া রাখাও যায় না।

অমিশ্র স্বাদু।—ইহার প্রধান লক্ষণ এই যে এইরূপ পদার্থের উপর সকল লোকের, সকল সময়েই প্রায় একরূপ প্রবৃত্তি বা অপ্রবৃত্তি থাকে।

অমিথুনজন্মা।—যাহারা স্ত্রীপুরুষের বিনা সংযোগে উৎপন্ন হয়। সাধারণতঃ এইরূপ কীটাণুগণের একটীর দেহ বিভক্ত হইয়া বহুসংখ্যক কীটাণু উৎপন্ন হয়।

অম্লজান।—একপ্রকার বাষ্প; ইহা জল ও বায়ুর প্রধান উপাদান। এবং রূঢ় পদার্থ। ডাইল তরকারি প্রভৃতি রাঁধিয়া বহুক্ষণ রাখিয়া দিলে বায়ু হইতে অম্লজান আসিয়া উহাদের সহিত সংযুক্ত হয় এবং ঐ সকল খাদ্য টক্ হইয়া যায়, ইহা অম্লের উৎপাদক এই হেতু ইহাকে অম্লজান কহে।

অশ্রুপথ।—নাসিকার দিকে চক্ষের যে কোণ ঐ দিকে উহা অবস্থিত। যদি কোন কারণে এই পথ বদ্ধ হয় তাহা হইলে অশ্রু ঐ পথে যাইতে না পাইয়া অনবরত চক্ষের বাহিরে গড়াইয়া পড়িতে থাকে। তখন উহা একটী পীড়া হইয়া দাঁড়ায়।

আজারিকায়।—বিষময় বাষ্প বিশেষ। ৭০।

আপেক্ষিক গুরুত্ব।—জল অপেক্ষা যে দ্রব্য যত ভারী তাহার আপেক্ষিক গুরুত্ব তত। নির্দ্দিষ্ট আয়তন (যথা ১ ইঞ্চ দৈর্ঘ্য ১ ইঞ্চ প্রস্থ ১ ইঞ্চ বেধ) বিশিষ্ট জলের সহিত তুলনায় ঐরূপ আয়তন বিশিষ্ট অন্য পদার্থ যত গুণ ভারী হয়, তাহার আপেক্ষিক গুরুত্ব তত। ৪১ ও ১১৭ পৃষ্ঠায় জলের গুরুত্ব ১০০০ ইহা বুঝিতে হইবে।—জলের গুরুত্ব ১ বলিলে রক্তের আপেক্ষিক গুরুত্ব ১$\frac{০৫৫}{১০০০}$ ও মূত্রের ১$\frac{০২}{১০০০}$।

আর্দ্রভৌমিক বায়ু।—একপ্রকার বিষাক্ত বাষ্প। আর্দ্র ভূমি ও পঙ্কিল জলাশয় প্রভৃতিতে এই বাষ্প অধিক উৎপন্ন হয়। ঐরূপ জলাশয়ের নিকট বাস করিলে বিশেষতঃ রাত্রি কালে থাকিলে কঠিন পীড়া জন্মে।

আবর্জ্জনা।—যাহা ফেলিয়া দিতে হয়। ময়লা, ওঁচলা, জঞ্জাল।

আলোকাবরণী।— ১৪।

উদান।—প্রাণ দেখ।

ঊর্দ্ধশিরা।—ডাইন কর্ণগহ্বরে মন্দ রক্ত আনিয়া ঢালে।

কশেরুকা মজ্জা।—মেরুদণ্ডীয় মজ্জা দেখ।

কণ্ঠনলী বা কণ্ঠনালী।—৬৪। ৮৭। ৮৮। ১৯৯। ২০০।

কাচবৎ পদার্থ—১৮৭।

কোষ।—প্রাণি ও উদ্ভিদ্ শরীরের দানার ন্যায় ক্ষুদ্রতম অংশ। অতি ক্ষুদ্র দানা সমূহ একত্রিত হইয়া মনুষ্যশরীরে রক্ত মাংস অস্থি প্রভৃতি এবং উদ্ভিদগণের মূল, পত্র প্রভৃতি সমুদায় গঠিত হইয়াছে। ক্ষুদ্রতম কীটাণু ও উদ্ভিদাণুগণ কেবলমাত্র দুই চারিটী কোষের সমষ্টি মাত্র।

কর্ণগহ্বর।—কর্ণ যেমন বিস্তৃত ইহা দেখিতে কতকটা সেইরূপ বলিয়া এই নাম।

কৈশিকা নাড়ী।—ধমনী ও শিরার মধ্যস্থ সূক্ষ্মতম রক্তের নলসমূহ। অসংখ্য কৈশিকানাড়ী সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত। গাত্রে একটু আঁচড় লাগিলেই যে এক বিন্দু রক্ত দেখা যায় উহা কৈশিকা নাড়ীর রক্ত।

কঠিনাবরণ।—১৮২।

কৃষ্ণাবরণ।—১৮৩।

কেন্দ্রাভিমুখ, কেন্দ্রবিমুখ।—যত কিছু জানিতে পারিতেছি সকলই কেন্দ্রাভিমুখ স্নায়ুর কার্য্য, যাহা কিছু করিতেছি, সমুদায়ই কেন্দ্রবিমুখ স্নায়ুর কার্য্য।

গর্ভকেশর।—পুষ্পের যে অংশে ফল হয়। ইহা স্ত্রীলোকের জরায়ুর তুল্য।

গর্ভগহ্বর।—অত্যন্ত বড় ও উদরবৎ বলিয়া এইরূপ নাম।

ক্লোম।—প্রাচীনগণ ক্লোম সম্বন্ধে যেরূপ বিশ্বাস করিতেন এক্ষণে আর সেরূপ ধারণা নাই। যথা ঃ—"বাহ্বোর্দ্বয়োর্ম্মধ্যে বক্ষ"। তন্মধ্যে হৃদয়ং তৎপার্শ্বে ক্লোম পিপাসাস্থানম্।"

গতিভঙ্গ।—১৮৭।

গলনলী।—ইহা একটী মাংসনির্ম্মিত মোটা চোঙ্গ বা নল, উপর দিক অধিক বিস্তৃত নীচের দিক সরু, ইহার নিম্নভাগ হইতে একটী সরু নল নামিয়া গিয়াছে তাহার নাম অন্ননলী।

ঘন ইঞ্চ।—দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও বেধ এই তিনের গুণফলকে ঘন কহে।

চক্ষু স্ফটিক—১৮৬।

চূর্ণক—চুণ।

জঘনহাড়।—১২০। বস্তিগহ্বরের পশ্চাৎ ও নিতম্বদ্বয়ের মধ্যে যে বিস্তৃত হাড় আছে।

জলজান।—অতি লঘু বাষ্প বিশেষ। ইহা অম্লজান বাষ্পের সহিত সংযুক্ত হইলেই জল উৎপন্ন হয়। জলের উৎপাদক ও উপাদান বলিয়া এই নাম।

জলজনিত গন্ধক।—অতি দুর্গন্ধময় বাষ্প বিশেষ। নর্দ্দামার দুর্গন্ধ ও পচা ডিম্বের দুর্গন্ধ এই বাষ্প বশতঃই হইয়া থাকে। গন্ধক গুঁড়া করিয়া কয়লার গুঁড়ার সহিত মিশাইয়া তাহাকে একটু জল দিয়া উত্তপ্ত করিলে অথবা গুঁড়া গন্ধক তৈল, ঘৃত, কিম্বা চর্বির সহিত মিশাইয়া গরম করিলেও এই বাষ্প উৎপন্ন করা যায়। জলজান ও গন্ধক ইহার উপাদান বলিয়া এই নাম।

জলবৎ পদার্থ—১৮৬।

জলজাত।—ধাত্রীগণ ইহাকে পানমুচি, পোয়ো প্রভৃতি নাম দিয়া থাকে।

জীবাণুবিদ্যা।—যে শাস্ত্র পাঠ করিলে কীটাণু ও উদ্ভিদাণুগণের উৎপত্তি, কার্য্য প্রণালী ও জীবনবৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়। ইহা নিতান্ত আধুনিক শাস্ত্র।

ইহা দ্বারা জানিতে পারা গিয়াছে যে এই জগৎ কীটাণু ও উদ্ভিদাণুর দ্বারা পরিপূর্ণ। এক ফোটা জলে পঞ্চাশ কোটী কীটাণু বাস করিতে পারে। যেরূপ মত পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে বোধ হয় শীঘ্রই এইরূপ সিদ্ধান্ত হইবে যে মানুষের অধিকাংশ পীড়াই ইহাদের দ্বারা উৎপন্ন হয়।

জীবনীশক্তি, জীবন বা প্রাণ।—এই শক্তির আধিক্য বশতঃ সদ্যোজাত গো বৎস ও অন্যান্য জন্তুর শাবকগণ লম্ফ ঝম্প প্রদান করে এবং মনুষ্যশিশুরা হাত পা ছুড়িতে থাকে। ইহারই অভাব বশতঃ বৃদ্ধ বয়সে দর্শন শ্রবণাদির হ্রাস হয়। অনেক বৃদ্ধ আক্ষেপ করেন "সেকালে ইলিশ মাছ ভাজিলে যেমন গন্ধ বাহির হইত এখন আর তেমন হয় না।" হায়। উহা মৎস্যের দোষে নহে, বয়সের দোষে হয়।

মাত্রা।—

ডিগ্রি।—তাপমান যন্ত্রের বড় বড় দাগগুলি। বরফ ও লবণ মিশ্রিত করিলে যে শৈত্য উৎপন্ন হয় তাহাকে ০° বা শূন্য ডিগ্রি উত্তাপ বলা হয়; ও জল যখন উত্তপ্ত হইয়া ফুটিত হয় এবং বাষ্পাকারে উড়িতে আরম্ভ করে তখন যে উত্তাপ উৎপন্ন হয় তাহাকে ২১২ ডিগ্রি উত্তাপ বলা হয়। এই উভয় সীমার মধ্যে উত্তাপের যত ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা আছে ফারেনহিটের তাপমান যন্ত্রে তাহাই প্রদর্শিত হয়। মনুষ্য দেহ পরীক্ষা করিতে যে তাপমান ব্যবহৃত হয় তাহাতে ৯০° হইতে ১১০° ডিগ্রি পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট আছে।

ঢালবৎ উপাস্থি।—ইহা দেখিতে ঠিক ঢালের মত নহে, কিন্তু ইহার সম্মুখভাগ গোল এবং কণ্ঠনালীর সম্মুখ অংশকে রক্ষা করিবার জন্য ঢালের ন্যায় রহিয়াছে বলিয়া ঐ নাম দেওয়া হয়।

তন্তু।—সূতা। মনুষ্য শরীরের প্রায় সকল অংশই সূত্রবৎ পদার্থে নির্ম্মিত স্নায়ু ধমনী প্রভৃতির বর্ণনা কালে যে সকল সূত্রবৎ পদার্থের উল্লেখ আছে তাহাতেই ইহাদের বিষয় বোধগম্য হইবে। পাঁঠার ছাল ছাড়াইবার সময় চর্ম্মের নিম্নে যে শ্বেত বস্ত্রবৎ স্তর দেখা যায় উহাকে যোজক তন্তু বলে, কেন না শরীরের সর্ব্বস্থানেই ঐ পদার্থ আছে এবং প্রত্যেক যন্ত্রের টুকরা

গুলিকে যোজনা করিয়া বা জুড়িয়া জুড়িয়া যন্ত্রটী গড়িয়াছে। যে মঞ্জুল ব ধাত সহ এবং স্থিতিস্থাপক তাহাদিগকে স্থিতিস্থাপক তন্তু কহে।

ত্রিচূড় পর্দ্দা।—ডাইন কর্ণগহ্বর হইতে ডাইন গর্ভগহ্বরে যখন (রক্ত) রক্ত যায় তখন যাইতে দেয় কিন্তু তখনই এমনই বন্ধ হইয়া যায় যে ঐ রক্ত আ ফিরিয়া ডাইন কর্ণগহ্বরে যাইতে পারে না।

তাপ সংরক্ষণ।—সুস্থ মনুষ্য দেহ প্রায় সর্ব্বদাই ৯৮॥ ডিগ্রি উত্তপ্ত।

তাপমান যন্ত্র।—যে যন্ত্রে উত্তাপের পরিমাণ নিরূপিত হয়। ইংরাজি থার্ম্মমিটার; ইহা কাচ নির্ম্মিত। ডিগ্রি দেখ।

দ্বিচূড় পর্দ্দা।—বামদিকের কর্ণগহ্বর হইতে বাম গর্ভগহ্বরে যখন (রক্ত) যায় তখন যাইতে দেয় কিন্তু তখনই এমনই বন্ধ হইয়া যায় যে ঐ রক্ত ফিরিয়া বাম কর্ণগহ্বরে যাইতে পারে না।

দর্শনজ্ঞান।—১৮৮।

দর্শন স্নায়ু।—১৮৮।

ধমনী।—যে রক্তের নলে পরিষ্কার ও উজ্জ্বল লালবর্ণ রক্ত চলে।

নিদ্রা।—মস্তিষ্কের ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভিন্ন প্রকার কার্য্য হয় ইহা আ বুঝিতে পারা যায় যে তাহাদের কার্য্য বন্ধ না হইলে নিদ্রা হয় না। এ অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইয়া শয়ন করিলে নিদ্রা হয় না এবং যাহাদের চি কম তাহাদের নিদ্রা অতি অধিক।

পরাগকেশর।—পুষ্পের মধ্যস্থিত যে সূক্ষ্ম নলগুলির উপর পরাগ রেণু যা থাকে। এইগুলিই পুষ্পের পুংলিঙ্গ এবং ঐ রেণুগুলিই শুক্র বা বী

প্রজনক।—উৎপাদক।

প্রাণ—পূর্ব্বকালে ইহাকে হৃদয়স্থ বায়ু বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করিত বায়ু দেহে পঞ্চ স্থানে পঞ্চ নামে অভিহিত হইত। যথা প্রাণ হৃ অপান, অন্ত্রনলীর বায়ু। সমান—নাভিস্থিত বায়ু। উদান—ক ব্যান—সর্ব্ব শরীরস্থ বায়ু।

প্লুত।—তিনটী অবর্ণ সহজে উচ্চারণ করিতে-যে সময় লাগে তাহাকে প্লুত বলে। "চাষাক্ষাব্যো চ গাবে চ, রোদনে চ প্লুতোমতঃ"।

[illegible]টাশ।—ক্ষার বিশেষ। পোটাশিয়ম নামক ধাতু সংযোগে উৎপন্ন ক্ষার বা লবণ বিশেষ। কাষ্ঠ পোড়াইয়া ভস্ম করিলে তাহাতে এই ক্ষার অনেক পাওয়া যায়।

[illegible]স্ফুরক।—দীপ্তিদায়ক রূঢ় পদার্থ বিশেষ। ইংরাজী নাম ফস্‌ফরাস্। বিলাতি দিয়াশালাইতে এই পদার্থ থাকাতেই উহা ঘর্ষণ করিলে জ্বলিয়া উঠে।—

[illegible]ত্যুৎপাদিকা শক্তি।—সন্তান জন্ম দিবার ক্ষমতা।

[illegible]শী।—মাংসসূত্র সকল একত্রিত হইয়া যে মোটা মোটা লাল বর্ণ বড় বড় মাংস হইয়াছে উহাই পেশী। ইহাদের দ্বারা ইচ্ছামাত্র শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের সঞ্চালন ক্রিয়া সমাধা হয়। ঊনবিংশ অধ্যায় দেখ। মাংসপেশীও বলা যায়।

[illegible]পড়া।—৯৮ পৃষ্ঠায় যে পিত্তপড়ার কথা আছে তাহাতে বুঝা যাইবে যে [illegible]খন পিত্তাধারের অতিরিক্ত পিত্ত উচ্ছ্বাস বা প্লাবন বশতঃ দ্বাদশকাঙ্গুলীক [illegible]ংশের মধ্যে আসিয়া পড়ে এবং ঐ স্থানে খাদ্য দেখিতে না পায়, তখন ঐ [illegible]ও দ্বারা অন্ত্রনলী উত্তেজিত হইতে থাকে। এই জন্যই পিত্ত পড়িয়া গেলে [illegible]মুখ করার কথা যে এতদ্দেশে প্রচলিত আছে তাহা বহু পরিমাণে সত্য। [illegible]রূপ সময়ে অল্প আহার করিলেও ঐ খাদ্যের সহিত পিত্ত মিশ্রিত হয়। [illegible] তাহাতে স্বাস্থ্য-হানির ভয় থাকে না। ইহাই পিত্ত রক্ষা।

[illegible]-পরিপূর্ণকারক। সূর্য্যের শ্বেত আলোক বেলোয়ারি কাচ দ্বারা বিশ্লিষ্ট [illegible]য়া দেখিলে বুঝা যায় যে উহা সাতটী রং মিশাইয়া হইয়াছে। অর্থাৎ [illegible]লোক অমিশ্র বর্ণ নহে সাতটী রঙ্গের সমষ্টি। এই সাতটী যথা—লোহিত, [illegible]া, পীত, হরিৎ, নীল, ধূমল, বায়লেট (বা ঈষৎ লালের আভাযুক্ত গাঢ় [illegible])। যদি এই সাতটীর একটীরও অভাব হয় তাহা হইলে শ্বেতবর্ণ হয় [illegible]রাং প্রত্যেকটী অপর ছয়টীর পূরক বর্ণ। আবার ইহার মধ্যে নির্দ্দিষ্ট [illegible]টী একত্রিত হইলে একপ্রকার শ্বেত হয় তাহাতেও একটী অপরটীর

[illegible]

* নাম হইয়া থাকিবে। অনুকরণ শব্দ।

ভারকেন্দ্র।—ভারের মধ্যস্থল। ইহার ঠিক নীচে বা উপর পার্শে সম
প্রকার অবলম্বন থাকিলে আর পদার্থটী পড়িতে পায় না, নতুব
ভাস্বর।—(ভাস্ দীপ্তিপ্রাপ্ত হওয়া উর—শীলার্থে)। মিছরি (
প্রভৃতি পদার্থের বড় বড় টুকরাগুলি কেমন চক্‌চকে ও কোণ
সকলেই দেখিয়াছেন। যে সকল পদার্থ এরূপ কোণবিশি
ভাস্বর কহে। যে প্রক্রিয়া দ্বারা এইরূপ আকারের পদার্থ উৎপ
ভাস্বরতাপাদন কহে।—ইংরাজি নাম ক্রুস্‌টাল্।

ভূত নাম্যন। ১৭৯।

ভিস্তি।—পাকস্থলী ভিস্তির ন্যায় এরূপ বলা ঠিক নহে, কেনন
ভিস্তি বলে, চামড়ার যে যন্ত্রে জল বহিয়া লইয়া যায় উঃ
অধিকাংশ বাঙ্গালীই ঐ জলাধারকে ভিস্তি বলেন বলিয়
হইল।

ভৌতিক শক্তি।—আলোক, উত্তাপ প্রভৃতি।

ভ্রূণ।—গর্ভস্থ শিশু।—

মিথুনজন্মা।—মিথুন স্ত্রীপুরুষের যুগল, একত্রিত হইয়া যাহাদি
যথা মনুষ্য, পশু প্রভৃতি।

মাংসিক।—মাংসে যে পদার্থ প্রধানতঃ আছে। ইহা উভিে
অল্প জল মিশাইয়া ডেলা প্রস্তুত করিয়া উহা ধীরে ধীরে
করিতে আরম্ভ করিলে শ্বেতসার ধুইয়া যাইতে থাকে। ক্রমে
পাওয়া যায় উহার অধিকাংশই মাংসিক। ইংরাজি নাম

মেদ—চর্ব্বি।—যৌবনে ইহার বিলক্ষণ বৃদ্ধি হয়, তাহাতেই দে
সুশ্রী হয়। বার্দ্ধক্যে চর্ম্মের নীচে হইতে শুষ্ক হইয়া যায় তা
হইয়া পড়ে।

মেরুদণ্ডীয় মজ্জা বা কশেরুকা মজ্জা বা মেরু মজ্জা।—১১২ পৃ
হইতে যে শ্বেত পদার্থটী নামিয়া গিয়াছে এবং যাহার গা
স্নায়ু বাহির হইয়াছে উহাই মেরু মজ্জা।

ম্যাগনিসীয়া।—ম্যাগনিসীয়ম্ নামক ধাতু সংযোগে উৎ

-হৃদয়, ফুস্‌ফুস্‌, যকৃৎ প্রভৃতি যন্ত্র তাহাদের ভিতর যে বিধান বা
াছে।

—বায়ুস্থিত বাষ্প বিশেষ। যবক্ষারে অধিক পরিমাণ পাওয়া যায়।

—এই কয়টী কথা বুঝিলেই রক্ত সঞ্চালনের ব্যাপার সমস্ত বুঝা
ারীরের সমুদায় মন্দ রক্ত ঊর্দ্ধ ও নিম্ন শিরার ভিতর দিয়া ডাইন
আসিতেছে। সেখান হইতে ডাইন গর্ভগহ্বরে পড়িতেছে।
রক্তকে ঠেলিয়া ফুস্‌ফুসে পাঠাইয়া দিতেছে। সেখানে গিয়া
ইতেছে। পরিষ্কার রক্ত বাম কর্ণগহ্বরে আসিতেছে ও বাম
পড়িতেছে। তথা হইতে বৃহদ্ধমনী ও অন্যান্য ধমনী দ্বারা সমস্ত
তছে।

ের আধার। হৃদয়, ধমনী, কৈশিকা ও শিরা এ সমস্তগুলিতেই
তরাং ইহারা সকলেই রক্তাধার।

কর রশ্মি কি তাহা বুঝিবার নিমিত্ত প্রদীপের আলোক হইতে
ূরে বসিয়া একটী চক্ষু বুজিয়া অপর চক্ষু দ্বারা একটী চোঙ্গার
কিম্বা নিজের হস্তের মুষ্টির ভিতর আলোকের দিকে দৃষ্টি করিলে
সংখ্য আলোকের রেখা আসিয়া চক্ষে লাগিতেছে। এই

মরের নীচে ও নিতম্বের ভিতর যে গহ্বরে মূত্রাশয়, জরায়ু
।

সের উপরে ও কণ্ঠনলীর নীচে স্থিত। চতুর্থ প্রতিকৃতি।

মতে মনুষ্যাদি জীবের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সৃষ্টি হয় নাই। আদিম
সহস্র সহস্র বৎসর উন্নতি হইয়া বৃহত্তর জীব সকল হইয়াছে
তে আর ও উন্নতি বশতঃ বানর ও পরিশেষে মনুষ্য উৎপন্ন
কেহ বলেন উক্ত আদিম কীটাণুগণ ও জড় পদার্থের
ায়নিক সংযোগে উৎপন্ন হইয়াছে।

াস সারাংশ) ইহা শ্বেতবর্ণ, উজ্জ্বল ও অঙ্গুলী দ্বারা

চাপিলে অল্প শব্দ হয়। চাউল, আলু, গোং
দৃষ্ট হইয়া থাকে। সাগু আরোরুট প্রভৃতি ·
বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইংরাজি নাম ষ্ট।

শৈষ্মানত্মক।—নাসিকা হইতে যে রস নিঃসৃত হয় উ
কথা ইহারই অপভ্রংশ) এইজন্য এই ঝিল্লীকে শৈ

শ্বাপদ জন্তু।—(শ্বন্ কুকুর পদ পা, যাহার কুকুরের ন্যায়
জন্তু ; যথা বিড়াল, কুকুর, শৃগাল, ভল্লুক, ব্যাঘ্র।

শীতল-শোণিতক।—১৩।

সোডা।—সোডিয়ম ধাতু সংযুক্ত ক্ষার বিশেষ। বাজারের
মাটী এই শ্রেণীভুক্ত।

সমযোগাকর্ষণ।—একই প্রকার পদার্থের পরমাণু গুলির পর
আকর্ষণ উহা সমযোগাকর্ষণ, ইহা অতি প্রবলা শক্তি। জলে
তৈল, এই জন্য অতি শীঘ্র মিশে। বিভিন্ন শ্রেণীর পদার্থের আ
যোগাকর্ষণ কহে। যথা কাগজে আটা মাখাইলে উহা মিশে।

স্বেদজ।—

মনুসংহিতায় স্বেদজ এইরূপ বর্ণিত যথা (১অ ৪৫ শ্লোকে):—

স্বেদজং দংশমশকং যূকা মক্ষিকমৎকুণং।
উষ্মণশ্চোপজায়ন্তে যচ্চান্যৎ কিঞ্চিদীদৃশং॥

অস্যার্থঃ।—দংশ, মশক, জলৌকা, মক্ষিকা, মৎকুণ ইহারা ক্লেদ হইতে উৎপ
হয়, এতদ্ব্যতীত পুত্তিকা, পিপীলিকাদি উষ্ণতা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

স্নায়ু শব্দ ব্যাকরণে স্ত্রীলিঙ্গ। ভাষার সরলতা রক্ষার জন্য এই পুস্তকে পুংলিঙ্গে
ব্যবহৃত হইয়াছে।

বিজ্ঞাপন।

গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত কুইনাইন সম্বন্ধে দুই
ায়, ঐ দুইয়ের বিশেষ বিবরণ এই :—

কুইনাইন ব্যবহার।

া পুস্তক বেশ পড়িতে শিখিয়াছেন, অর্থাৎ
ভারত বা কৃত্তিবাসের রামায়ণের মত পুস্তক
স পড়িতে পারেন, এবং দুই একটা ডাক্তারি
(যেমন এসিড, ব্রাণ্ডি ইত্যাদি) জানেন তাঁহাদের
: বড় উপকারী। উহাতে কুইনাইনের আবিষ্কার,
ও থার্ম্মোমিটার ব্যবহার করিবার উপায় এবং
কার জ্বরে ও অন্যান্য বহুবিধ রোগের কিরূপ অব-
াইন প্রয়োগ করিলে শুভ ফল পাওয়া যায়, এবং
গের কিরূপ অবস্থায় প্রয়োগ করিলে উপকার হয় না,
বস্তার বহুবিধ দৃষ্টান্ত সহ লিখিত আছে। ফেনাসেটীন্
কয়েকটী নূতন ঔষধ ব্যবহার করিয়া কিরূপে জ্বর ছাড়া-
হয়, তাহারও বিবরণ উহাতে আছে। আকার উপক্রমণিকা
৬৪ পৃষ্ঠা, মূল্য ৷৵০, ডাক মাসুল ৵১০; ভি, পি, ডাকে
ইলে খরচ ৷৵০, বহুসংখ্যক ইংরাজি ও বাঙ্গালা সংবাদ ও
ামযিক পত্রে প্রশংসিত।

২। সহজ কুইনাইন ব্যবহার।

মূল্য ৵০ ডাক মাসুল ৵১০, ভি, পি, ডাকে ইলে মায় মনি-
অর্ডার খরচ ।০। বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ডাকঘর সমূহে গৃহীত
এই দুইখানি পুস্তকই কলিকাতা, কলেজ ষ্ট্রীট ক্যানিং লাই-
ব্রেরিতে এবং শ্যামনগর পোষ্ট, জেলা ২৪ পরগণা গ্রন্থকারের
নিকট পাওয়া যায়।